তিন গোয়েন্দা
রকিব হাসান
ভলিউম
৩/২
REST IN PEACE
CLAY NEWTON
কিশোর থ্রিলার
সেবা
প্রকাশনী

ভলিউম ৩

দ্বিতীয় খণ্ড

তিন গোয়েন্দা

১৬, ১৭, ১৮

রকিব হাসান

সেবা প্রকাশনী
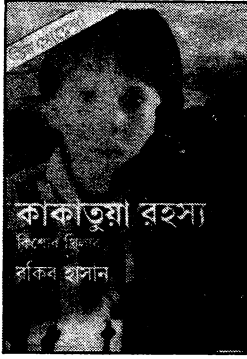
কাকাতুয়া রহস্য

প্রথম প্রকাশ ঃ মার্চ, ১৯৮৮

'বাঁচাও!' তীক্ষ্ণ চিৎকার। 'বাঁচাও!' খানখান হয়ে গেল নীরবতা।

পুরানো ভাঙা বাড়িটার ভেতর থেকে আসছে আর্তনাদ। শিরশিরে ঠাণ্ডা স্রোত যেন বয়ে গেল সহকারী গোয়েন্দা মুসা আমানের মেরুদণ্ড বেয়ে।

আবার শোনা গেল চিৎকার। শেষ হলো চাপা ঘড়ঘড় করে। শব্দের ভয়াবহতা বাড়িয়ে দিল আরও।

একটা ব্যারেল পামের গোড়ায় হুমড়ি খেয়ে আছে মুসা, চোখ খোয়া-বিছানো আঁকাবাঁকা পথের দিকে। কেউ আসছে কিনা দেখছে।

চিৎকার শুনে মুসার মতই পথের অন্য ধারের একটা ঝোপে গিয়ে লুকিয়েছে গোয়েন্দাপ্রধান কিশোর পাশা। চেয়ে আছে বাড়ির দিকে।

অপেক্ষা করছে দুজনেই।

স্প্যানিশ ধাঁচের একটা অনেক পুরানো বিলডিং। অযত্নে বেড়ে পুরানো গাছপালা আর লতার ঘন জঙ্গলে ঘিরে রেখেছে বাড়িটাকে।

আর শোনা গেল না চিৎকার।

'কিশোর,' ফিসফিস করে বলল মুসা। 'পুরুষ না মহিলা?'

'জানি না,' ফিসফিসিয়েই জবাব এল। 'তবে কোনটার মতই তো লাগল না।'

'কোনটাই না?' ঢোক গিলল মুসা। শিশুও নয়। তাহলে আর একটা সম্ভাবনাই থাকে, যেটা ভাবতেও ভয় পাচ্ছে সে।

আড়াল থেকে বেরোল না ওরা। গরমে ঘামছে দরদর করে। রকি বীচের চেয়ে গরম কি বেশি নাকি হলিউডে?

চারপাশে তাল জাতীয় গাছের ছড়াছড়ি, ঘন ঝোপঝাড়, লতা, আর নানা রকম ফুলগাছ। চমৎকার একটা বাগান ছিল এককালে। কিন্তু অযত্নে অবহেলায় এখন জঙ্গল হয়ে গেছে। ওপাশের বাড়িটাও ঠিকমত চোখে পড়ে না।

এক সময়ের বিখ্যাত অভিনেতা মিস্টার মরিসন ফোর্ডের বাড়ি, চিত্রপরিচালক ডেভিস ক্রিস্টোফারের বন্ধু। প্রিয় কাকাতুয়াটা হারিয়ে খুব মনোকষ্টে আছেন অভিনেতা, বন্ধুকে জানিয়েছেন। পরিচালকই তিন গোয়েন্দাকে অনুরোধ করেছেন ব্যাপারটা একটু তদন্ত করে দেখতে। সে-জন্যেই এসেছে কিশোর আর মুসা। গেটের ভেতরে ঢুকেই শুনেছে চিৎকার, লুকিয়ে পড়েছে। কি ঘটে, দেখার অপেক্ষায় রয়েছে।

'কিশোর,' নিচু স্বরে বলল মুসা, 'খুঁজতে এলাম কাকাতুয়া। এ-যে দেখছি ভূত! ভূতুড়ে বাড়িতে ঢুকলাম না তো, টেরর ক্যাসলের মত?' তিন গোয়েন্দার

প্রথম রোমাঞ্চকর অভিযানের কথা মনে করল সে।

'খুব আশাব্যঞ্জক,' বিশেষ বিশেষ সময়ে কঠিন শব্দ ব্যবহার আর দুর্বোধ করে কথা বলা কিশোরের স্বভাব। 'আরেকটা কেস বোধহয় পেলাম। চলো, এগোই। কি হয়েছে দেখা দরকার।'

'ভূতেরা খেলায় মেতেছে। বাজি রেখে বলতে পারি, গিয়ে একটা দরজাও খোলা পাব না, সব তালা বন্ধ। আমাদেরকে দেখলেই ঝটকা দিয়ে দিয়ে খুলে যাবে...'

'চমৎকার বর্ণনা!' বাধা দিয়ে বলল কিশোর। 'মনে রেখো। ঠিক এভাবে গিয়ে বলো রবিনকে, নোট করে নেবে...'

'দেখো কিশোর, রসিকতার সময় নয় এটা...'

কিন্তু মুসার কথায় কান নেই কিশোরের। ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে গাছের আড়ালে আড়ালে নিঃশব্দে এগোতে শুরু করেছে বাড়ির দিকে।

মুসাও উঠে দাঁড়াল। পথের অন্য ধারে গাছের আড়ালে থেকে এগোল সে-ও।

বাড়িটা শ-খানেক ফুট দূরে থাকতেই কিসে যেন মুসার পা জড়িয়ে ধরল। টান দিয়ে গোড়ালি ছাড়ানোর চেষ্টা করল সে, বাঁধন আরও শক্ত হলো। হ্যাঁচকা টানে পা ছুটিয়ে নেয়ার জন্যে সামনে লাফ দিল। পাল্টা টান দিয়ে ফেলে দেয়া হলো তাকে মাটিতে, কিসে ধরেছে দেখতে পাচ্ছে না ঘন পাতার জন্যে।

'কিশোর!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'বাঁচাও আমাকে! মেরে ফেলল!'

ঝোপঝাড় ভেঙে ছুটে এল কিশোর।

'দেখো, কিসে জানি টানছে,' কোলা ব্যাঙ ঢুকেছে যেন মুসার গলায়, চোখ ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। 'টেনে নিয়ে যাচ্ছে গর্তে। অজগর...না না, অ্যানাকোণ্ডা।'

ভাবান্তর নেই কিশোরের চেহারায়। শান্তকণ্ঠে বলল, 'তোমার জন্যে দুঃখ হচ্ছে আমার, মুসা। ভয়ঙ্কর ভিটিস ভিনিফেরায় ধরেছে তোমাকে।'

'খাইছে! আল্লারে, মরে গেলাম! কিশোর, দোহাই তোমার, ভিটিস বি জানি...বাঁচাও...'

আট ফলার প্রিয় ছুরিটা বের করল কিশোর। ধীরে সুস্থে বসে পেঁচিয়ে কাটতে শুরু করল ভিটিস ভিনিফেরাকে।

টান মুক্ত হতেই লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। কিসে ধরেছিল, তাকাল।

নীরব হাসিতে ফেটে পড়ছে কিশোর। ছুরিটা আবার ভাঁজ করে বেল্টে ঝুলিয়ে রাখছে।

ফিক করে হেসে ফেলল মুসা। 'প্লীজ, কিশোর, রবিনকে বোলো না।'

'পা ফেলেছিলে লতার ফাঁদে, ভেবেছ সাপ। ওই ভূতের ভয়ই তোমার মনকে ভারাক্রান্ত করে রেখেছিল, মুসা,' উপদেশ দিতে শুরু করল কিশোর। 'এভাবেই ভয় পেয়ে মরে দুর্বল হৃৎপিণ্ডের লোক, বোকারা ভাবে ভূতে মেরেছে। ভয় আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল তোমার মনকে, ফলে বুদ্ধি-সুদ্ধি লোপ পেয়েছিল, বুঝতে পারোনি ওটা সাপ না লতা।'

কিশোরের এ ধরনের লেকচারে এখন আর কিছু মনে করে না মুসা, অভ্যস্ত হয়ে গেছে। বলল, 'ঠিকই বলেছ, ওই চিৎকারই...'

'সে-জন্যেই বিপদে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়। আতঙ্ক বিপদকে আরও বাড়িয়ে দেয়। সে-কারণেই মনীষীরা বলেছেন...বলেছেন...'

মনীষীরা যেন ভয় পেতেই বলেছেন কিশোরকে, বড় বড় হয়ে যাচ্ছে চোখ। ধীরে ধীরে ঝুলে পড়ছে চোয়াল। চেহারা ফ্যাকাসে। দৃষ্টি মুসার পেছনে।

'সত্যি খুব ভাল অভিনেতা তুমি, কিশোর,' প্রশংসা করল মুসা। 'কেন যে টেলিভিশনে অভিনয় বাদ দিলে। গোয়েন্দাগিরির চেয়ে অনেক বেশি উন্নতি করতে পারতে। এভাবে ভয় পাওয়ার অভিনয়...' হঠাৎ সন্দেহ হলো তার। ফিরে তাকাল। স্থির হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

অভিনয় করছে না গোয়েন্দাপ্রধান।

বিচ্ছিরি রকম মোটা এক লোক দাঁড়িয়ে আছে, হাতে ভীষণ চেহারার একটা পুরানো আমলের পিস্তল, পিলে চমকে দেয়। পুরু লেন্সের চশমার জন্যে চোখ দুটো অস্বাভাবিক বড় লাগছে, গোল গোল, যেন মাছের চোখ।

'এসো,' পিস্তল নাড়লো লোকটা, 'আগে ঘরে এসো। তারপর শুনব কেন ঢোকা হয়েছে।'

মুখ শুকিয়ে গেছে মুসার, পা দুটো যেন দুই মণ ভারি। কোন মতে টেনে টেনে এসে উঠল খোয়া বিছানো পথে। 'খবরদার, পালানোর চেষ্টা কোরো না,' হুঁশিয়ার করল লোকটা। তাহলে পস্তাবে।'

'যা বলছে, করো,' মুসার কানের কাছে ফিসফিস করল কিশোর। 'দেখি কি হয়।'

'পাগল,' জবাব দিল মুসা। 'পালানোর চেষ্টা করব মরতে? হাঁটতেই তো পারছি না ঠিকমত।'

আগে আগে চলেছে দুই গোয়েন্দা।

পেছনে মোটা লোকটার জুতোর মচমচ শব্দে শিরশির করছে মুসার গা, শুঁয়োপোকা দেখলে অনেকের যে অনুভূতি হয়।

বিশাল সদর দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ওরা, ওপরে টালির ছাউনি বেরিয়ে আছে সামনের দিকে।

'দরজা খোলো,' হুকুম করল লোকটা। 'জলদি করো। গুলি করার জন্যে আঙুল নিশপিশ করছে আমার।'

নব ঘুরিয়ে ঠেলা দিল কিশোর। খুলে গেল দরজা। আবছা অন্ধকার একটা হলঘর।

'ডানে ঘোরো,' আবার বলল লোকটা। 'ওই যে, পাশের দরজাটা, খোলো।'

আরেকটা বড় ঘরে ঢুকল ওরা। পুরানো আসবাবপত্র। খবরের কাগজ আর বইয়ে ঠাসা। উল্টো প্রান্তের দেয়াল ঘেঁষে সাজানো রয়েছে কয়েকটা বড় বড় চেয়ার, চামড়ায় মোড়া গদি।

'যাও, বসো ওখানে।'

যা বলা হলো, করল ওরা।
মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। মুখে সন্তুষ্টির হাসি। পিস্তলের নলের মুখে জোরে ফুঁ দিল, যেন ভেতরে জমে থাকা বালি পরিষ্কার করছে। পথ সুগম করে দিচ্ছে বুলেটের।
'এবার বলো, কি চুরি করতে এসেছ?'
'মিস্টার মরিসন ফোর্ডের কাছে…' বলতে গিয়ে বাধা পেল কিশোর।
'আমিই মরিসন ফোর্ড।'
'অ। আপনার কাছেই এসেছি…'
কিন্তু এবারও কথা শেষ করতে দিল না ফোর্ড। নাকের একপাশ চুলকাল। 'আমার কাছে? তাহলে এভাবে লুকিয়ে কেন? চোরের মত?'
'কে যেন বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করল,' বলে ফেলল মুসা। 'তাই লুকিয়ে পড়েছিলাম। ভাবলাম ভেতরে চোর-ডাকাত…কত কিছুই তো ঘটছে আজকাল। দিনে-দুপুরেও লোকের বাড়িতে ডাকাত পড়ে।'
'অ।' ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসল লোকটার। 'শুনেছ, না?'
'মিস্টার ফোর্ড,' বুঝিয়ে বলল কিশোর, 'মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফার পাঠিয়েছেন আমাদের। আপনার নাকি একটা কাকাতুয়া হারানো গেছে, পুলিশ কিছু করতে পারছে না। সেটাই তদন্ত করতে এসেছি আমরা, পাখিটা খুঁজে বের করতে।' পকেট থেকে কার্ড বের করে দিল সে। 'আমি কিশোর পাশা। ও আমার বন্ধু, মুসা আমান।'
'গোয়েন্দা, না?' একনজর দেখেই কার্ডটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখল লোকটা। 'কাকাতুয়া খুঁজতে এসেছ।' হাসল।
হাঁপ ছাড়ল মুসা। কিন্তু লোকটার পরের কথায়ই চুপসে গেল আবার।
'তোমাদের কথা বিশ্বাস করতে তো ইচ্ছে করছে, চেহারা সুরতও ভালই, চোরের মত না। তোমরা ফিরে না গেলে খুব কান্নাকাটি করবে বাবা-মা, না?'
খুব শান্ত ভাবে পকেট থেকে সিগারেট বের করে ঠোঁটে লাগাল লোকটা। পিস্তলের নল প্রথমে ধরল কিশোরের বুক সোজা, তারপর ঘোরাল মুসার দিকে।
টিপে দিল ট্রিগার। চাপা একটা আওয়াজ হলো।
ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলেছিল মুসা, কিছুই ঘটল না দেখে মেলল আবার।
পিস্তলের নলের মাথায় জ্বলছে নীলচে আগুন। সেটা থেকে সিগারেট ধরিয়ে নিচ্ছে মিস্টার ফোর্ড। নাক-মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল ভকভক করে, ফুঁ দিয়ে আগুন নিভিয়ে পিস্তলটা রেখে দিল টেবিলে।
হায় হায়, ভাবল মুসা, এত ভয় পেলাম। ওই সিগারেট লাইটারটা দেখে? দূর, আমি একটা ভীতুর ডিম। রক্ত ফিরে এল আবার চেহারায়। নড়েচড়ে বসল।
'চমৎকার,' হাসি হাসি ভাব করে বলল লোকটা। 'পরীক্ষায় পাশ। নাকি আমার অভিনয় ভাল হয়নি?'
'আরেকটু হলেই হার্টফেল করতাম,' বাড়িতে ঢোকার পর এই প্রথম হাসি ফুটল মুসার মুখে। হাত মেলাল। লোকটার নরম তুলতুলে হাতের চাপ খুব শক্ত,

দেখে মনে হয় না এরকম হবে।

কিশোরের সঙ্গেও হাত মেলাল লোকটা। 'এভাবে অভিনয় করে অনেক বয়স্ক লোককেও বেহুঁশ করে দিয়েছি। আর তোমরা ছেলেমানুষ…ভাল গোয়েন্দাই পাঠিয়েছে ডেভিস। ও-ই বলেছিল, তোমাদের একটা টেস্ট নিতে।'

'মানে…ইয়ে…' বিশ্বাস করতে পারছে না যেন কিশোর, 'মিস্টার ক্রিস্টোফার বলেছেন আমাদের সাহসের পরীক্ষা নিতে!'

'হ্যাঁ, এই তো, একটু আগে ফোন করল। তবে তোমরা ভালই উৎরেছ। জানাব ডেভিসকে। আর হ্যাঁ, তোমাদের কিছু তদন্ত করতে হবে না, সরি।'

'কিন্তু আপনিই নাকি মিস্টার ক্রিস্টোফারকে জানিয়েছেন কাকাতুয়া হারিয়েছে?' মুসা অবাক।

'হারিয়েছিল,' মাথা ঝাঁকাল লোকটা। 'তাকে জানিয়েও ছিলাম। কিন্তু ওটা যে ফিরে এসেছে, জানানো হয়নি আর। ডিয়ার বিলি, কি কষ্টটাই না দিয়েছে আমাকে।'

'বিলি?' কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'কাকাতুয়াটার নাম?'

'হ্যাঁ, বিলি শেকসপীয়ার, উইলিয়াম শেকসপীয়ারের…'

'কিন্তু বাঁচাও বাঁচাও বলে কে চেঁচাল?' মুসা বলল, 'এ বাড়ি থেকেই…'

'খুব খুঁতখুঁতে তোমরা। গোয়েন্দাগিরির জন্যে ভাল।' গলা ফাটিয়ে হাসল লোকটা, দুলে উঠল মস্ত ভুঁড়ি। 'ওটা বিলির কাণ্ড। নিজেকে অনেক বড় অভিনেতা ভাবে সে, মাঝেমাঝেই সেটা প্র্যাকটিস করে। আমিই শিখিয়েছি—যেন হাজতে আটকে রাখা কয়েদী বিলি, তার ওপর নির্যাতন চলছে…হা-হা-হা।'

'বিলিকে দেখাবেন, প্লীজ?' অনুরোধ করল কিশোর। 'খুব বুদ্ধিমান পাখি, দেখতে ইচ্ছে করছে।'

'সরি,' মেঘ জমল লোকটার চেহারায়। 'আজ বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিল বিলি। তাকে থামানোর জন্যে শেষে খাঁচার ওপর কাপড় দিয়ে ঢেকেছি। এখন আবার তুললেই হয়তো চেঁচানো শুরু করবে। মাথাই খারাপ হয়ে গেল, না কী।'

'ঠিক আছে ঠিক আছে, থাক তাহলে,' হাত তুলল কিশোর। 'তদন্ত করার আর তো কিছু নেই,' হতাশ হয়েছে খুব। 'যাই আমরা, মিস্টার ফোর্ড। আপনার কাকাতুয়া ফিরে এসেছে, এটা অবিশ্যি খুশির খবর।'

'থ্যাংকু,' বলল মোটা লোকটা। 'তোমাদের কার্ড রইল। কখনও দরকার পড়লে ডাকব। তিন গোয়েন্দা, মনে থাকবে।'

সদর দরজা পর্যন্ত ছেলেদের এগিয়ে দিয়ে গেল ফোর্ড।

'খুব খারাপ লাগছে,' আঁকাবাঁকা পথে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বলল কিশোর। 'আশা হয়েছিল, দারুণ একখান কেস মিলেছে। পোড়ো নির্জন বাড়ি, আর্তনাদ, অদ্ভুত এক মোটা লোক…বড় বেশি আশা করে ফেলেছিলাম।'

'আমার ভালই লাগছে,' খুশি দেখাচ্ছে মুসাকে। 'ঢুকেই যা শুরু হয়েছিল, সত্যি সত্যি হলে এ-যাত্রা ঠিক ভূতের হাতে মারা পড়তাম। দরকার পড়লে আবার ডাকবে বলেছে ফোর্ড। না ডাকুক, সেটাই ভাল। ওকে মোটেও পছন্দ হয়নি

আমার।'

'হয়তো,' কিছু ভাবছে কিশোর। নীরবে এগোল দুজনে, আলগা খোয়ায় জুতোর শব্দ হচ্ছে। হলিউডের একটা পুরানো এলাকা এটা, বড় বড় বাড়ি আছে। কিন্তু প্রায় সব কটাই যত্নের অভাবে ধ্বংস হতে চলেছে। মালিকেরা অভাবী হয়ে পড়েছে অনেকেই, ঠিকমত যত্ন নিতে পারে না। কিংবা যাদের এখনও টাকা আছে, তারা আর পছন্দ করতে পারছে না এলাকাটা। অন্য জায়গায় নতুন বাড়ি করে উঠে গেছে।

গেটের বাইরে পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে কালো রোলস-রয়েস, জায়গায় জায়গায় সোনালি কাজ করা, আয়নার মত চকচকে শরীর, কিন্তু মডেলটা পুরানো। ইচ্ছে করেই বানানো হয়েছে। একবার বাজি জিতে গাড়িটা তিরিশ দিনের জন্যে ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছিল তিন গোয়েন্দা। এখনও দরকার পড়লে করে, তবে ভাড়া দিতে হয়। খরচ দেয় তাদের এক বন্ধু, অগাস্ট অগাস্ট, রক্তচক্ষু উদ্ধারে তাকে সহায়তা করেছিল তিন কিশোর।

'বাড়ি চলুন, হ্যানসন,' শোফারকে বলল কিশোর। 'কাকাতুয়াটা ফিরে এসেছে।'

'তাই নাকি? ভাল,' বিশুদ্ধ ইংরেজিতে বলল হ্যানসন, খাঁটি ইংরেজ বলে গর্ব আছে তার। 'চলুন।'

গাড়ি ঘোরাচ্ছে হ্যানসন।

মিস্টার ফোর্ডের বাগানের দিকে চিন্তিত ভঙ্গিতে চেয়ে আছে কিশোর। গাছের জঙ্গলের জন্যে বাড়িটা দেখা যায় না।

'মুসা,' হঠাৎ বলল সে, 'ভাল করে দেখো। কোথায় জানি একটা গোলমাল রয়েছে, ধরতে পারছি না।'

'কি? বাগানে?'

'বাগান, ড্রাইভওয়ে, পুরো বাড়িটাই। মাথার ভেতরে কিছু একটা খোঁচাচ্ছে, বের করে আনতে পারছি না।'

'হাসালে। কিশোর পাশা যেটা বুঝতে পারে না, সেটা আমি পারব?'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে শুরু করেছে কিশোর, মুসার কথা কানে ঢুকল বলে মনে হলো না। গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে।

হ্যানসনকে গাড়ি থামাতে বলে ভালমত দেখল মুসা। কিন্তু গোলমাল চোখে পড়ছে না। অযত্নে বেড়ে উঠেছে বাগান, মালির হাত না লাগলে উঠবেই, স্বাভাবিক ব্যাপার। ড্রাইভওয়েতে তালের পাতা জমে আছে, মাড়িয়ে গেছে গাড়ির চাকা। এতেও অস্বাভাবিক কিছু নেই।

'নাহ্, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না,' মাথা নাড়ল মুসা। গাড়ি ছাড়তে বলল হ্যানসনকে।

কিশোরের কোন খেয়ালই নেই যেন।

গোটা দশেক ব্লক পেরিয়েছে গাড়ি, আচমকা চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। 'হ্যানসন! ঘোরান! গাড়ি ঘোরান! কুইক!'

'ঘোরাচ্ছি,' কিশোরের স্বভাব হ্যানসনেরও জানা, কোন কারণ না থাকলে ঘোরাতে বলত না। তাই কোন প্রশ্ন করল না সে।

'কিশোর, কি হয়েছে? আবার কেন?'

'গোলমালটা ধরে ফেলেছি,' উত্তেজনায় লাল হয়ে গেছে গোয়েন্দাপ্রধানের মুখ। 'মিস্টার ফোর্ডের বাড়িতে টেলিফোন লাইন নেই।'

'লাইন নেই? তাতে কি?'

'কারেন্টের লাইন আছে, কিন্তু টেলিফোনের নেই। অথচ ফোনে কথা বলল কি করে মিস্টার ফোর্ড, মিস্টার ক্রিস্টোফারের সঙ্গে? মিথ্যে বলেছে। আর তাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে আর যা যা বলেছে, সবই মিছে কথা।'

'মিছে কথা?' মাথা নাড়ল মুসা। 'কেন বলবে?'

'কারণ লোকটা মিস্টার ফোর্ড নয়। ভণ্ড, প্রতারক। খুব সম্ভব আসল মিস্টার ফোর্ডই তখন বাঁচাও বাঁচাও বলে চেঁচিয়েছিলেন।'

দুই

নয়টা ব্লক নিঃশব্দে পেরিয়ে এল বিশাল রোলস-রয়েস।

মিস্টার ফোর্ডের গেট দিয়ে ছোট আরেকটা গাড়ি বেরোচ্ছে, মোড় নিয়ে এগিয়ে আসতে শুরু করল এদিকেই। গতি বাড়ছে, সাঁ করে চলে গেল পাশ দিয়ে। পলকের জন্যে ড্রাইভারকে চোখে পড়ল। মোটাসোটা, চোখে চশমা। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে।

'মিস্টার ফোর্ড যাচ্ছেন,' চেঁচিয়ে বলল মুসা।

'ভুল,' শুধরে দিল কিশোর, 'ও মিস্টার ফোর্ড নয়। হ্যানসন, পিছু নিন।'

ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল শোফার। বন বন করে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে মুখ ফেরাল আবার গাড়ির।

মোড়ের কাছে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে কালো গাড়িটা।

'ধরতে পারলে কি করব?' প্রশ্ন করল মুসা। 'ওর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নেই। বরং আসল ফোর্ডের অবস্থা গিয়ে দেখা উচিত। সাহায্য লাগতে পারে।'

দ্বিধা করছে কিশোর। মাথা ঝাঁকাল। 'ঠিকই বলেছ। আগে মিস্টার ফোর্ডকে দেখা দরকার, কি অবস্থায় রয়েছেন কে জানে। সরি, হ্যানসন, আবার ঘোরান।'

এবার আর বাইরে নয়, কিশোরের নির্দেশে গেটের ভেতরে গাড়ি ঢোকাল হ্যানসন, গাড়িপথ ধরে এগোল।

সরু পথ, এতবড় গাড়ির উপযুক্ত নয়। দুপাশের ঝোপঝাড়ের পাতা, লতার ডগা আর পামের পাতা ঘষা খাচ্ছে গাড়ির গায়ে।

অবশেষে পুরানো বাড়ির গাড়িবারান্দায় এসে থামল গাড়ি, খানিকক্ষণ আগে এখানেই আরেকবার এসেছিল দুই গোয়েন্দা।

'মুসা,' শান্ত কণ্ঠে বলল কিশোর, 'যে গাড়িটা বেরিয়ে গেল, ওটার বিশেষ কিছু চোখে পড়েছে?'

'টু-ডোর, স্পোর্টস মডেল রেঞ্জার, খুব ভাল ইংলিশ কার,' বলল মুসা। 'নতুন ক্যালিফোর্নিয়ার নাম্বার, পুরোটা বলতে পারব না, তবে শেষ দুটো নাম্বার ওয়ান থ্রী।'

'হ্যানসন, আপনি দেখেছেন নম্বরটা?'

'না। গাড়ি চালানোয় ব্যস্ত ছিলাম। নজর পথের ওপর। তবে রেঞ্জার ঠিকই। লাল চামড়ার গদি।'

'যাক, কিছু তথ্য জানা থাকল,' বলল কিশোর। 'পরে মোটা লোকটা আর তার গাড়ি খুঁজে বের করব।' দরজা খুলে নামল সে। 'এখন দেখি মিস্টার ফোর্ডের কি অবস্থা।'

কিশোরকে অনুসরণ করল মুসা। বুঝতে পারছে না, কিভাবে পরে লোকটা আর তার গাড়ি খুঁজে বের করবে গোয়েন্দাপ্রধান, দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার লাখ লাখ গাড়ির ভেতর থেকে।

তবে বলেছে যখন, উপায় একটা করবেই কিশোর, তাতে কোন সন্দেহ নেই মুসার।

হঠাৎ থমকে গেল ওরা। বিষণ্ণ বাড়িটা থেকে আবার শোনা গেল সাহায্যের আবেদন, 'বাঁচাও!...শুনছ কেউ?...প্লীজ, আমাকে ছাড়াও...'

জোর নেই তেমন গলায়।

'মারা যাচ্ছে নাকি?' তাড়াতাড়ি বলল মুসা, 'চলো তো, দেখি।'

পেছন দিক থেকে এসেছে আওয়াজ, ওদিকে ছুটল দুই গোয়েন্দা। একটা দরজা সামান্য ফাঁক হয়ে আছে, ওখান দিয়েই বোধহয় বেরিয়ে গেছে মোটা লোকটা, তাড়াহুড়োয় খেয়াল করেনি ভালমত লাগল কি-না।

ঢুকে পড়ল দুজনে। আবছা অন্ধকার। মিটমিট করে চোখে সইয়ে নিল স্বল্প আলো।

কান পেতে শুনছে। নীরব। কোথায় যেন পুরানো তক্তায় চাপ লাগার মৃদু খচখচ আওয়াজ হলো।

'ওই যে, ওই হলটায় ঢুকেছিলাম তখন,' হাত তুলে দেখাল কিশোর। 'চলো, উল্টো দিকের ঘরটায় ঢুকি। ওই যে দরজা।'

ঠেলা দিতেই খুলে গেল দরজাটা। বড় একটা লিভিং রুম। ঘুলঘুলি লাগানো মস্ত জানালা আছে একটা।

'কে...কে ওখানে?' দুর্বল কণ্ঠে বলে উঠল কেউ জানালাটার কাছ থেকে। জানালার নিচে বিশাল এক ফুলের টব, লাল একটা ফুল ফুটে আছে। মুসার মনে হলো, ফুলটাই যেন কথা বলেছে।

'কেউ...কেউ এসেছ?' গুঙিয়ে উঠল যেন ফুলটা।

টবের ছড়ানো পাতার ওপাশে একটা নড়াচড়া চোখে পড়ল মুসার। বড় বড় পাতাগুলো প্রায় ঢেকে রেখেছে শরীরটা।

'ওই যে,' চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

কাত হয়ে পড়ে আছে রোগা পাতলা একটা দেহ, হাত-পা বাঁধা।

বাঁধন খুলে মিস্টার ফোর্ডকে ধরে ধরে এনে একটা সোফায় বসিয়ে দিল মুসা আর কিশোর। ক্লান্তিতে এলিয়ে পড়লেন তিনি। ফিসফিস করে ধন্যবাদ দিলেন ছেলেদের।

একটা চেয়ার টেনে মুখোমুখি বসল কিশোর। 'পুলিশকে খবর দিচ্ছি।'

'না না,' আঁতকে উঠলেন ফোর্ড। 'ফোনও নেই। খবর দেয়া যাবে না।'

'আমাদের গাড়িতে ওয়্যারলেস টেলিফোন আছে।'

'না,' গড়িয়ে পড়লেন তিনি, কনুইয়ে ভর দিয়ে আধশোয়া হয়ে তাকালেন কিশোরের দিকে। 'তুমি কে? এখানে এলে কিভাবে?'

একটা কার্ড বের করে দিল কিশোর। মিস্টার ক্রিস্টোফার তাদেরকে পাঠিয়েছে, জানাল।

'ডেভিসের কাছে আমি ঋণী হয়ে গেলাম।'

'সত্যি বলছেন পুলিশ ডাকব না? আপনাকে জোর করে বেঁধে ফেলে রেখে গেল, এটা অপরাধ...'

'না। তোমরা গোয়েন্দা, তোমরাই আমার কাকাতুয়াটাকে খুঁজে দাও। পুলিশকে আর ডাকছি না আমি। জানিয়েছিলাম ওদের। প্রথমে বলল, হয়তো উড়ে চলে গেছে। আমি চাপাচাপি করায় শেষে বলল, পাবলিসিটির জন্যে নাকি আমি এমন করছি।'

'হুঁ, বুঝলাম। এখন ডাকলে আবার বলবে, পাবলিসিটির নতুন ফন্দি করেছেন।'

'হ্যাঁ, বুঝেছ। তাহলে কোন পুলিশ নয়, কথা দাও?'

কথা দিল কিশোর, পুলিশকে কিছু বলবে না। হারানো কাকাতুয়ার ব্যাপারে সব খুলে বলার অনুরোধ জানাল।

'বিলিকে খুব ভালবেসে ফেলেছি,' বললেন ফোর্ড। 'ওর পুরো নাম বিলি শেকসপীয়ার। উইলিয়াম শেকসপীয়ার কে ছিলেন, নিশ্চয় জানো।'

'জানি। দুনিয়ার সেরা নাট্যকারদের একজন। পনেরোশো চৌষট্টি সালে ইংল্যাণ্ডে জন্মেছিলেন, মারা গেছেন ষোলোশো ষোলো সালে। তাঁর নাটকগুলো এখনও মঞ্চস্থ হয় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। বেশি জনপ্রিয় নাটকটা বোধহয় 'হ্যামলেট'।

'বহুবার অভিনয় করেছি আমি হ্যামলেটে,' উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন ফোর্ড। 'দর্শকরা বলত, খুব ভাল অভিনয় করি।' সোজা হয়ে বসে এক হাত রাখলেন বুকে, আরেক হাত সোজা করে নাটকীয় ভঙ্গিতে ভরাট গলায় বললেন, 'টু বি, অর নট টু বি, দ্যাট ইজ দা কোয়েশচেন।' ছেলেদের দিকে ফিরে বললেন, 'হ্যামলেটের একটা ডায়লগ। সম্ভবত শেকসপীয়ারের লেখার সবচেয়ে পরিচিত লাইন। আমার কাকাতুয়াটাও শিখেছিল, বার বার আউড়াতো।'

'শেকসপীয়ারের ডায়লগ বলত?' মুসা বলল। 'খুব শিক্ষিত পাখি তো।'

'তা বলতে পারো। কথায় ব্রিটিশ টান ছিল। একটা মাত্র জন্মদোষ ছিল পাখিটার।'

'জন্মদোষ?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'হ্যাঁ, তোতলামি। সে বলত ঃ টু-টু-টু বি অর নট টু-টু-টু বি, দ্যাট ইজ দা কোয়েশচেন।'

আগ্রহে উজ্জ্বল হলো কিশোরের চোখ। 'শুনলে, মুসা? কাকাতুয়া তোতলায়, এই প্রথম শুনলাম। বোঝা যাচ্ছে, দারুণ একখান কেস পেয়েছি।'

মুসারও তাই মনে হলো। তবে কিশোরের মত খুশি হলো না, শঙ্কিত হলো।

বিশ্রাম নিয়ে শক্তি ফিরে পেয়েছেন আবার মিস্টার ফোর্ড। খুলে বললেন সব। তিন হপ্তা আগে পাখিটা কিনেছেন তিনি, এক ফেরিওলার কাছ থেকে। ছোটখাট একজন লোক, কথায় জোরালো মেকসিকান টান, গাধায় টানা ছোট একটা গাড়িতে করে এসেছিল।

'এক মিনিট স্যার,' হাত তুলল কিশোর। 'আপনার বাড়িতে এল কি করে সে?'

'ও, মিস জলি বোরো পাঠিয়েছে, আমার পাশের ব্লকটায়ই থাকে। সে-ও একটা কাকাতুয়া কিনেছে। যখন শুনল, শেকসপীয়ারের ডায়লগ বলে বিলি, ভাবল, আমি ইনটারেসটেড হব। তাই পাঠাল।'

'তাই?' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'সব সময়ই কাকাতুয়া ফেরি করে নাকি লোকটা? পাখিই শুধু বিক্রি করে?'

'তা-তো জানি না,' চোখ মিটমিট করলেন ফোর্ড। 'আমার কাছে যখন এল, সঙ্গে মাত্র দুটো খাঁচা। একটায় বিলি। আরেকটায় অদ্ভুত একটা কালচে পাখি, দেখে মনে হয়েছে বারোমেসে রোগী। ফেরিওলা জানাল, ওটা দুর্লভ কালো কাকাতুয়া। কিন্তু ওরকম কোন পাখি আছে বলে শুনিনি। লোকটা বলল, পাখিটার রোগা চেহারা দেখে কেউ কিনতে চায় না।'

'ফেরিওলার নাম জিজ্ঞেস করেছিলেন? কিংবা গাড়িটার কোন নাম ছিল?'

'না,' মাথা নাড়লেন অভিনেতা। 'পুরানো মলিন কাপড়চোপড় পরনে ছিল, কাশছিল বারে বারে। কাকাতুয়াটা বিক্রি করতে পারলে যেন বেঁচে যায়, এমন ভাবসাব। জিজ্ঞেস করায় বলল, তোতলা বলে নাকি কিনতে চায় না কেউ।'

'গাড়িটা সাধারণ দু-চাকার গাড়ি, না?'

'হ্যাঁ। কবে যে রঙ করেছে কে জানে। গাধাটার স্বাস্থ্যও বিশেষ সুবিধের না। ডিংগো বলে ডাকছিল।'

'কিশোর,' মুসা বলল, 'কাকাতুয়াটা চুরি করে আনেনি তো?'

'মনে হয় না। খোলাখুলি রাস্তায় নিয়ে বেরোনোর সাহস করত না তাহলে।' চিন্তিত দেখাচ্ছে কিশোরকে। 'তবে একটা ব্যাপার পরিষ্কার, বিলির আসল মালিক নয় সে, বুলিও সে শেখায়নি।'

'কি করে বুঝলে?'

'সহজ। মিস্টার ফোর্ড বলছেন, কাকাতুয়াটার কথায় ব্রিশিট টান ছিল। অথচ ফেরিওলার কথায় মেকসিকান টান।'

'বিষ খেয়ে মরা উচিত আমার,' কি শাস্তি হওয়া উচিত তার সে-ব্যাপারে

বিন্দুমাত্র স্বজনপ্রীতি দেখাল না মুসা, মনে মনে বলল। 'এই সহজ কথাটা বুঝলাম না? আমি গোয়েন্দাগিরির অযোগ্য।'

'মিস্টার ফোর্ড,' বলল কিশোর, 'পাখিটা হারাল কিভাবে খুলে বলুন তো।'

'বলছি,' ছোট্ট কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিলেন অভিনেতা। 'দিন তিনেক আগে বিকেলে হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। দরজায় তালা লাগাইনি, জানালাও খোলা ছিল। ফিরে এসে দেখলাম বিলি নেই। ড্রাইভওয়েতে গাড়ির চাকার দাগ। আমার নিজের কোন গাড়ি নেই। অনুমান করতে অসুবিধে হলো না, গাড়ি করে এসেছিল, বিলিকে চুরি করে নিয়ে গেছে।' ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, 'অথচ পুলিশের বক্তব্য, বিলি উড়ে চলে গেছে। আচ্ছা তুমিই বলো, খাঁচা নিয়ে উড়ে যায় কি করে কাকাতুয়া? সম্ভব? এই হলোগে আমাদের পুলিশ সাহেবদের বুদ্ধি।'

'না, তা সম্ভব নয়,' একমত হলো কিশোর। 'আজকের কথা বলুন। কি কি ঘটেছিল? কেন এসেছিল মোটা লোকটা? কেনই বা আপনাকে বেঁধে ফেলে গেল?'

'ওই শয়তানটা!' জ্বলে উঠলেন ফোর্ড। 'প্রথমে এসে বলল, তার নাম হাইমাস, পুলিশের লোক। ভাবলাম, বুঝি মত পালটেছে পুলিশ, আমার পাখিটার ব্যাপারে তদন্ত করতে এসেছে। ডেকে এনে বসালাম ঘরে। নানা রকম প্রশ্ন শুরু করল কাকাতুয়া সম্পর্কে। ফেরিওলার কাছ থেকে আমার প্রতিবেশি কেউ আর কোন কাকাতুয়া কিনেছে কিনা জানতে চাইল। মিস জলি বোরোর কথা বললাম।

'শুনে খুব উৎসাহী হয়ে উঠল ব্যাটা। জিজ্ঞেস করল, আমার কাকাতুয়াটা কি বুলি আউড়ায়। বললাম, সে কথা পুলিশকে আগেই বলেছি। দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়ল লোকটা। আরেকবার বলার জন্যে অনুরোধ করল। নিছক রুটিন-চেকের খাতিরেই নাকি শুনতে চায়। বললাম ঃ মাই নেইম ইজ বিলি শেকসপীয়ার। টু বি অর নট টু বি দ্যাট ইজ দা কোয়েশচেন।

'শুনে খুব উত্তেজিত হয়ে উঠল সে। নোট বই বের করে লিখে নিল।'

'পাখিটা যে তোতলায় বলেননি তাকে?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'না,' কপালে হাত বোলালেন অভিনেতা। 'বললে পুলিশ হাসবে মনে করে বলিনি। সোজা কথাই বিশ্বাস করে না, আর তোতলা কাকাতুয়ার কথা করবে।'

'অথচ, মিস্টার হাইমাস খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ল,' বলল কিশোর, ঠিক প্রশ্ন নয়। 'আর কিছু জানাতে পারেন?'

'না, আর তেমন কিছু···' মাথা নাড়তে গিয়েও নাড়লেন না অভিনেতা, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। হাইমাস জিজ্ঞেস করেছে, ফেরিওলার কাছে বিক্রি করার মত আর কোন কাকাতুয়া ছিল কিনা। কালো পাখিটার কথা জানালাম। বলতেই এমন উত্তেজিত হয়ে পড়ল!

'নিশ্চয় ব্ল্যাকবিয়ার্ড, চেঁচিয়ে উঠল সে। হ্যাঁ, নিশ্চয় ব্ল্যাকবিয়ার্ড। তার এই ভাবভঙ্গি দেখে সন্দেহ হলো আমার। শিওর হয়ে গেলাম, হাইমাস পুলিশের লোক নয়।'

নোট নিতে নিতে মুখ তুলল কিশোর, 'মিস্টার ফোর্ড, আপনার কাকাতুয়া কেমন তা-ই জিজ্ঞেস করা হয়নি। কি জাতের? নানারকম প্রজাতি আছে, জানেনই

তো।'

'সরি, জানি না। তবে বিলি খুব সুন্দর, মাথা আর বুক হলুদ রঙের।'

'হ্যাঁ, তারপর? হাইমাস বুঝল, আপনি সন্দেহ করেছেন?'

'বুঝবে কি? আমিই তো বলছি। রেগে গিয়ে বলেছি,' কিভাবে বলেছেন, অভিনয় করে দেখালেন, 'তুমি পুলিশের লোক নও। তুমি একটা ভণ্ড, প্রতারক, চোর, আমার বিলিকে চুরি করেছ। জলদি ওকে ফিরিয়ে দাও, নইলে মজা বুঝিয়ে ছাড়ব।'

'তারপর?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'তারপর, বাইরে একটা শব্দ শুনলাম। লাফ দিয়ে উঠে জানালার কাছে চলে গেল হাইমাস। গাড়িপথ ধরে তোমাদেরকে আসতে দেখল। ভাবল, পুলিশ নিয়ে এসেছ। আমাকে কাবু করে হাত-পা বেঁধে ফেলল। মুখে রুমাল গুঁজে দিল, তার আগে কয়েকবার চেঁচাতে পেরেছি। বেশি ঠেসে ঢোকায়নি রুমাল, পরে আবার ফেলে দিতে পেরেছি। তা নইলে তোমাদের ডাকতে পারতাম না।' হাত নাড়লেন ফোর্ড। 'কিন্তু কেন কি হচ্ছে, কিছুই মাথায় ঢুকছে না। আমি তো কারও কোন ক্ষতি করিনি। আমারই পাখি চুরি করেছে, আমার ওপরই যত···যাকগে, এখন আমার বিলিকে ফেরতে পেলেই হলো। তোমরা সাহায্য করবে?'

'সাধ্যমত করব স্যার,' কথা দিল কিশোর।

মিস্টার ফোর্ডের কাছে আর কিছু জানার নেই। তাঁকে ধন্যবাদ আর বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে এল দুই গোয়েন্দা।

ডলে ডলে গাড়িটাকে আরও চকচকে করে তুলছে হ্যানসন, ছেলেদেরকে দেখে থেমে গেল। 'এবার কোথায় যাব, মাস্টার পাশা?'

'বাড়ি চলুন।'

আঁকাবাঁকা লম্বা গাড়িপথ পেরোচ্ছে রোলস রয়েস। মুসার দিকে ফিরল কিশোর। 'মনে হয়, হাইমাসই বিলিকে চুরি করেছে। আরও তথ্য জানার জন্যেই ফিরে এসেছে, মিস্টার ফোর্ডের সঙ্গে কথা বলেছে। আমাদের পয়লা কাজ, ওকে খুঁজে বের করা।'

'আমি ভরসা পাচ্ছি না,' সত্য কথাই বলল মুসা। 'খুব বাজে লোক। তখন সিগারেট লাইটার বের করে ভয় দেখিয়েছে। ঠেকায় পড়লে আসল পিস্তল বের করে গুলিও করে বসতে পারে, ওকে বিশ্বাস নেই। তাছাড়া, কি সূত্র আছে আমাদের হাতে? খুঁজে বের করব কিভাবে?'

'সেটাই ভাবছি। কোন উপায় নিশ্চয়···হ্যানসন, লাগল লাগল!'

সতর্ক করার দরকার ছিল না। কিশোরের আগেই ধূসর সেডানটাকে দেখে ফেলেছে হ্যানসন। সাঁই করে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে রাস্তা থেকে সরিয়ে নিয়েছে রোলস রয়েসকে। পুরানো, অবহেলিত একটা ফুলের বিছানা মাড়িয়ে একেবারে নষ্ট করে দিল। আর কিছু করারও ছিল না।

বেখেয়ালে গাড়ি চালাচ্ছে সেডানের ড্রাইভার। দুর্ঘটনা যে এড়ানো গেছে, এই যথেষ্ট, তা-ও হ্যানসন সতর্ক থাকায়।

তিন

আর ইঞ্চিখানেক এদিক ওদিক হলেই লেগে যেত একটার সঙ্গে আরেকটা, রোলস-রয়েসের চাকচিক্য তো বটেই, বডির মসৃণতাও নষ্ট হত অনেকখানি।

দরজা খুলে ভারিক্কি চালে নেমে গেল হ্যানসন। সেডানের ড্রাইভিং সীটে বসা ছোট্ট মানুষটার মুখোমুখি হলো। কড়া দৃষ্টি লোকটার। দোষ তো করেছেই, উল্টে নেমে এসে কৈফিয়ত চেয়ে বসল, হ্যানসন কিছু বলার আগেই।

'দেখেশুনে চালাতে পারো না, গরিলা কোথাকার?' চেঁচিয়ে উঠল তীক্ষ্ণচোখো। হ্যানসনের ছয় ফুট দুই ইঞ্চির কাছে তাকে এতটুকু মনে হচ্ছে। তা-ও কি দাপট!

'দেখো, বাপু,' সম্ভ্রান্ত ইংরেজের মত কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব নিচু রাখল হ্যানসন, 'দোষটা আমার নয়, তোমার। এত স্পীডে গাড়ি ঘোরায় কেউ? গেট দিয়ে ঢুকতে চায়? আরেকটু হলেই তো দিয়েছিলে দুটো গাড়িকেই নষ্ট করে।'

'দেখো,' গর্জে ওঠার আগে এক পা পিছিয়ে গেল লোকটা, বেশি সামনে থেকে গালমন্দ করার সাহস হচ্ছে না বোধহয়, 'চাকরের মুখ থেকে উপদেশ শুনতে চাই না।'

'ভদ্রভাবে কথা বলো,' শান্ত কণ্ঠে বলল হ্যানসন। 'নইলে ভদ্রতা শিখিয়ে দেব। এক চড়ে ফেলে দেব বত্রিশটা দাঁত।'

রাগে ঘুসি পাকিয়ে এগিয়ে এল তীক্ষ্ণচোখো।

আলগোছে তার হাতটা ধরে ফেলল হ্যানসন, আরেক হাতে কলার চেপে ধরে শূন্যে তুলে ফেলল। হাস্যকর ভঙ্গিতে ছটফট করতে লাগল লোকটা, করুণ হয়ে উঠেছে মুখচোখ।

সেডানের পেছনের দরজা খুলে নামল আরেকজন লোক। দামী বেশভূষা। ধমক দিল, 'টমাস। গাড়িতে যাও।' বেশ ভারি গলা, আদেশ দিতে অভ্যস্ত, বোঝা গেল কণ্ঠস্বরেই। কথায় ফরাসী টান। সরু গোঁফ, ঠোঁটের কোণে একটা বড় তিল।

হাত থেকে টমাসকে ছেড়ে দিল হ্যানসন।

পড়ে যেতে যেতে কোনমতে সামলে নিল টমাস। দ্বিধা করল। ফিরে গেল গাড়িতে। পেছনে আরেকজন বসে আছে, হোঁতকা, কুৎসিত চেহারা। দেখছে।

'সরি,' হ্যানসনকে বলল দ্বিতীয় যে লোকটা বেরিয়ে এসেছে সে, 'খুব বাজে কাজ করেছে আমার ড্রাইভার।' রোলস-রয়েসটার দিকে চোখের ইশারা করে বলল, 'খুব সুন্দর গাড়ি। রঙ-টঙ নষ্ট হলে আমারই খারাপ লাগত। তা, তোমার মালিক কে? আমার সঙ্গে একটু কথা বলবেন?'

একে একে এত দ্রুত ঘটনাগুলো ঘটে গেছে, বাধা দেয়ার বা কিছু করার সুযোগই পায়নি কিশোর। এখন নেমে এল।

'আপনি আমার সঙ্গে কথা বলতে চান?'

অবাক হলো বিশালদেহী লোকটা। 'তুমি…মানে…আপনি এটার মালিক?'

'তুমি বললে কিছু মনে করব না,' বলল কিশোর। 'হ্যাঁ, আপাতত আমিই

মালিক। পরে কি হবে জানি না।'

'অ।' দ্বিধা করছে লোকটা। 'তুমি…মানে, মিস্ট্যার ফোর্ডের সঙ্গে কথা বলতে এসেছিলাম। তুমি কি তার কিছু হও?'

'তা, বন্ধু বলতে পারেন। এই তো, আমরাও কথা বলে বেরোলাম।'

'তাহলে হয়তো বলতে পারবে। আচ্ছা, তাঁর বিলি শেকসপীয়ারের কি অবস্থা?'

'পাওয়া যায়নি এখনও। খুব মনের কষ্টে আছেন বেচারা।'

'এখনও পাওয়া যায়নি,' লোকটার মুখ দেখে বোঝা গেল না কিছু, ভাবান্তর হয়নি চেহারায়। 'সত্যি খুব খারাপ কথা। কোন খবরই নেই?'

'না পুলিশের কাছেই যাচ্ছি, কতদূর কি করল, জানতে। আপনার কথা বলব? সাহায্য-টাহায্য করতে চান নাকি?'

'না না,' তাড়াতাড়ি দু-হাত নাড়ল লোকটা, 'আমার কথা বলার দরকার নেই। আমি মিস্টার ফোর্ডের বন্ধু। এ-পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম। ভাবলাম, খোঁজটা নিয়েই যাই। তোমার কাছেই খবর পাওয়া গেল যখন, এখন আর যাচ্ছি না। তাড়া আছে আমার, অন্য সময় আসব। যাই।'

নাম-ধাম কিছুই বলল না লোকটা, দ্রুত গিয়ে গাড়িতে উঠে ড্রাইভারকে বলল, 'টমাস, গাড়ি ছাড়ো। হোটেলে চলো।'

'ইয়েস, স্যার,' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করল তীক্ষ্ণচোখো ড্রাইভার। হ্যানসনের দিকে আরেকবার দৃষ্টির আগুন হেনে গাড়ি পিছাতে শুরু করল। ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল।

'খুব চমৎকার সামলেছেন, স্যার,' প্রশংসা করল হ্যানসন। 'আপনার চাকরি করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি,' কিশোরের বার বার নিষেধ সত্ত্বেও অতিবিনয় প্রকাশ করে ফেলে সে মাঝেমাঝে, দীর্ঘ দিনের স্বভাব বদলাতে পারে না।

'থ্যাংক ইউ,' বলে গাড়িতে উঠল কিশোর।

'কিশোর,' কৌতূহলে ফেটে পড়ছে মুসা, লোকটার সঙ্গে কিশোরের কি কথা হয়েছে শুনতে পায়নি, 'এত সহজে তাড়ালে কি করে? মনে তো হলো খুব শক্তপাল্লা। ওসব লোককে চিনি আমি, অন্ধকার গলিপথে সামনে পড়লে ঝেড়ে দৌড় দেব। মনে হলো, তুমিই ওকে ভয় পাইয়ে দিয়েছ?'

চেপে রাখা নিঃশ্বাস ফোঁস করে ছাড়ল কিশোর। হেলান দিল গদিতে। 'তেমন কিছু না। শুধু পুলিশের নাম বলেছিলাম।'

'আজকাল পুলিশ এত ভয় দেখাতে শুরু করেছে লোককে,' গাড়ি পিছিয়ে আবার রাস্তায় তুলছে হ্যানসন, সেদিকে চেয়ে বলল মুসা। 'আগে জানতাম শুধু বদ লোকেরাই ভয় পায়…'

'যারা পালাল, তারাও বদলোক,' মুসার কথার পিঠে বলল কিশোর। 'ড্রাইভারের কোটের তলায় নিশ্চয় শোল্ডার-হোলস্টার আছে। খেয়াল করোনি, হ্যানসন যখন ওকে ধরেছে, বগলের তলায় হাত দিতে যাচ্ছিল? খুন খারাপি অপছন্দ করে না সে।'

'পিস্তল?' ঢোক গিলল মুসা। 'ব্যবহার করে?'

'আরেকটু হলেই আজও করে ফেলেছিল। মনিবের জন্যে পারল না। তার মনিব খুব উঁচুদরের লোক, বোঝাই যায়। এমন একজন মানুষ বন্দুকবাজ ড্রাইভার রেখেছে কেন?'

প্রায় নিঃশব্দে, মসৃণ গতিতে আবার চলতে শুধু করেছে রোলস-রয়েস।

'ভাবছি,' গাল চুলকাল মুসা, 'এসব লোকের সঙ্গে জড়াচ্ছি কেন? একটা সাধারণ কাকাতুয়া খুঁজতে বেরিয়েছিলাম আমরা।'

'তা বেরিয়েছিলাম,' স্বীকার করল কিশোর।

'তাহলে? আজব এক মোটা লোকের পাল্লায় পড়লাম শুরুতেই। তারপর আরেক লোক, পোশাক-আশাকে ভদ্রলোক, কিন্তু বন্দুকবাজ পোষে। রহস্যময় এক মেকসিকান ফেরিওলার কথাও শুনলাম। সবাই পাখিটার ব্যাপারে আগ্রহী।'

'মেকসিকান ফেরিওয়ালা বাদে,' শুধরে দিল কিশোর। 'পাখিটা বেচে দিয়ে গেছে, ব্যস। আর আসেনি।'

'কিন্তু কেন? তোতলা একটা কাকাতুয়া এমন কি দামী জিনিস, চুরি করার জন্যে, হাতে পাওয়ার জন্যে খেপে উঠেছে সবাই?'

'তদন্ত করলে জবাব মিলবে। এ-মুহূর্তে তোমার মতই অন্ধকারে আছি আমি।'

'থাকার দরকারটা কি?' গজগজ করল মুসা। 'আমি বলি কি, শোনো...'

হঠাৎ গতি কমে গেল রোলস-রয়েসের।

'কি হয়েছে, হ্যানসন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'এক মহিলা। রাস্তায় এসে উঠেছেন। কিছু হারিয়েছেন বোধহয়।'

জানালা দিয়ে মুখ বের করল দুই গোয়েন্দা। ততক্ষণে ব্রেক কষে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ফেলেছে হ্যানসন।

বেঁটে, গোলগাল এক মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন রাস্তার ওপর, গাড়ি-ঘোড়া আসছে কিনা খেয়ালই নেই। ঝোপের দিকে চেয়ে কাকে জানি ডাকছেন। 'এসো, লক্ষ্মী, এসো, জলদি এসো। দেখো কি এনেছি। খুব ভাল সূর্যমুখীর বীচি।'

'বোধহয় কিছু গণ্ডগোল হয়েছে,' গাড়ি থেকে নামতে শুরু করল কিশোর। 'চলো তো, দেখি।'

মহিলার দিকে হাঁটতে শুরু করল দুই গোয়েন্দা। কিন্তু কোন খেয়ালই নেই মহিলার। ঝোপের দিকে চেয়ে মুঠো খুলে দেখালেন, কত ভাল লোভনীয় বীচি এনেছেন।

'মাপ করবেন,' কাছে এসে বলল কিশোর। 'কিছু হারিয়েছেন বুঝি?'

'অ্যাঁ...হ্যাঁ,' পাখির মত মাথা একপাশে কাত করে অনেকটা পক্ষীকণ্ঠেই বললেন মহিলা। 'এই দেখো না, লিটল বো-পীপকে খুঁজে পাচ্ছি না। কোথায় যে গেছে কে জানে? তোমরা নিশ্চয় দেখোনি, না? লিটল বো-পীপকে?'

'না, ম্যাডাম,' জবাব দিল কিশোর। 'লিটল বো-পীপ কি কোন কাকাতুয়া?'

'নিশ্চই,' বিস্ময় ফুটল মহলিার চোখে। 'তুমি জানলে কি ভাবে?'

পকেট থেকে কার্ড বের করে দিল কিশোর। 'আমরা গোয়েন্দা। বুঝতে পারছি, কাকাতুয়াই খুঁজছেন আপনি। ওই যে, ঘাসের ওপর খাঁচাটা ফেলে রেখেছেন।

হাতে সূর্যমুখীর বীচি, ডাকাডাকি করছেন ঝোপের দিকে চেয়ে। কাকাতুয়া ছাড়া আর কি?'

আরও বেশি অবাক হলেন মহিলা। 'বাহ্, বেশ বুদ্ধি তো।'

তারপর আরও কয়েকবার ডাকাডাকি করে হতাশ হয়ে দুই গোয়েন্দাকে নিয়ে রওনা হলেন বাড়ির দিকে, লিটল বো-পীপের নিখোঁজের ব্যাপারে খুলে বলবেন।

'হ্যানসন, আপনি এখানেই থাকুন,' ডেকে বলল কিশোর।

ইঁট বিছানো পথ ধরে মহিলার পিছু পিছু চলল দুই গোয়েন্দা। সামনে অনেকগুলো কলা-ঝাড়ের ওপাশে একটা বাংলো।

ছোট লিভিং রুমে দুই গোয়েন্দাকে বসালেন মহিলা, নিজেও বসলেন।

'মিস বোরো,' বলল কিশোর, 'কয়েক হপ্তা আগে এক মেক্সিকান ফেরিওলার কাছ থেকে কাকাতুয়াটা কিনেছিলেন, না?'

'হ্যাঁ,' চোখ বড় বড় হয়ে গেল তাঁর। 'আমার নামও জানো দেখছি? তুমি তো খুব ভাল গোয়েন্দা।'

'আগে থেকেই তথ্য জানা থাকলে ওগুলো বলা শক্ত কিছু না।' কিশোর জানাল, 'মিস্টার ফোর্ড আপনার কথা বলেছেন।'

'তথ্য জানা থাকলেও অনেকেই বলতে পারে না,' বললেন মিস বোরো। 'আর তথ্য জোগাড় করতেও বুদ্ধি লাগে। যাই হোক, মিস্টার ফোর্ড নিশ্চয় বিলিকে খুঁজে পেয়েছেন।'

'না, পাননি,' মুসা বলল। 'ওকে খুঁজে বের করার চেষ্টা চালাচ্ছি আমরা। আপনারটা হারাল কি করে, বলবেন, প্লীজ?'

'দোকানে গিয়েছিলাম,' মুখ বাঁকালেন মিস বোরো। 'বীচি ফুরিয়ে গিয়েছিল। সূর্যমুখীর বীচি খুব পছন্দ করে বো-পীপ। গেট দিয়ে বেরিয়েই মরতে বসেছিলাম, প্রায় চাপা দিয়ে দিয়েছিল আমাকে কালো একটা গাড়ি। বিদেশী গাড়ি। আজকাল লোকে যা বেখেয়ালে চালায় না।'

একে অন্যের দিকে তাকাল কিশোর আর মুসা। গাড়িটা কার অনুমান করতে কষ্ট হলো না কারোই।

'থামতে বললাম, থামল না,' বলে গেলেন মিস বোরো। 'কি আর করার আছে? ভয় পেয়ে পালিয়েছে যখন? দোকানে গিয়ে বীচি কিনলাম। কোন্ বীচি ভাল, কোন্টা খারাপ, খানিকক্ষণ আলোচনা করলাম দোকানের মেয়েটার সঙ্গে। ফিরে এসে দেখি বো-পীপের খাঁচার দরজা খোলা। সে নেই। বোধহয় দরজা খোলাই রেখে গিয়েছিলাম, এই ফাঁকে বেরিয়ে গেছে। ভাবলাম, কোন ঝোপঝাড়ে গিয়ে লুকিয়েছে। খুঁজতে খুঁজতে চলে গেলাম রাস্তায়...তারপর তো তোমাদের সঙ্গে দেখা।'

'কালো গাড়িটাকে পরে আর দেখেছেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'না,' মাথা নাড়লেন মিস বোরো। 'সাঁ করে গিয়ে মোড় নিয়ে হারিয়ে গেল। গাছপালা ঝোপঝাড় বেশি, মোড় নিলে আর দেখা যায় না।' ভুরু কোঁচকালেন। 'ওই মোটা লোকটাই চুরি করেছে বলছ নাকি?'

'তাই তো মনে হয়, ম্যাডাম,' বলল কিশোর। 'আমার ধারণা, বিলিকেও সে-ই চুরি করেছে।'

'সর্বনাশ!' অসহায় মনে হচ্ছে মহিলাকে। 'তাহলে তো আর তাকে পাব না। কি নিষ্ঠুর গো। লোকের মনে কষ্ট দেয়। কিন্তু দুটো কাকাতুয়া চুরি করতে যাবে কেন? ইচ্ছে করলে তো কিনেই নিতে পারে।'

এই প্রশ্নটার জবাব মুসারও খুব জানতে ইচ্ছে করছে।

কিন্তু জবাব জানা নেই গোয়েন্দাপ্রধানের। 'আপাতত এটা রহস্য,' বলল সে। 'আচ্ছা, মিস বোরো, আপনার লিটল বো-পীপ কি কথা বলতে পারে?'

'নিশ্চয় পারে। লিটল বো-পীপ বলে তার ভেড়াটা হারিয়েছে। কোথায় হারিয়েছে, জানে না। খুঁজে দেয়ার জন্যে ডাকাডাকি করে শারলক হোমসকে। অদ্ভুত কথা, তাই না? কাকাতুয়াকে আরও কত রকম বুলিই তো শেখানো যায়।'

'তা যায়, নোট বই বের করল কিশোর। 'ঠিক কি কি বলত বলুন তো?'

'লিটল বো-পীপ হ্যাজ লস্ট হার শীপ অ্যাণ্ড ডাজ্‌ন্ট্‌ নো হোয়্যার টু ফাইণ্ড ইট। কল অন শারলক হোমস।'

দ্রুত লিখে নিয়ে বলল কিশোর, 'কথায় ব্রিটিশ টান আছে?'

'আছে। মনে হয়, খুব যত্ন করে শিখিয়েছে কোন উচ্চ শিক্ষিত ইংরেজ ভদ্রলোক।'

'হুঁ। মিস বোরো, যা মনে হচ্ছে আপনার বো-পীপকে হাইমাসই মানে, মোটা লোকটাই চুরি করেছে। পুলিশকে ফোন করে জানান।'

'পুলিশ? ও, মাই গুডনেস!' আঁতকে উঠলেন মহিলা। 'ফোন নেই আমার। তাছাড়া পুলিশের ঝামেলায় যাব না। এত দূরে শহরে গিয়ে ওদের সাহায্য চাইতে বলছ? যাক, লাগবে না আমার।' অনুরোধ করলেন, 'প্লীজ, তোমরাই খুঁজে দাও। দেবে?'

'তা দিতে পারি,' বলল কিশোর। 'একই সঙ্গে দুটো তদন্ত চালানো এমন কিছু কঠিন না, তাছাড়া চোর যখন একজন।'

'প্লীজ। তোমার কথা চিরদিন মনে রাখব তাহলে। দেবে শুনেই যা ভাল্লাগছে না।'

'আরেকটা প্রশ্ন, মিস বোরো,' তর্জনী তুলল কিশোর। 'মেকসিকান ফেরিওয়ালা দুই চাকার একটা গাধায় টানা গাড়িতে করে এসেছিল, না?'

'হ্যাঁ। খুব কাশছিল। মনে হচ্ছিল, ভারি অসুখ। বেচারাকে দেখে খারাপই লাগছিল।'

'কাকাতুয়া বিক্রি করে রসিদ-টসিদ দিয়েছে কিছু?'

'না-তো। ইস্‌, বড্ড ভুল হয়ে গেছে,' শূন্য দৃষ্টিতে তাকালেন মিস বোরো। 'চাওয়ার কথা মনেই ছিল না।'

'গাড়ির গায়ে কোন নাম বা কিছু লেখা ছিল?'

মাথা নাড়লেন মিস বোরো। আর কোন তথ্য দিতে পারলেন না তিনি।

মহিলাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এল দুই গোয়েন্দা।

বাইরে বেরিয়েই কিশোরের বাহু খামচে ধরল মুসা। 'কিশোর, কাকাতুয়া দুটোকে কিভাবে খুঁজে বের করবে? কোথায় আছে ওরা কিছুই তো জানি না। একজন *শেকসপীয়ার* জানে, অরেকজন *মাদার গুজ*। কিন্তু জঙ্গল থেকে ধরে এনে ওই বুলি তো যে কোন কাকাতুয়াকে শেখানো যায়। অযথা সময় নষ্ট করছি, বুঝলে?'

চিন্তিত দেখাচ্ছে কিশোরকে। 'হাইমাসকে দেখে কি মনে হয়েছে তোমার? ছেলেমানুষী করার লোক?'

'মোটেই না,' জোরে মাথা নাড়ল মুসা। 'পিস্তল-চেহারার লাইটার দেখিয়ে যে রসিকতা করতে পারে, সে ছেলেমানুষী করার লোক নয়।'

'একেবারে ঠিক। অথচ সেই লোকই দুই রকম বুলি আউড়ায় এমন দুটো কাকাতুয়া চুরি করল কি কারণে? জোরাল কোন যুক্তি নিশ্চয় আছে, এখন বুঝতে পারছি না।'

কিন্তু তাকেই বা খুঁজে পাব কি করে?'

'আমরা গোয়েন্দা, বুদ্ধির খেলা খেলি। কোনভাবে...সরো সরো!' ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল মুসার ওপর, নিয়ে পড়ল মাটিতে।

খানিক আগে মুসার মাথা যেখানে ছিল, শিস কেটে ঠিক সে-পথে উড়ে চলে গেল কি যেন একটা। ঘাসে ঢাকা নরম মাটিতে গিয়ে গাঁথল।

'সরো...ওহ্, সরো!' ঠেলে গায়ের ওপর থেকে কিশোরকে সরাল মুসা, 'শ্বাস নিতে পারছি না।'

উঠে দাঁড়াল কিশোর।

মুসাও উঠল। জোরে জোরে শ্বাস নিল কয়েকবার।

নিচু হয়ে জিনিসটা তুলছে কিশোর। লাল টালির একটা টুকরো, মিস বোরোর বাংলোর ছাতে যে-ধরনের টালি, ওখান থেকেই ভেঙে নেয়া হয়েছে কিনা কে জানে।

'এটা মাথায় লাগলে না মরলেও বেহুঁশ হয়ে থাকতে কয়েক ঘণ্টা,' কিশোর বলল। 'ভাগ্যিস ঝোপের দিকে চোখ পড়েছিল।'

'থ্যা-থ্যাংকস,' কাঁপছে মুসার গলা। 'ছুড়ল কে?'

'দেখিনি। হুঁশিয়ার করল। ও চায় না আমরা বিলি কিংবা বো-পীপকে খুঁজি।'

চার

রাতের খাওয়া খেতে বসছে রবিন। বার বার তাকাচ্ছে টেলিফোনের দিকে। এই খানিক আগে ফিরেছে লাইব্রেরি থেকে, পার্ট-টাইম চাকরি করে ওখানে।

ইস্ এখনও ফোন করছে না কেন কিশোর?

খাওয়া শেষ হয়ে এসেছে রবিনের, তা-ও ফোন বাজছে না। উঠে গিয়ে সিংকে প্লেট চোবাল, ধুয়ে পরিষ্কার করে এনে রাখল আবার জায়গামত।

কাছেই কাজ করছেন মিসেস মিলফোর্ড।

'মা,' বলল রবিন, 'কিশোর কোন খবর-টবর দিয়েছে?'

'ও, হ্যাঁ হ্যাঁ,' মুখ ফেরালেন তিনি। 'ভুলেই গিয়েছিলাম। একটা মেসেজ আছে।'

'কি মেসেজ?' উত্তেজিত হয়ে উঠল রবিন। 'কি লিখেছে?'

আগের দিন যা যা ঘটেছে, তাকে জানিয়েছে কিশোর। সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্টের ফাইল তৈরি করে ফেলেছে রবিন, এটা তার দায়িত্ব। আজ বিকেলে হেডকোয়ার্টারে কাকাতুয়ার রহস্য নিয়েই আলোচনা করার কথা।

'এই যে, লিখে রেখেছি,' মা বললেন, পকেট হাতড়ে বের করলেন এক টুকরো কাগজ। 'কি যে সব বলে কিশোর, মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝি না। ভুলে যেতাম, তাই লিখে রেখেছি। এই যে।'

'ও ওরকম করেই বলে,' মাকে বোঝাল রবিন, হাত বাড়াল কাগজটার জন্যে। 'বেশি পড়াশোনা করে তো, বড় বড় কঠিন শব্দ আপনাআপনি মুখে চলে আসে। চাচা-চাচীর সঙ্গেও ওভাবেই কথা বলে। বেশিদিন তোমার সঙ্গে ওভাবে বললে তুমিও বুঝে যাবে, আর উদ্ভট লাগবে না।'

'কি বলছে, কিছুই বুঝিনি।' জোরে জোরে পড়লেন মিসেস মিলফোর্ড, 'লাল কুকুর চার। উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। তীর বরাবর বুকে হাঁটবে। সহজ সহজ বাক্য, অথচ মানে করতে গেলে মনে হয় গ্রীক। কি বুঝিয়েছে রে?'

জবাব নেই। রবিন ততক্ষণে পৌঁছে গেছে দরজার কাছে।

ডাকলেন মা। 'এই রবিন, না বলেই চলে যাচ্ছিস যে?'

দরজায় দাঁড়িয়ে ঘুরল রবিন, হতাশ ভঙ্গিতে কপাল চাপড়াল, 'ওফ্ফো, মা, এই সহজ কথাগুলো বুঝতে পারছ না। ইংরেজিই তো লিখেছে।'

'কোথায় ইংরেজি। কোন ধরনের কোড। এই, বল না।'

'হ্যাঁ, কোডই। বাইরের লোক যাতে বুঝতে না পারে...'

'কি বলছিস তুই, রবিন?' মা অবাক। 'আমি তোর মা, বাইরের লোক?'

'তোমাকে বাইরের লোক বললাম নাকি? খালি উল্টোপাল্টা বোঝো। ঠিক আছে, কোন্ কথাটা জানতে চাও?'

'এই যে, উড়ে এসে জুড়ে বসেছে?'

'কয়েকটা হারানো কাকাতুয়াকে খুঁজছি আমরা, ওটারই কোড ঃ উড়ে এসে জুড়ে বসেছে।'

'হুঁ,' মায়ের আশঙ্কা দূর হলো, ভয়ের কিছু নেই, বিপদ হবে না ছেলের।

যাওয়ার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে রবিন, মা আবার প্রশ্ন করার আগেই বলল, 'আর লাল কুকুর চার মানে...'

'থাক থাক, ওগুলোর মানে আর জানার দরকার নেই,' হাত তুললেন মিসেস মিলফোর্ড। 'যা, বেশি রাত করিস না। গির্জার ফাদারকে দাওয়াত করতে যেতে হবে। আগামী রোববারে আমাদের এখানেই খাবেন।'

লাল কুকুর চার হলো তিন গোয়েন্দার হেডকোয়ার্টারে ঢোকার অনেকগুলো পথের একটা। ওটা দিয়ে ঢোকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে মেসেজে।

স্যালভিজ ইয়ার্ডের বেড়ায় নানা রকম ছবি। এক জায়গায় একটা লাল কুকুর বসে আছে, একটা বাড়িতে আগুন লেগেছে, তা-ই দেখছে। কুকুরটার একটা চোখ আসলে কাঠের গিঁট। আলগা। নখ দিয়ে খুঁচিয়ে ওটা বের করে নিল রবিন, ভেতরে আঙুল ঢুকিয়ে গোপন সুইচ টিপল। আস্তে করে তিন দিকে সরে গেল বেড়ার তিনটে অংশ, গোপন দরজার পাল্লা। ভেতরে ঢুকে আবার সুইচ টিপে দরজা বন্ধ করে দিল সে।

এক জায়গায় অনেকগুলো তক্তা আর লোহার বীম আড়াআড়ি পড়ে আছে মনে হয়, ওভাবেই ওগুলো সাজিয়েছে তিন কিশোর। নিচে দিয়ে পথ। বুকে হেঁটে যেতে হয়। ওপরে একটা তীর চিহ্ন। ট্রেলারটা কোনদিকে আছে, তার নির্দেশ।

বুকে হেঁটে এগিয়ে ট্রেলারের নিচে পৌঁছে গেল রবিন। দুইবার টোকা দিতেই ভেতর থেকে তুলে নেয়া হলো একটা পাল্লা। হেডকোয়ার্টারে ঢুকল সে।

হেডকোয়ার্টার মানে তিরিশ ফুট লম্বা একটা বাতিল মোবাইল হোম, জঞ্জালের তলায় চাপা পড়ে আছে। সেটাকে সারিয়ে নিয়ে অফিস সাজিয়েছে তিন গোয়েন্দা। নানারকম সুযোগ-সুবিধে আছে তার মধ্যে। ছোট একটা ল্যাবরেটরিও আছে, আছে ফটো প্রসেস করার ডার্করুম।

ডেস্কের ওপাশে নির্দিষ্ট চেয়ারে বসে আনমনে একটা পেন্সিল কামড়াচ্ছে কিশোর। রবিনকে দেখে বলল, 'এত দেরি যে?'

'মেসেজ দিতে মা ভুলে গিয়েছিল। তবে আগে দিলেও আসতে পারতাম না, না খেয়ে আসতে দিত না। কেন ডেকেছ? জরুরী মীটিং?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'বিলি শেকসপীয়ার আর লিটল বো-পীপকে খুঁজে বের করা দরকার।'

'কিভাবে, তাই তো মাথায় ঢুকছে না,' মুসা বলল। 'মোটকা হাইমাসকে চিনি, সন্দেহ করছি ওই ব্যাটাই চুরি করেছে। ব্যস। আর কোন সূত্র নেই। পুলিশ চেষ্টা করলে হয়তো গাড়িটা খুঁজে বের করতে পারে, কিন্তু তারা তো শুনলে হাসে। এক কাজ করলে কেমন হয়? গিয়ে পুলিশ চীফ ইয়ান ফ্লেচারকে ধরলে?'

'ভুলে যাও কেন?' ভুরু নাচাল কিশোর। 'মিস্টার ফোর্ড আর মিসেস বোরো কেউই পুলিশের সাহায্য নিতে রাজি নন।'

'তাহলে?' দু-হাত নাড়ল মুসা। 'আমি তো কোন উপায়ই দেখছি না।'

'উপায় একটা আছে।'

'আছে?' এক সঙ্গে গলা সামনে বাড়াল রবিন আর মুসা।

'আছে। ভূত-থেকে-ভূতে।'

'আরে, তাই তো,' হাসল রবিন। 'এই কথাটা মনে পড়েনি!'

'আমিও একটা আস্ত গাধা,' হতাশা চলে গেছে মুসার কণ্ঠ থেকে, উত্তেজনা ফুটেছে চেহারায়। 'তা এখুনি শুরু করে দিই না। আগামী কাল সকালেই খোঁজ পেয়ে যাব।'

'তা করতে পারো,' রাজি হলো কিশোর।

'আচ্ছা, একটা পুরস্কার ঘোষণা করলে কেমন হয়?' প্রস্তাব রাখল রবিন।

'তাহলে উৎসাহী হবে বাচ্চারা। তাড়াতাড়ি কাজ হবে।'

'ঠিকই বলছে। কি পুরস্কার দেয়া যায়?'

'আমি বলছি,' হাত তুলল মুসা। 'বলব, যে আগে খোঁজ দিতে পারবে, তাকে রোলস-রয়েসে চড়িয়ে এক ঘণ্টা ঘোরাব।'

'মন্দ না,' বলল কিশোর। 'দেখেছি তো, ছেলেমেয়েরা যেভাবে চকচকে চোখে তাকায় গাড়িটার দিকে। তা নাহয় ঘোরালাম। সেই সাথে কিছু নগদের কথাও বলি? এই বিশ-পঁচিশ ডলার? আরও বেশি আগ্রহী হবে।'

তা-ই ঠিক হলো। গাড়িতে এক ঘণ্টা চড়ানো, আর পঁচিশ ডলার পুরস্কার।

চালু করে দেয়া হলো ভূত-থেকে-ভূতে।

রাত করতে মানা করে দিয়েছেন মা। উঠল রবিন।

বাড়ি ফিরে দেখল গুম হয়ে বসে আছেন মা, হাতে রিসিভার।

'কি হয়েছে, মা? কোন গোলমাল?'

'সেই তখন থেকে কতবার চেষ্টা করছি, মিসেস ফেনারকে আসতে বলব। একা কুলিয়ে উঠতে পারব না, অনেক মেহমান আসবেন, আমাকে একটু সাহায্য করবে সে। লাইনই পাচ্ছি না। সব কটা লাইন এনগেজড। কি যে হলো আজ। একটাও খালি নেই।'

ঢোক গিলল রবিন। জানে, কেন খালি নেই লাইন। কিন্তু সে-কথা মাকে বলা যাবে না।

আবার ডায়াল ঘোরাতে শুরু করলেন মিসেস মিলফোর্ড। মা এভাবে কষ্ট পাচ্ছেন, খারাপই লাগল রবিনের। কিন্তু কিছুই করার নেই তার এখন। সে নিজে চেষ্টা করলেও লাইন পাবে না।

দোতলায় নিজের ঘরে উঠে এল রবিন। কাপড় ছাড়তে ছাড়তে একটা মোটামুটি হিসাব করল ঃ কালো গাড়িটার খোঁজ চেয়ে তারা তিনজনে পাঁচজন করে বন্ধুকে ফোন করেছে। ওরা করবে আরও পাঁচজনকে, হয়ে গেল পঁচাত্তর। তারা করবে আরও পাঁচজনকে। হয়ে গেল তিনশো পঁচাত্তর। তারা আরও পাঁচ···হলো আঠারোশো পঁচাত্তর···তারা আবার পাঁচ···নয় হাজার তিনশো পঁচাত্তর··· আরিব্বাপরে! লস অ্যাঞ্জেলেস আর হলিউডের কোন ছেলেমেয়ের জানতে আর বাকি থাকেব না। লুকাবে কোথায় হাইমাস? নাহ্ কিশোরটা একটা জিনিয়াস, বন্ধুগর্বে আধহাত উঁচু হলো রবিনের বুক।

শুয়ে পড়ল রবিন। বালিশে হাত, তার ওপর মাথা রেখে ভাবতে শুরু করল সে। বিলি শেকসপীয়ার, লিটল বো-পীপ আর তাদের বিচিত্র বুলির কথা। গতকাল থেকেই কিছু আছে, কিন্তু ধরতে পারছে না। এখন আরেকবার চেষ্টা করল। টু-টু-টু বি অর নট···আচ্ছা, কাকাতুয়া তোতলাবে কি করে? সে জানে, এর কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি নেই। ইচ্ছে করেই ভুল শেখায়নি তো? কিন্তু সন্তুষ্ট হতে পারল না রবিন, গোলমালটা ধরতে পারছে না। সেটা অন্য কোথাও।

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল সে। মাঝরাতে ঘুমের ঘোরেই যেন কানের কাছে বলল কেউ ঃ লিটল বো-পীপ হ্যাজ লস্ট হার শীপ অ্যাণ্ড ডাজ্ নট্ নো হোয়্যার টু

ফাইণ্ড ইট। কল অন শার্লক হোমস।

ঘুম ভেঙে গেল রবিনের। অখণ্ড নীরবতা। ভুলটা আবিষ্কার করে ফেলেছে মগজ। তার মনে পড়ল 'মাদার গুজ'-এ লেখা লাইনটা হলো ঃ লিটল বো-পীপ হ্যাজ লস্ট হার শীপ অ্যাণ্ড ডাজ্‌ন্‌ট্ নো হোয়্যার টু ফাইণ্ড দেম।

'দেম'-এর জায়গায় 'ইট' বলে কাকাতুয়াটা।

ব্যাপারটা হয়তো বিশেষ কিছুই নয়। কিন্তু কিশোরের কাছে শিখেছে রবিন, গোয়েন্দাগিরিতে অতি সামান্য ব্যাপারও অবহেলা করতে নেই।

'হুঁম্,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল কিশোর, 'ঠিকই বলেছ, রবিন। এক বচন বহুবচন দুটোর বেলাতেই হয় শীপ, তাই ইট বললেও শুদ্ধ, দেমও শুদ্ধ। কিন্তু...'

'খাইছে!' হাত তুলল মুসা। 'এই, তোমাদের ব্যাকরণ ক্লাস থামাও।' গুঙিয়ে উঠল, 'স্কুলে শুনতে শুনতেই অবস্থা কাহিল...'

হেডকোয়ার্টারে আলোচনায় বসেছে তিন গোয়েন্দা। দশটা বাজতে কয়েক মিনিট বাকি। ভূত-থেকে-ভূতের মাধ্যমে খবর আসার সময় হয়েছে।

'কিন্তু ভুল করেছে,' মুসার কথায় কান দিল না রবিন। 'যিনি শিখিয়েছেন, ভুল তাঁরই।'

'কটা ভুল?' বলল কিশোর। বিলি শেকসপীয়ার তোতলায়, সেটা একটা ভুল। মাদার গুজ থেকে শেখানো হয়েছে লিটল বো-পীপকে, সেখানে আরেকটা ভুল।'

'তাতে কি?' মুসার প্রশ্ন। 'মাত্র তো দুটো। এক গ্রামার ক্লাসেই কয়েক ডজন ভুল করি আমি। আর কবিতা মুখস্থ লিখতে দিলে তো...'

'সেটা তোমার হয়,' বলল কিশোর। 'কিন্তু উচ্চ শিক্ষিত একজন ইংরেজ ভদ্রলোক এই সাধারণ ভুল করবেন না। একটা হলে ধরে নিতাম, নাহয় হয়ে গেছে কোনভাবে। কিন্তু দুটো? উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মনে হয়।'

'উদ্দেশ্যপ্র...' শূন্য দৃষ্টি ফুটল মুসার চোখে। তাকে দোষ দিতে পারল না রবিন। কিশোর পাশার ভাবনার সঙ্গে সব সময় তাল মিলিয়ে চলা কঠিন। অনেক সময় খুব বেশি শর্টকাটে এগিয়ে যায় তার মস্তিষ্ক।

'ইচ্ছে করে ভুল শিখিয়েছেন বলতে চাইছ?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'হ্যাঁ। দুটো রহস্য আমাদের হাতে। এক ঃ হাইমাস কেন কাকাতুয়া চুরি করছে? দুই ঃ কেন ওগুলোকে ভুল বুলি শেখানো হয়েছে?'

'মাথায় ঢুকছে না,' মাথা নাড়ল রবিন। 'এত কঠিন বুলি কেন শেখানো হয়েছে, সেটাও তো আরেক রহস্য। এসব কথা সাধারণত লোকে শেখায় না।'

'গভীর হচ্ছে রহস্য,' বাস্তবে নেই যেন কিশোর, কণ্ঠে খুশির আমেজ। জটিল সমস্যা পেয়ে গেছে সে, জট ছাড়াবে ধীরে ধীরে, তাতেই তার আনন্দ। 'যে-ই শিখিয়েছে, অনেক ধৈর্যের সঙ্গে কষ্ট করে শেখাতে হয়েছে। নিশ্চয় অহেতুক কষ্ট করেনি। আর হাইমাসও বিনা কারণে কাকাতুয়া দুটোকে চুরি করেনি। নিশ্চয় কোন কারণ আছে।'

'কিশোর!' উত্তেজিত মনে হলো রবিনকে। 'আরও পাখি তো থাকতে পারে?

সেই কালো কাকাতুয়াটা? ব্ল্যাকবিয়ার্ড...'

'আরি সব্বোনাশ!' আঁতকে উঠল মুসা। 'দুটোতেই মাথা ঘুরছে। আরও আমদানী করছ?'

হাসতে গিয়েও থেমে গেল অন্য দুজন। ফোন বেজে উঠেছে। ছোঁ মেরে তুলে নিল কিশোর। 'হ্যালো।...হ্যাঁ।...তাই নাকি?...শেষ নম্বর দুটো ওয়ান থ্রী?...ও না না, তাহলে না, সরি। থ্যাংকু।' হতাশ হয়ে রেখে দিল রিসিভার।

'হলিউডের একটা ছেলে,' জানাল সে। 'গাড়ির নম্বর মিলছে না।

আবার বাজল টেলিফোন। রিসিভার কানে ঠেকিয়ে স্পীকারের সুইচ টিপতে আর ভুল করল না কিশোর। সবাই শুনতে পেল ওপাশের কথা। সান্তা মনিকার একটা ছেলে কালো একটা রেঞ্জার দেখেছে, তবে কয়েক বছরের পুরানো গাড়ি। গাড়িতে ছিল দুই তরুণ দম্পতি। না, এবারেও হলো না।

আরও আটজন ফোন করল। কিন্তু সবগুলো বেঠিক।

নাহ্ কাজ হলো না, হতাশ হয়ে ভাবল কিশোর। ভূত-থেকে-ভূতে সাহায্য করল না এবার তিন গোয়েন্দাকে।

পাঁচ

চুপ করে আছে ওরা। হাইমাসের কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

স্পীকারে ডাক শোনা গেল মেরিচাচীর, 'কিশোর, এই কিশোর? একটা ছেলে তোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। মেকসিকো থেকে।'

মেকসিকো থেকে!

একই সঙ্গে কথাটা মনে পড়ে তিনজনের ঃ কাকাতুয়া বিক্রি করেছে যে ফেরিওলা, তার কথায় জোরাল মেকসিকান টান ছিল।

হুড়োহুড়ি করে দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে এল ওরা।

'এই যে ও,' রবিনের সমান লম্বা রুগ্ন চেহারার একটা ছেলেকে দেখালেন মেরিচাচী। মলিন প্যান্ট, শার্টের কয়েক জায়গায় ছেঁড়া।

এখন কাজের সময়, তাড়াহুড়ো করে অফিসে চলে গেলেন আবার চাচী।

'সিনর কিশোর?' জানতে চাইল ছেলেটা।

'আমি,' বলল কিশোর।

'আমি ডিয়েগো,' কড়া মেকসিকান টান কথায়, রিনরিনে সুরেলা কণ্ঠস্বর। 'আউ-টোটা কোথায়? দেখাবেন?'

'আউ-টো?'বুঝতে পারছে না কিশোর।

কিন্তু মুসা বুঝে ফেলল। 'রোলস-রয়েসটার কথা বলছে।'

'ও, ওটা? গ্যারেজে,' বলল কিশোর।

'সোনালি আউ-টো। নিশ্চয় খুব সুন্দর। দেখতে ভারি ইচ্ছে করছে,' হাসতে গিয়েও হাসল না ছেলেটা, সহজ হতে পারছে না, চোখে ভয়। 'আমি...সিনর কিশোর, আমি...গাড়ি খুব ভালবাসি। সব গাড়ি। কোন সময়, কোন একদিন আমিও

একটা কিনব।'

'গাড়ি?' দূরে কাজ করছে বিশালদেহী দুই ব্যাভারিয়ান ভাই, বোরিস আর রোভার, ইয়ার্ডের ট্রাকটা ধুচ্ছে, সেদিকে চেয়ে ছেলেটাকে বলল কিশোর, 'এসো আমার সঙ্গে।'

দ্বিধা করল ডিয়েগো। 'এক মিনিট,' বলে ওয়ার্কশপের কোণের দিকে চলে গেল।

উঁকি দিয়ে দেখল মুসা, এই প্রথম দেখতে পেল গাধাটা। লোহার খুঁটির সঙ্গে বাঁধা, কাছেই একটা দু-চাকার গাড়ি।

আদর করে ধূসর জানোয়ারটার পিঠ চাপড়াল ডিয়েগো।

'থাক এখানে, ডিংগো। আমি আসছি।'

বাক্স, ছোট ড্রাম, যে যা পেল তার ওপরই বসল চারজনে, ওয়ার্কশপে। নানারকম 'লোভনীয়' জিনিস ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, চোখ বড় বড় করে দেখছে ডিয়েগো।

'ডিয়েগো,' বলল কিশোর, 'কালো একটা রেঞ্জারের কথা বলতে এসেছ?'

এত জোরে মাথা ঝাঁকাল ডিয়েগো, মুসার ভয় হলো, গলা থেকে ছিঁড়ে না আলগা হয়ে যায়। 'সি, সি, সিনর কিশোর, কাল রাতে আমার বন্ধু টিরানো দেখা করতে এসেছিল। বলল, একজন সিনর কিশোর একটা কালো রেঞ্জারের খোঁজ জানতে চান। শেষ দুটো নম্বর ওয়ান···থ্রী।'

রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে তিন গোয়েন্দা।

তাদের আগ্রহী চোখের দিকে চেয়ে আশা বাড়ল ডিয়েগোর। 'আরও বলল···পুরস্কার দেয়া হবে।'

'পুরস্কার!' চেঁচিয়ে উঠল উত্তেজিত মুসা, ভয় পেয়ে গেল বেচারা ডিয়েগো। 'নিশ্চয়ই। গাড়িটা দেখেছ? কোথায়?'

'দেখেছি,' তিন গোয়েন্দার মুখের দিকে তাকাচ্ছে ডিয়েগো। 'মোটা এক লোকের। কিন্তু সে যে এখন কোথায়···' আঙুলে গুনলো, 'এক-দুই-তিন-চার··· সাত দিন আগে দেখেছি। তারপর আর দেখিনি।'

'সাত দিন?' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল মুসা, হতাশ হয়েছে। 'কোন লাভ হলো না। এতদিন মনে রাখলে কিভাবে?'

'গাড়ি সাংঘাতিক ভালবাসি আমি। গাড়ি আমার স্বপ্ন। কালো রেঞ্জারটা দারুণ এক গাড়ি। লাইসেন্স নম্বর মুখস্থ হয়ে গেছে ঃ এ কে ফোর ফাইভ ওয়ান থ্রী। লাল চামড়ায় মোড়া গদি। সামনের বাম্পারের ডানদিকে ছোট একটা ঘষার দাগ আছে। পেছনের বাম্পারে এক জায়গায় টোল খাওয়া।'

ছেলেটার ওপর ভক্তি এসে গেল তিন গোয়েন্দার। গাড়ির ব্যাপারে অনেক ছেলেরই অনেক রকম হবি আছে। কয়েক বছর পরেও একটা বিশেষ গাড়ির কথা মনে রাখতে পারে, তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বড় জোর কি গাড়ি আর কি রঙ, এই পর্যন্ত। কিন্তু ডিয়েগো ঠিক মনে রেখেছে লাইসেন্স নম্বর, বাম্পারের কোথায় দাগ, কোথায় টোল খাওয়া, সব। এক হপ্তা পরেও এত খুঁটিনাটি মনে রাখা সত্যি কঠিন।

'পুলিশকে জানালে সহজেই খুঁজে বের করে ফেলতে পারবে,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। 'কিন্তু আমরা কথা দিয়ে এসেছি, পুলিশকে কিছু জানাব না।' ডিয়েগোর দিকে ফিরল। 'দু-এক দিনের মধ্যে আর দেখা হয়নি না?'

মাথা নাড়ল মেকসিকান ছেলেটা। তার বাদামী চোখ দুটো বিষণ্ণ। 'পুরস্কার পাচ্ছি না তাহলে।...গাড়িতে চড়তে পারছি না। সোনালি আউ-টো কি সুন্দর...'

'হয়তো চড়তে পারবে,' আশ্বাস দিল কিশোর। 'ডিয়েগো, মোটা লোকটাকে কোথায় কিভাবে দেখলে, বলো তো?'

'আমার চাচা স্যানটিনোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। কাকাতুয়াগুলোর জন্যে।'

'কাকাতুয়া?' বলে উঠল মুসা। 'তোমার চাচাই তাহলে বিলি শেকসপীয়ার আর লিটল বো-পীপকে বিক্রি করেছে।'

মাথা ঝাঁকাল ডিয়েগো। 'অন্যগুলোও। সব কটারই অদ্ভুত নাম।'

'অদ্ভুত নাম?' দ্রুত রবিনের দিকে তাকাল একবার কিশোর। 'নামগুলো মনে আছে?'

ঘন কালো চুলে আঙুল চালাল ডিয়েগো, তারপর আবার মাথা ঝাঁকাল। 'আছে। শের-লক হোমস আর রবিন হুড।'

নোট বই বের করে ফেলেছে রবিন। লিখতে লিখতে বিড়বিড় করল, 'শারলক হোমস, রবিন হুড।'

'ক্যাপ্টেন কিড আর স্কারফেস,' যোগ করল ডিয়েগো। 'স্কারফেসের এক চোখ কানা।'

নাম দুটো দ্রুত লিখে নিল রবিন। 'ছটা হলো। আর ছিল?'

মাথা নাড়তে গিয়েও নাড়ল না ডিয়েগো, উজ্জ্বল হলো চোখ। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ছিল। কালোটা। ব্লাকবিয়ার্ড দা পাইরেট। সুন্দর কথা বলে। ওই একটা ছাড়া বাকি ছ-টার মাথাই হলুদ। ব্ল্যাকবিয়ার্ডের কালো।'

'ব্ল্যাকবিয়ার্ড দা পাইরেট!' লিখে নিল রবিন। 'ওটার কথা বলেছিলেন বটে মিস্টার ফোর্ড। কিশোর, কি মনে হয়? সাতটাই জড়িত?'

'পরে জানা যাবে,' জবাব দিল কিশোর। 'ডিয়েগো, মোটা লোকটা ওই কাকাতুয়াগুলোর জন্যেই এসেছিল?'

'সি।'

তোমার চাচা দিয়েছেন?'

'না, সিনর,' বিষণ্ণ ছায়া নামল আবার ডিয়েগোর চেহারায়। 'তার আগেই বিক্রি করে দিয়েছে চাচা। লোকটা হাজার ডলার দিতে চাইল, কিন্তু পাখি কোত্থেকে দেবে চাচা? দিতে পারলে তো খুবই ভাল হত, এতগুলো টাকা। রেগে গিয়ে চাচাকে যাচ্ছেতাই গালাগাল করল লোকটা। কোথায় বিক্রি করেছে, ঠিকানা জিজ্ঞেস করল। চাচা তা-ও বলতে পারল না। কি করে বলবে, বলুন? চাচা তো আর লেখাপড়া জানে না। তাছাড়া কখন কোথায় কোন পাখি বিক্রি করেছে, সব কথা কি মনে থাকে ফেরিওলার?'

'তারমানে বাকি কাকাতুয়াগুলোরও খোঁজে রয়েছে হাইমাস,' দুই সহকারীর দিকে চেয়ে বলল কিশোর। 'মূল্যবান তথ্য।'

'তা বলতে পারো,' একমত হলো মুসা। 'একটা খুঁজতে গিয়ে দুটো হারানোর খবর পেলাম। যোগ হলো আরও পাঁচটা। সবগুলোই খুঁজব, না?'

ঘুরিয়ে বলল কিশোর, 'যেহেতু সাতটা পাখিই এ-রহস্যের অংশ, খুঁজে তো বের করতেই হবে।'

'কিন্তু শুধু বিলি শেকসপীয়ার আর লিটল বো-পীপকে খুঁজে দেয়ার কথা বলেছি আমরা। এ-রহস্যের মীমাংসার দায়িত্ব তো নিইনি।'

রবিন বুঝতে পারছে, অযথা মুখ খরচ করছে মুসা। মুসাও জানে সেকথা। একবার যখন কিশোর পাশা রহস্যের গন্ধ পেয়েছে, ওটার সমাধান না করা পর্যন্ত তার আর স্বস্তি নেই। রক্তের গন্ধ পেয়েছে ব্লাডহাউণ্ড, ডেকে তাকে আর ফেরানো যাবে না, শেষ মাথায় পৌঁছাবেই।

ডিয়েগোর দিকে ফিরল কিশোর। 'টেলিফোন করলেই তো পারতে? কষ্ট করে রকি বীচে এলে কেন?'

'ভেবেছি, পুরস্কার মিলবে। জিনিসপত্র কিনে নিয়ে যাব, তাই গাড়ি নিয়ে এসেছি। তাছাড়া, সিনর, ফোন করার পয়সা তো নেই আমার কাছে।'

একে অন্যের দিকে তাকাল তিন গোয়েন্দা। একটা ফোন করার মত পয়সা থাকে না, এমন লোকও আছে দুনিয়ায়, বিশ্বাস করতে পারছে না। তৃতীয় বিশ্বের কিছু দরিদ্র দেশের কথা মনে পড়ল কিশোরের, বাংলাদেশের কথা মনে পড়ল, করুণ কিছু ছবি দেখেছিল পত্রিকায়। দেখে বিশ্বাসই করতে পারেনি সে, এতখানি মানবেতর জীবন যাপন করে অনেক মানুষ, ভেবেছে অতিরঞ্জিত। কিন্তু আজ বিশ্বাস করল। বাংলাদেশ কেন? এই আমেরিকাতেও তো রয়েছে সে-রকম দৃষ্টান্ত। ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ আর বন্যাপীড়িত অসহায় বাংলাদেশীদের কথা ভেবে মন খারাপ হয়ে গেল তার। তাছাড়া, রোজই শুনছে, দুর্বিষহ রাজনৈতিক গোলমাল চলছে বাংলাদেশে। একে তো সাংঘাতিক দরিদ্র দেশ, তারপর প্রাকৃতিক দুর্যোগ, তার ওপর এই গণ্ডগোল কতখানি বিপর্যস্ত করে তুলছে দেশের মানুষকে, ভাবতেই রোম খাড়া হয়ে গেল তার। কথা বলতে পারল না কয়েক মুহূর্ত।

কিশোরকে বার কয়েক ঢোক গিলতে দেখল রবিন, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। এই প্রথম ভাল করে তাকাল ডিয়েগোর শরীরের দিকে। অস্বাভাবিক রুগ্ন দেহ, হাড্ডি-সর্বস্ব। বলল, 'তুমি, বেশ কিছু মূল্যবান তথ্য জানিয়েছ, পুরস্কার তোমার পাওনাই হয়েছে। গাড়িটা খুঁজছিলাম আমরা···আচ্ছা, মোটা লোকটা, হাইমাস কোথায় থাকে বলতে পারো কিছু?'

'মোটা লোকটার নাম হাইমাস?' উজ্জ্বল হলো ডিয়েগোর মুখ। ঢোলা পকেট হাতড়ে বের করে আনল একটা কার্ড। 'লোকটা যাওয়ার সময় দিয়ে গেছে চাচাকে,' কার্ডটা কিশোরের দিকে বাড়িয়ে দিল সে। বলে গেছে, 'কাকাতুয়ারগুলোর খোঁজ পেলে যেন এই ঠিকানায় জানাই।'

গলা বাড়িয়ে কার্ডের ওপর ঝুঁকে এল তিন গোয়েন্দা।

এই সময় ছাপার মেশিনের ওপর ঝোলানো লাল আলোটা জ্বলতে-নিভতে শুরু করল, তারমানে হেডকোয়ার্টারে ফোন বাজছে।

'ডিয়েগো,' বলল কিশোর, 'ঘুরে বসে চোখ বন্ধ করো।'

অবাক হলো ছেলেটা, কিন্তু যা বলা হলো করল।

'মুসা, রবিন তোমরা থাকো। আমি দেখে আসি।'

দুই সুড়ঙ্গের মুখের ঢাকনা সরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল কিশোর। আবার জায়গামত লাগিয়ে দিল ঢাকনাটা।

ফোন তুলতেই ভেসে এল এক মহিলা-কণ্ঠ, 'হালো,' খুব নিচু গলায় বলল, যেন তার কাছাকাছি কেউ শুনে ফেলবে, 'তুমি কি কিশোর পাশা? মিস্টার হাইমাসের গাড়ি খুঁজছ?'

'হ্যাঁ, ম্যাডাম। বলতে পারেন কোথায় আছে?'

'এমন এক জায়গায় আছে, যেখানে কেউ খুঁজে পাবে না,' রাগ বোঝা যাচ্ছে। 'তুমিও খোঁজার চেষ্টা কোরো না, শুনছ? উনি খুব বদরাগী, তাঁর কাজে বাধা দিলে বিপদে পড়বে। ওঁর কাজে নাক গলাবে না, ব্যস, এই বলে দিলাম।'

কিশোর কিছু বলার আগেই লাইন কেটে গেল।

ওয়ার্কশপে ফিরে এল কিশোর। বলল, 'ডিয়েগোর পুরস্কার দিয়ে দেব আমরা। তার বাড়ি যাব, আঙ্কেল স্যানটিনোর সঙ্গে কথা বলব। ঠিক পথেই এগোচ্ছি আমরা, বোঝা যাচ্ছে,' তার শেষ-কথাটা রহস্যময় মনে হলো অন্য দুই গোয়েন্দার কাছে।

দুই ঘণ্টা পর। দুটো গাড়ির বিচিত্র এক মিছিল দ্রুত এগিয়ে চলেছে উপকূলের মহাসড়ক ধরে, দক্ষিণে। আগেরটা কুচকুচে কালো, সোনালি অলঙ্করণ, রাজকীয় রোলস-রয়েস। অবশ্যই হ্যানসন চালাচ্ছে। পেছনের সীটে বসেছে কিশোর, মুসা আর ডিয়েগো। রবিন গেছে লাইব্রেরিতে, চাকরিতে।

উত্তেজনা চেপে রাখতে পারছে না ডিয়েগো। লাল হয়ে উঠেছে গাল। বার বার ছুঁয়ে দেখছে গাড়ির ভেতরের সোনালি প্লেটিং, পালিশ করা গদির চামড়া। সোনালি রঙের ওয়্যারলেস টেলিফোনটা দেখে এমন ভাব করল, যেন ওটা অপার্থিব, স্বপ্ন দেখছে, ধরার জন্যে হাত বাড়ালেই মিলিয়ে যাবে। বিড়বিড় করল, 'সোনালি আউ-টো! এত সুন্দর! চড়তে পারব কল্পনাই করিনি।'

এক উচ্ছ্বসিত মুহূর্তে জানাল দুই গোয়েন্দাকে, বড় হয়ে সে গাড়ির মেকানিক হবে।

রোলস-রয়েসের পেছনে আসছে স্যালভিজ ইয়ার্ডের ঝরঝরে ঐতিহাসিক (মুসা নামটা রেখেছে। শব্দটা অনেক শুনেছে কিশোরের মুখে। বাংলাদেশে কিছু হলেই নাকি সেটা 'ঐতিহাসিক' হয়ে যায়, তাহলে ট্রাকের ঐতিহাসিক হতে বাধা কোথায়?) ট্রাক, চালাচ্ছে বোরিস। তাতে বোঝাই করা হয়েছে ডিয়েগোর পুরস্কারের টাকায় কেনা মালপত্র। ইয়ার্ড থেকেই কিনেছে সে। কি জিনিস কিনতে চায় ডিয়েগো, শুনে অবাক হয়েছিল তিন গোয়েন্দা। কিছু শক্ত তক্তা, একটা পুরানো আস্ত দরজা, একটা জানালা, কিছু তারকাঁটা আর টুকিটাকি আরও কিছু জিনিস, সবই

ঘর মেরামতের কাজে লাগে। মেরিচাচীর কানে কানে তখন কি ফিসফিস করেছে কিশোর। সব জিনিসের দাম অসম্ভব কমিয়ে ধরেছেন চাচী, কিন্তু সেটা বুঝতে দেননি ডিয়েগোকে। বলেছেন, পুরানো জিনিসের দাম ওরকমই। এতকিছু কেনার পরেও পুরস্কারের পাঁচ ডলার বেঁচে গেছে, পকেটে বার বার হাত ঢুকিয়ে দেখছে ডিয়েগো, তার জন্যে এটা এখন রাজার সম্পদ।

জিনিসপত্র সব তোলার পর সমস্যা দেখা দিয়েছিল ডিয়েগোর গাধা আর গাড়িটা নিয়ে। কি ভাবে নেয়া হবে? সমাধান করে দিয়েছে বোরিস আর রোভার। ওই দুটোও তুলে দিয়েছে ট্রাকের পেছনে। রাস্তায় লোক হাঁ করে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, কৌতূহলী চোখে দেখছে বিচিত্র মিছিলটাকে।

একটা অত্যন্ত দরিদ্র পল্লীতে এসে ঢুকল রোলস-রয়েস। ছোট ছোট কুঁড়ে, ঠেকাঠুকা দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে কোনমতে, বেশির ভাগই ভাঙা। একপাশে ফসলের মাঠ, ছোট। এখানেই থাকে ডিয়েগো আর তার চাচা।

গাড়ি দেখে হই-চই করে এসে ঘিরে ধরল বাচ্চা ছেলেমেয়ের দল।

জানালা দিয়ে হাত বের করে ওদের উদ্দেশ্যে নাড়ল ডিয়েগো। 'রোসি!' চেঁচিয়ে নাম ধরে ডাকল সে। 'টিরানো! নোলিটা! আমি, আরে আমি, ডিয়েগো! সোনালি আউ-টোতে চড়ছি।'

হাঁকডাক শুনে ঘর থেকে আরও ছেলেমেয়ে বেরিয়ে এল, পঙ্গপালের মত ছেঁকে ধরল। গাড়ি থামাতে বাধ্য হলো হ্যানসন, পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে বাচ্চারা।

সবাই ছুঁয়ে দেখতে চায় রোলস-রয়েস।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে হুঁশিয়ার করল ওদেরকে ডিয়েগো, স্প্যানিশ ভাষায় ধমক-ধামক দিল। পিছিয়ে গেল ওরা।

'এগোব, মাস্টার পাশা?' অনুমতি চাইল হ্যানসন। আশ্চর্য শান্ত মেজাজ। অন্য ড্রাইভার হলে রেগে বাচ্চার দলকে গালাগাল শুরু করত এতক্ষণে।

'না,' পেছনে তাকিয়ে রয়েছে ডিয়েগো। খানিকটা খোলা জায়গার পর পড়ো পড়ো একটা কুঁড়ে, তার পেছনে ক্ষত-বিক্ষত একটা গ্রীন হাউস। 'ওটাই আমাদের ঘর। গাড়ি নেয়ার দরকার কি? হেঁটেই তো যেতে পারি। পথও খুব খারাপ। এত সুন্দর গাড়িটা চোট পাবে,' গদিমোড়া দেয়ালে হাত বোলাল সে।

প্রস্তাবটা মনে ধরল কিশোরের। নেমে এল তিন কিশোর।

'থ্যাংক ইউ, হ্যানসন,' কিশোর বলল। 'গাড়ি আর লাগবে না। ট্রাকে করেই ফিরতে পারব। আপনার আর কষ্ট করে লাভ নেই? চলে যান।'

বোরিস ট্রাক নিয়ে পৌঁচেছে।

তাকে বলল কিশোর, 'আপনি ওই বাড়িটার সামনে যান। আমরা যাচ্ছি।'

স্বভাব-খসখসে গলায় 'হোকে' (ও-কে) বলে এগোল বোরিস।

গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল হ্যানসন।

'মেকসিকো থেকে যখন এল চাচা, পকেট খালি,' হাঁটতে হাঁটতে বলল ডিয়েগো। 'এখানেই এসে উঠল। ওই বাড়িটা মাত্র পাঁচ ডলারে ভাড়া নিয়েছে চাচা। মাস মাস সেটা দিতেই অবস্থা কাহিল। এখন একমাসের ভাড়া আছে আমার

পকেটে। কিছুদিন আর খাটতে হবে না চাচাকে, শুয়ে থাকতে পারলে তার কাশি ভাল হয়ে যাবে। তখন আবার ভালমত কাজ করতে পারবে।'

বাড়ির পেছন দিক দিয়ে এসেছে ওরা, তাই এতক্ষণ কালো গাড়িটা চোখে পড়েনি। সামনের দিকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে ওটা। না, রেঞ্জার নয়, সেডান।

ভ্রূকুটি করল ডিয়েগো। 'গাড়ি নিয়ে কে আবার এল?' কণ্ঠস্বরেই বোঝা গেল, ব্যাপার সুবিধের লাগছে না তার। দৌড় দিল।

পেছনে ছুটল কিশোর আর মুসা। কুঁড়ের আরও কাছে আসতেই ধমক শোনা গেল।

'হাইমাস,' গতি বাড়াল মুসা।

'বল,' বলছে লোকটা, 'জলদি বল, শুয়োর কোথাকার, নইলে ঘাড় মটকে দেব!'

'চাচা!' চেঁচিয়ে উঠল ডিয়েগো।

দরজার জায়গায় কিছুই নেই, খোলা। ছুটে ঢুকে পড়ল ডিয়েগো। পেছনে দুই গোয়েন্দা।

মলিন বিছানায় চিত হয়ে আছে একজন লোক, নিশ্চয় আঙ্কেল স্যানটিনো। তার ওপর ঝুঁকে রয়েছে মোটা হাইমাস।

'মনে কর্ ব্যাটা!' আবার চেঁচাল হাইমাস। 'কোথায় বেচেছিস? আরগুলোর কথা নাহয় বাদই দিলাম, কিন্তু ব্ল্যাকবিয়ার্ডের কথা তো মনে থাকার কথা। অনেক ঘুরেছিস ওটা নিয়ে, সবশেষে বেচেছিস। নিশ্চয় মনে আছে তোর, বলছিস না। স্রেফ শয়তানী। চারটে পেয়েছি। আরগুলো কোথায়?'

শিকারী কুকুরের মত গিয়ে লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ডিয়েগো।

কিন্তু টলল না দানব। হাত দিয়ে ঝেড়ে ফেলে দিল রোগা ছেলেটাকে, যেন পোকা তাড়াল। তারপর ঘুরল ঝটকা দিয়ে।

আবার এসে ঝাঁপ দিল ডিয়েগো।

শার্টের কলার চেপে ধরে চোখের পলকে তাকে শূন্যে তুলে ফেলল হাইমাস। অসহায় ভঙ্গিতে ঝুলে থেকে হাত-পা ছুঁড়তে লাগল ছেলেটা। মুসা আর কিশোরের দিকে চেয়ে শাসাল, 'খবরদার! এগোবে না। পিচকিটার ঘাড় মটকে দেব তাহলে।'

থেমে গেল মুসা। কিশোরও দাঁড়িয়ে পড়ল।

রাগে জ্বলছে হাইমাসের চোখ। জানোয়ারের মত ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরোচ্ছে কণ্ঠ থেকে। কলার ধরে ঝাঁকাচ্ছে ডিয়েগোকে।

সইতে পারল না পুরানো কাপড়, শার্টের কলার ছিঁড়ে থুপ করে মাটিতে পড়ে গেল ডিয়েগো। পড়েই দু-হাতে পা জড়িয়ে ধরল হাইমাসের।

লাথি মেরে পা ছাড়ানোর চেষ্টা করল হাইমাস, পারল না। জোঁক হয়ে গেছে যেন ডিয়েগো।

এই সুযোগ। লাফিয়ে উঠল মুসা। মাথা নিচু করে ছুটে এল সে। তার 'বিখ্যাত' কৌশল প্রয়োগ করল হাইমাসের ভুঁড়িতে।

কেঁপে উঠল যেন পাহাড়। শক্ত খুলির প্রচণ্ড আঘাতে হাঁউক করে উঠল

হাইমাস। টলমল করেও সামলে নিল কোনমতে, পড়ল না।

মুসার মাথার এক গুঁতো খেয়েই বুঝে গেছে হাইমাস, ব্যাপার সুবিধের নয়। প্রাণপণে লাথি মেরে ডিয়েগোকে ছাড়িয়েই দৌড় দিল দরজার দিকে। পথরোধ করল কিশোর। কিন্তু লোকটার তুলতুলে শরীরে মোষের শক্তি। এক ধাক্কায় তাকেও ফেলে দিয়ে বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে।

কিশোরকে টেনে তুলতে গিয়ে দেরি করে ফেলল মুসা।

ছুটে বাইরে বেরোল তিন কিশোর।

স্টার্ট নিয়েছে ততক্ষণে কালো সেডান।

বোরিসের ট্রাকটাও এসে থামল। কিন্তু লাভ নেই। মাল বোঝাই ঝরঝরে ট্রাক নিয়ে অনুসরণ করার কোন মানে হয় না, ধরা যাবে না সেডানটাকে।

'ইস্,' আফসোফ করল মুসা, 'বোরিস নামা পর্যন্ত যদি আটকে রাখা যেত ব্যাটাকে…'

'হ্যানসন থাকলেও হত, পিছু নিতে পারতাম,' হাঁপাচ্ছে কিশোর। 'কি আর করা। তবে ব্যাটার কার্ড আছে আমাদের কাছে, নামধাম আছে। কদ্দিন পালিয়ে থাকবে? দেখেছ, কেমন রেগে যায়?'

'হাইমাস না ওটা, হিপোপটেমাস,' মাথা ডলছে মুসা। 'ভুঁড়ি তো না, মনে হলো রবারের ব্যাগের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছি…তা, ব্যাটা রাগলে আমাদের কি লাভ?'

'ভয় থেকেই জন্ম নেয় রাগ,' ব্যাখ্যা করল কিশোর। 'ভয় পেয়েছে ব্যাটা। আর তোমার গুঁতো খাওয়ার পর তো আরও চমকে গেছে।'

'আমাদের ভয় পায় বলতে চাইছ?' মুসা বলল। 'আর আমরা?'

'নারভাস, বাট কনফিডেন্ট,' অন্যমনস্ক হয়ে গেছে কিশোর।

'কি বললে এটা? ইংরেজি না গ্রীক?'

জবাব না দিয়ে ঘুরল কিশোর।

চাচাকে পানি খাওয়াচ্ছে ডিয়েগো।

ঘরে একটা মাত্র নড়বড়ে চেয়ার, উল্টে পড়ে আছে। তুলে সোজা করে রাখল ওটা মুসা।

তাদের দিকে ফিরে তাকাল স্যানটিনো। কাশল কয়েকবার। তারপর বলল, 'তোমরা আমাকে বাঁচিয়েছ। নইলে মেরেই ফেলত।' আবার কাশতে শুরু করল।

'থাক থাক, কথা বলবেন না,' হাত তুলল কিশোর।

'ব্ল্যাকবিয়ার্ডের খোঁজ নিতে এসেছিল মোটকাটা,' বলল ডিয়েগো। 'মনেই রাখতে পারে না কিছু চাচা, বলবে কি? তবে সেদিন বলেছিল, কোন এলাকায় নাকি কোন একটা বাড়ি থেকে তিন-চার ব্লক দূরে এক মহিলার কাছে বিক্রি করেছে, পাঁচ ডলারে। আর কেউই কিনতে চায়নি, তাই এত কমে দিয়ে এসেছে।'

মোটকা বেশি রেগে গিয়েছিল,' বলল মুসা। 'কিছু একটা ব্যাপার আছে পাখিগুলোর। ওই ব্যাটা জানে।'

'এবং ব্যাপারটা খুব জরুরী,' যোগ করল কিশোর, 'খুব মূল্যবান তার কাছে। কিন্তু কি…'

বাধা দিল বোরিস। দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। জিজ্ঞেস করল, 'মাল নামাব?'

'হ্যাঁ, নামান,' বলল কিশোর। বোরিসের পেছনে এসে দাঁড়ালেন এক বয়স্ক মহিলা, হাতে কার্ডবোর্ডের একটা বাক্স, তাতে ছোট ছোট অসংখ্য ছিদ্র, ঝাঁঝরির মত।'

'পথে হাত তুললেন মহিলা,' বলল বোরিস, 'এদিকেই আসছিলেন। তুলে নিলাম। সে-জন্যেই আমার আসতে দেরি হয়েছে।'

'কই, সে ধোঁকাবাজটা কই?' দুই গোয়েন্দার দিকে চেয়ে বললেন মহিলা। 'ফেরিওলার বাচ্চা, স্যানটিনো না ফ্যানটিনো?'

মুসা আর কিশোরকে সরিয়ে এগিয়ে এল ডিয়েগো। 'চাচার শরীর খারাপ। কেন?'

'টাকা ফেরত চাই!' কড়া গলায় বললেন মহিলা। 'পাখির ব্যবসা করে না ঠকবাজি করে? কাকাতুয়া বলে দিয়ে এসেছে একটা স্টারলিং। ভাগ্যিস আমার জামাই এসেছিল। পাখি চেনে। বলল এটা কাকাতুয়া না,' হাতের বাক্সটা ডিয়েগোর হাতে ধরিয়ে দিলেন তিনি। 'দাও, আমার পাঁচ ডলার ফেরত দাও। নইলে পুলিশের কাছে যাব।'

মুখ কালো হয়ে গেল ডিয়েগোর। বাক্সটা মুসার হাতে দিয়ে পকেট থেকে বের করল পাঁচ ডলার, দিয়ে দিল মহিলাকে। 'এই যে, নিন আপনার টাকা। যান এখন।'

'হুঁ, এবারের মত মাপ করে দিলাম,' গজগজ করতে করতে বেরিয়ে গেলেন মহিলা।

দুই গোয়েন্দার দিকে ফিরল ডিয়েগো । 'নিশ্চয় ব্ল্যাকবিয়ার্ড। কি পাখি ওটা, আমিও চিনি না, চাচাও না। কোন ধরনের কাকাতুয়াই হবে।'

মুসার কাছ থেকে নিয়ে বাক্সটা খুলল সে। ফুড়ুত করে বেরিয়ে সোজা গিয়ে মুসার কাঁধে বসল কালো পাখিটা, উজ্জ্বল হলদে ঠোঁট।

'স্টারলিং কোথায়?' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর। 'জামাইও পাখি চেনে না। এটা ময়না। কাকাতুয়ার চেয়ে ভালভাবে কথা শেখে, বলতে পারে। ভাল ট্রেনিং পাওয়া ময়নার দাম কাকাতুয়ার চেয়ে বেশি।'

'আয়্যাম ব্ল্যাকবিয়ার্ড দা পাইরেট!' খসখসে কঠিন কণ্ঠে বলে উঠল ময়না, যেন সত্যিই একজন জলদস্যু। 'আ'হ্যাভ বারিড মাই ট্রেজার হোয়্যার ডেড ম্যান গার্ড ইট এভার। ইয়ো-হো-হো অ্যাণ্ড অ্যা বটল অভ রাম!' তারপর মুখ খারাপ করে গাল দিল কয়েকটা, যা জলদস্যুকেই মানায়।

'ব্ল্যাকবিয়ার্ড!' বলল উত্তেজিত কিশোর। 'এটার জন্যেই খেপে গিয়েছিল তখন হাইমাস।'

খুব খিদে পেয়েছে যেন ময়নাটার, তাকাল এদিক ওদিক।

ধারেকাছে কোন খাবার নেই, মুসার কানটা খুব লোভনীয় মনে হলো তার কাছে। দিলে কষে এক ঠোকর, লতি ছিঁড়ে আনার জন্যে।

'আউফ, মেরে ফেলেছেরে!' বলে মুসা দিল চিৎকার।

ভয় পেয়ে উড়ে গেল ময়নাটা, বেরিয়ে গেল খোলা দরজা দিয়ে।

'গেল,' মাথা কাত করল কিশোর। 'মুসা, একটা মূল্যবান সূত্র তাড়ালে।'

'আমি কি করব?' রুমাল দিয়ে কানের লতি চেপে ধরেছে মুসা। 'ফুটো করে ফেলেছে কান। এই দেখো না, রক্ত।'

প্রায় ছুটে বাইরে বেরোল কিশোর।

কিন্তু কোথাও দেখা গেল না ময়নাটাকে। চলে গেছে।

ছয়

ইংরেজি ভাল বলতে পারে না স্যানটিনো, তাই কিশোরের সঙ্গে কথা বলার সময় দোভাষীর কাজটা নিতে হলো ডিয়েগোকেই।

শুরুতে কয়েকটা সাধারণ প্রশ্ন করল কিশোর, মাথা নেড়ে শুধু 'সি সি,' করল স্যানটিনো।

তারপর আরেকটা প্রশ্নের জবাবে চাচার হয়ে ডিয়েগো বলল, 'দু-বছর আগে এখানে এসেছে চাচা। মেকসিকো থেকে এসেছে গাধার গাড়িতে চড়ে। হ্যাঁ, ডিয়েগোই নিয়ে এসেছে। চাচা মালীর কাজ খুব ভাল জানে, বিশেষ করে ফুল চাষে ওস্তাদ। কিন্তু হলিউডে এসে কোন কাজ পেল না। তারপর একজন বলল, ফুলের ব্যবসা করতে। খোঁজ করতে করতে চাচা চলে এল এখানে, ভাঙা গ্রীনহাউসটার কথা শুনে। হাউসের বেশির ভাগ কাচই ভাঙা। তবু দেখেটেখে চাচার মনে হলো, কোন কোন জাতের ফুল জন্মানো সম্ভব। মাসিক পাঁচ ডলারে ভাড়া নিয়ে নিল।

'পুরানো টিন জোগাড় করে লাগাল ভাঙা কাচের জায়গায়, বাতাস আর তাপ মোটামুটি ঠেকানো গেল এতে। ভাল জাতের দুর্লভ কিছু ফুলের চাষ করল ভেতরে, বাইরে লাগাল সাধারণ ফুল, আবহাওয়া আর তাপমাত্রার কমবেশিতে যেগুলোর কিছু হয় না। সেই ফুল গাধার গাড়িতে করে শহরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে, খাওয়াপরা চলে যেত কোনমতে।

'চলে যাচ্ছিল। এই সময় একদিন লম্বা, রোগা এক লোক এল এখানে। তার নাম ক্যাপ্টেন লঙ জন সিলভার। রোগে ভুগে কাহিল, টাকাপয়সা নেই। এসে থাকতে চাইল। লোকটার অবস্থা দেখে মানা করতে পারল না চাচা।

'সিনর সিলভারের সঙ্গে ছিল একটা নাবিকদের ব্যাগ, তাতে তার পুরানো কাপড়-চোপড়, আর একটা বাক্স। ধাতুর তৈরি, চ্যাপ্টা। এই এত বড়,' হাত ছড়িয়ে দেখাল ডিয়েগো, বাক্সটা কত বড় ছিল।

'সি সি,' বলে মাথা নাড়ল স্যানটিনো, বোঝাল, ডিয়েগো ঠিকই বলেছে।

'চোদ্দ ইঞ্চি বাই চব্বিশ,' মনে মনে দ্রুত হিসেব করে নিয়ে বিড় বিড় করল কিশোর। 'হ্যাঁ, বলো, তারপর?'

'শক্ত তালা লাগানো থাকত বাক্সটায়,' বলল ডিয়েগো। 'মাথার নিচে রেখে ঘুমাত। রোজ রাতে ডালা খুলে বাক্সের ভেতর তাকাত। খুব সুখী মনে হত তখন তাকে, মুখে হাসি ফুটত।'

আবার মাথা নাড়ল স্যানটিনো, 'সি, সি। খুব সুখী।'

'চাচা একদিন সিনর সিলভারকে জিজ্ঞেস করল, বাক্সে কি আছে,' ঘন চুলের বোঝায় আঙুল চালাল ডিয়েগো, মনে করার চেষ্টা চালাচ্ছে। 'লোকটা রহস্যময় হাসি হেসে বলল : বাক্সে আছে রামধনুর একটা টুকরো, তার তলায় একপাত্র সোনা।'

'রামধনুর একটা টুকরো, তার তলায় এক পাত্র সোনা,' ডিয়েগোর কথার প্রতিধ্বনি করল যেন কিশোর, ভুরু কুঁচকে গেছে। 'রহস্যময় বর্ণনা। হ্যাঁ, তারপর?'

'চাচা অসুখে পড়ল, ভীষণ কাশি। আমাকে আসার জন্যে খবর পাঠাল মেকসিকোয়, তাকে দেখার কেউ ছিল না এখানে। এলাম। কিন্তু ফুলচাষের ব্যাপারে সাহায্য করতে পারলাম না, কাজ জানি না। আমাকে এনেও বিশেষ লাভ হয়নি চাচার।'

'কি বলিস লাভ হয়নি?' বাধা দিয়ে ভাঙা ইংরেজিতে বলল স্যানটিনো। 'তুই না এলে, আমাকে না দেখলে তো এতদিনে মরে যেতাম।'

'চাচা বাড়িয়ে বলে, আমাকে ভালবাসে তো,' উজ্জ্বল হলো ডিয়েগোর মুখ। 'যাই হোক, সিনর কিশোর, আমি এসেও সিনর সিলভারকে দেখেছি। চাচার চেয়ে বেশি অসুস্থ। কি অসুখ জিজ্ঞেস করলাম। শুধু বলল, এমন এক অসুখ, যা কোনদিন সারবে না। কেন সারবে না, জিজ্ঞেস করলাম। বাক্স খুলে সোনার পাত্র থেকে সোনা বিক্রি করে ভাল ডাক্তার দেখানোর পরার্মশ দিলাম। হাসল সে। কিন্তু আমার মনে হলো, হাসি নয়, কাঁদল। বলল, দুনিয়ার তাবৎ সোনা বিক্রি করেও তার রোগ সারানো যাবে না।

'ও বলল...' লম্বা দম নিল ডিয়েগো, মনে করার চেষ্টা করছে ঠিক কি কি বলেছিল সিলভার। 'ও বলল তাছাড়া পাত্রের সোনা বিক্রিও করা যাবে না। নাম ভাড়িয়ে বেআইনী ভাবে আমেরিকায় ঢুকেছে সে। বেচতে গিয়ে ধরা পড়লে পুলিশ আবার তাকে পাঠিয়ে দেবে ইংল্যাণ্ডে—যেখান থেকে এসেছে, যতদিন বাঁচে, রোজ রামধনুটা দেখে দেখে দুঃখ ভোলার চেষ্টা করবে। তারপর একদিন বলল, শিগগিরই চলে যাচ্ছে সে।'

মেঘ জমল ডিয়েগোর সরল নিষ্পাপ চেহারায়। 'তখন বুঝিনি কি বলতে চেয়েছে। একদিন বাইরে থেকে সাতটা খাঁচা নিয়ে ফিরল সিনর সিলভার, সাতটায় সাতটা কাকাতুয়া। সব কটার হলদে ঝুঁটি। গ্রীনহাউসে রেখে কথা শেখাতে শুরু করল ওগুলোকে।'

দ্রুত চোখে চোখে তাকাল একবার কিশোর আর মুসা। কাকাতুয়া-রহস্যের অন্ধকারে আলোর আভাস দেখা যাচ্ছে।

'পাখি পোষ মানাতে জানত সিনর সিলভার,' বলে গেল ডিয়েগো। 'বলতে ভুলে গেছি, ব্ল্যাকবিয়ার্ডকে আগেই নিয়ে এসেছিল সে, প্রথম যখন এখানে আসে, তখনই কাঁধে ছিল কালো পাখিটা। সারাক্ষণ তার কাঁধে বসে থাকত পাখিটা, আর মুখ খারাপ করে গালাগাল করত, খুব মজা পেত সিনর সিলভার, জোরে জোরে হাসত।

'গ্রীনহাউসে কাজ চলল। দিনের পর দিন ওখানে কাটাতে লাগল সিনর

সিলভার। একেকটা কাকাতুয়ার একটা করে বিচিত্র নাম দিল। বিচিত্র সব বুলি শেখাতে লাগল। আমার কাছে খুব কঠিন মনে হত কথাগুলো, ঠিক বুঝতাম না।'

'হ্যাঁ, কঠিনই,' মাথা দোলাল কিশোর। 'ইংরেজি সাহিত্য আর ইতিহাস থেকে নেয়া হয়েছে। সেজন্যেই দুর্বোধ্য ঠেকেছে তোমার কাছে। মনে আছে কোনও বুলি?'

'না,' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল ডিয়েগো। 'বুঝিইনি, মনে রাখব কি? একদিন একটা কাকাতুয়া মারা গেল। খুব মুষড়ে পড়ল সিনর সিলভার। শেষে আপনমনেই বলল, কি আর করা? ওটার জায়গা দখল করবে ব্ল্যাকবিয়ার্ড।

'যাই হোক, ছ-টা কাকাতুয়া আর কালো কাকাতুয়াটাকে, তোমরা যেটাকে ময়না বলছ, বুলি শেখানো শেষ হলো। সিনর সিলভার নিজেও ময়নাটাকে বলত 'রেয়ার' প্যারট।'

'কি জানি,' নাক চুলকাল কিশোর। 'কোন ব্যাপারকে ঘোরাল করার জন্যেই হয়তো বলত। তারপর?'

বিষণ্ন ভঙ্গিতে হাত নাড়ল ডিয়েগো। 'তারপর আর কি? চলে গেল সিনর সিলভার। যেদিন কাকাতুয়াগুলোকে বুলি শেখানো শেষ করল, সে-রাতেই। সঙ্গে নিয়ে গেল তার প্রিয় বাক্সটা। ফিরে এল তিন দিন পর আরও কাহিল, আরও রোগা হয়ে। এসেই বলল, আবার চলে যাবে। বাক্সটা সঙ্গে আনেনি কেন জিজ্ঞেস করায় বলল, ওটা নিয়ে বিপদে পড়ব আমরা। নইলে নাকি যাওয়ার আগে আমাদেরকেই দিয়ে যেত।

'লম্বা একটা চিঠি লিখল সে। পোস্ট করার জন্যে দিল আমার হাতে।'

'ঠিকানাটা মনে আছে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

মাথা নাড়ল ডিয়েগো। 'না, সিনর কিশোর। অনেকগুলো টিকেট লাগাতে হয়েছে। খামের চারধারে লাল-নীল অনেক ডোরা ছিল।'

'এয়ার মেইলে গেছে মনে হচ্ছে,' বলল মুসা। 'এত বেশি স্ট্যাম্প যখন লাগানো হয়েছে, ইউরোপে পাঠিয়েছে হয়তো।'

'কাহিল হয়ে বিছানা নিল সিনর সিলভার,' বলল আবার ডিয়েগো। হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাইলাম। বলল দুনিয়ার কোন হাসপাতালই তাকে ভাল করতে পারবে না। বলল, আমরা তার সত্যিকার বন্ধু, আমাদের মাঝেই সে থাকতে চায়।'

ভিজে এল ডিয়েগোর চোখ। খানিকক্ষণ কোন কথা বলতে পারল না।

'অদ্ভুত লোক ছিল সিনর সিলভার,' ধরা গলায় বলল ডিয়েগো। 'কিন্তু মনটা ছিল বড় ভাল। অদ্ভুত রসিকতা করত, ধাঁধা বলত, এমনকি কথাও বলত ঘুরিয়ে। আজব বুলি শিখিয়েছিল কাকাতুয়াগুলোকে। কিন্তু ভালবেসেছিল আমাদেরকে, আমরাও...' কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে এল তার। সামলে নিয়ে বলল, 'সিনর সিলভার বলল, একজন খুব মোটা লোক আসবে। আমাদেরকে এক হাজার ডলার দিয়ে কাকাতুয়াগুলো কিনে নিয়ে যাবে। তারপর হাসতে শুরু করল। কাকাতুয়াগুলোকে কথা শেখানোই নাকি তার জীবনের সবচেয়ে বড় রসিকতা। তার কথার মাথামুণ্ডু

কিছুই বুঝিনি। বলল, এই রসিকতা নাকি ঘাম ঝরিয়ে ছাড়বে মোটা লোকটার। হাসতে হাসতেই ঘুমিয়ে পড়ল সে।

'পরদিন সকালে আর জাগল না সিনর সিলভার,' ঢোক গিলে চুপ হয়ে গেল ডিয়েগো।

দুই গোয়েন্দাও চুপ করে রইল। মেকসিকান ছেলেটার দুঃখ বুঝতে পারছে।

'মোটা লোকটা আসেনি?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

মাথা নাড়ল ডিয়েগো। 'সিনর সিলভার আমাদের বন্ধু ছিল, তার লাশ দাফন করার ভারও পড়ল আমাদের ওপর। রাস্তার ওদিকে ছোট একটা গির্জা আছে। ওখানেই তাকে কবর দিলাম। টাকা ছিল না আমাদের কাছে, বাকিতেই সব কাজ সারতে হলো। মোটা লোকটার আসার অপেক্ষায় রইলাম। এক হপ্তা গেল, দুই হপ্তা গেল, তিন হপ্তা গেল, সে এল না। ওদিকে বাকি টাকার জন্যে চাপ দিচ্ছে লোকে। শেষে বাধ্য হয়ে কাকাতুয়াগুলো নিয়ে বেরোল চাচা। হলিউডে গিয়ে বিক্রি করে এল।

'লোকে কাকাতুয়া পছন্দ করে দেখলাম। একদিনেই বিক্রি হয়ে গেল সব। টাকা খুব বেশি পাওয়া গেল না, দরাদরি করলে হয়তো যেত, কিন্তু সময় একদম ছিল না। তাড়াহুড়োয় যা পেল তাতেই দিয়ে চলে এল চাচা। সিনর সিলভারের কবরের দাম শোধ করল। ভেবেছিলাম, হাজার ডলার পেলে কুঁড়েটা ঠিক হবে...' অনেকক্ষণ পর হাসি ফুটল ডিয়েগোর মুখে। 'যাই হোক, এখন আর দুঃখ নেই। দরজা-জানালা কিনে ফেলেছি। লাগিয়ে নিলেই হলো। চাচা ভাল হয়ে আবার ফুলের চাষ শুরু করবে। আপনাকে এক হাজার ধন্যবাদ, সিনর কিশোর।'

'তথ্য যা জানিয়েছ, তাতে আরও কিছু পাওনা হয়ে গেছে তোমার,' আশ্বাস দিল কিশোর, ভেব না। আচ্ছা, শেষতক তো মোটা লোকটা এসেছে?'

'এসেছে,' বলল ডিয়েগো।

'সি, সি,' মাথা নেড়ে ভাতিজার কথায় সায় জানাল স্যানটিনোও।

'কাকাতুয়াগুলো বিক্রি করে ফেলার দুই হপ্তা পর এল লোকটা,' জানাল ডিয়েগো। 'বেচে দিয়েছি শুনে রেগে লাল। বকাবকি শুরু করল চাচাকে, শাসাল। যেখান থেকে পারে এনে দিতে বলল। শেষে নরম হলো। অনুরোধ করতে লাগল, পারলে পায়ে ধরে। কি আর করি? শেষে পেট্রল স্টেশনে থেকে গিয়ে একটা ম্যাপ চেয়ে আনলাম। চাচা লেখাপড়া জানে না, ম্যাপের কিছুই বুঝল না। তার কাছ থেকে ধারণা নিয়ে অনুমানে বের করলাম, কোন এলাকায় পাখিগুলো বিক্রি করেছে। দেখালাম মোটা লোকটাকে, ম্যাপে। আর একদণ্ড দেরি করল না সে। রেঞ্জার হাঁকিয়ে চলে গেল।

'যাওয়ার আগে কার্ডটা রেখে গেল। বলে গেল, কাকাতুয়াগুলোর কোন খবর পেলেই ফোনে জানাতে। কিন্তু কোথায় পাবে চাচা খবর? পেলে তো কাজের কাজই হত। একহাজার ডলার সোজা কথা? তবে ওই টাকা ছাড়াও বাঁচতে পারব আমরা,' মাথা উঁচু করে বলল ডিয়েগো। 'বন্ধুর কবর দিয়েছি। ঘর মেরামতের ব্যবস্থা করেছি। কোনভাবে এ-মাসের ভাড়াও জোগাড় করব। ভাল হয়ে উঠে চাচা

কাজে লাগবে। মোটকা সিনর তখন আর অপমান করার সাহস পাবে না চাচাকে।'

তার শেষ কথাটায় না হেসে পারল না মুসা।

গভীর চিন্তায় মগ্ন কিশোর। ঘনঘন চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে। কাকাতুয়াগুলোর ব্যাপারে অনেক কথা জেনেছে, তবে এখনও অনেক কিছু জানা বাকি। ডিয়েগোকে প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল, এই সময় দরজায় দেখা দিল বোরিস।

ডিয়েগোর কাহিনীতে এতই মগ্ন ছিল দুই গোয়েন্দা, বোরিসের কথা ভুলে গিয়েছিল।

'সব নামিয়েছি,' জানাল বোরিস। 'যাওয়া দরকার। ইয়ার্ডে অনেক কাজ।'

'আরেকটু। হয়ে গেছে,' বলল কিশোর। 'ট্রাকে লস অ্যাঞ্জেলেসের ম্যাপ আছে না?'

'কয়েকটা। লাগবে?'

'আপনি ট্রাকে বসুন গিয়ে। মুসার কাছে দিয়ে দিন।'

ম্যাপ নিয়ে এল মুসা।

'ডিয়েগো,' ম্যাপ বিছিয়ে বলল কিশোর, 'দেখাও তো, কোন জায়গা?'

খানিকক্ষণ দেখে নিয়ে এক জায়গায় আঙুল রাখল ডিয়েগো, 'মনে হয়, এখানে।'

পেন্সিল দিয়ে একটা এলাকায় গোল বৃত্ত আঁকল কিশোর। ভাঁজ করে পকেটে রেখে দিল ম্যাপটা।

'থ্যাংকস, ডিয়েগো,' বলল সে। 'বিলি আর বো-পীপকে কোথায় বিক্রি করেছেন তোমার চাচা, জানি। অন্যগুলোও দূরে কোথাও নয় নিশ্চয়। অনেক কথা জানা গেল তোমার কাছে, কিন্তু রহস্যের কোন কিনারা তো হলোই না, আরও জটিল হলো।'

'ঠিক বলেছ,' আঙুল তুলল মুসা।

'ইস্, হাতে পেয়েও হারালাম ব্ল্যাকবিয়ার্ডকে...' আফসোস করল কিশোর। 'যাকগে, যা গেছে তা নিয়ে ভেবে লাভ নেই।' হাত মেলাল ডিয়েগোর সঙ্গে। আশা করি, শিগ্গী ভাল হয়ে যাবেন তোমার চাচা। আর হ্যাঁ, মোটকা যদি আবার বিরক্ত করতে আসে, সোজা পুলিশে খবর দেবে।'

'পুলিশ?' জ্বলে উঠল ডিয়েগোর কালো চোখের তারা। 'মোটকা সিনর আবার এলে...' বিছানার তলা থেকে মোটা একটা লাঠি বের করল সে। 'হাসপাতালে যাওয়ার অবস্থা করে ছেড়ে দেব।'

হাসল তিনজনেই।

ছুটে চলেছে ট্রাক। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর।

'কি ভাবছ?' জবাব না পেয়ে কনুই দিয়ে বন্ধুর গায়ে গুঁতো দিল মুসা। 'হেই, কিশোর?'

'অ্যাঁ?'

'কি ভাবছ?'

'কেসটা জটিল।'

'শুধু জটিল?'
'না, বেশ জটিল।'
'কেন, মাথা ঘুরিয়ে দেয়ার মত বলতে লজ্জা লাগছে?'
'না, লাগছে না,' স্বীকার করল কিশোর। 'মাথা ঘুরিয়ে দেয়ার মতই।'

সাত

পরদিন সকালে। ইয়ার্ডে কাজকর্ম বিশেষ নেই। মেরিচাচীকে বলে-কয়ে অনুমতি নিয়ে বোরিস আর রোভারকে ডিয়েগোদের ওখানে পাঠাল কিশোর। কুঁড়ে মেরামতের কাজে ছেলেটাকে সাহায্য করার জন্যে। ডিয়েগো আর তার চাচা, দুজনকেই খুব পছন্দ হয়েছে তার। ঠিকমত খেতে পায় না, এত গরীব, কিন্তু আত্মসম্মান বোধ কি প্রচণ্ড।

দুপুরের পর ফিরে এল দুই ব্যাভারিয়ান ভাই।

হাসিমুখে ট্রাক থেকে নামল বোরিস। হাতে কার্ডবোর্ডের একটা বাক্স। ওয়ার্কশপের কাছে কিশোরকে দেখে এগোল।

বাক্সটা দেখেই চিনল কিশোর। এটাতে করেই ব্ল্যাকবিয়ার্ডকে ফেরত দিয়ে গিয়েছিলেন মহিলা।

বাক্সটা বাড়িয়ে ধরল বোরিস। 'ডিয়েগো দিল।'

নিয়ে মুসার হাতে দিল কিশোর।

পকেট থেকে একটা চিঠিও বের করে দিল বোরিস।

বাক্স আর চিঠি নিয়ে ওয়ার্কশপে ঢুকল তিন গোয়েন্দা।

'দড়ি কাটো,' মুসাকে অনুরোধ করল কিশোর।

বাক্সের দড়ি কেটে ডালা তুলতেই ফড়ফড় করে উঠল কালো ময়না, হলুদ ঠোঁট তুলে তাকাল মুসার দিকে।

'আরিব্বাপরে! ব্ল্যাকবিয়ার্ড,' চমকে সরে এল মুসা।

হেসে রবিনকে বলল কিশোর, 'চিঠিটা পড়ো তো কি লিখেছে।'

পড়ল রবিন ঃ

'ডিয়ার সিনর কিশোর,

'সিনর ব্ল্যাকবিয়ার্ডকে পাঠালাম। গতকাল দুপুরের খাওয়ার সময় এসে হাজির। আপনারা আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। আরও একটা কারণে পাঠিয়ে দিলাম, সিনর মোটকা এসে কেড়ে নিয়ে যেতে পারে। চমৎকার একটা ঘর হয়েছে আমাদের, আপনাদের সৌজন্যে। এক হাজার ধন্যবাদ।

—ডিয়েগো রটরিজ।'

রবিনের চিঠি পড়া শেষ হওয়ার অপেক্ষায় ছিল যেন ময়নাটা, লাফিয়ে বেরিয়ে এসে বসল বাক্সের কিনারে। কৌতূহলী চোখে তাকাল অসাবধানে বাক্সের কোণে ফেলে রাখা মুসার একটা আঙুলের দিকে।

সময়মত খেয়াল করল মুসা, চেঁচিয়ে এক টানে সরিয়ে আনল আঙুল, 'না না,

আর না! কালই শিক্ষা হয়ে গেছে আমার, লতিটা এখনও শুকায়নি। ব্যাটা তো একেবারে রক্তচোষা ডাকাত। মরলে নির্ঘাত ড্রাকুলা হবে।'

তার কথার জবাবেই যেন বার কয়েক ডানা ঝাপটাল পাখিটা, গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'আয়্যাম ব্ল্যাকবিয়ার্ড দা পাইরেট। আহ্যাভ বারিড মাই ট্রেজার হোয়্যার ডেড ম্যান গার্ড ইট এভার। ইয়ো-হো-হো অ্যাণ্ড অ্যা বটল অভ রাম!'

'হ্যাঁ, বাবা, তুমি ডাকাতই।'

হেসে উঠল অন্য দুজন।

এতে অপমানিত বোধ করল বোধহয় ব্ল্যাকবিয়ার্ড। আরও গম্ভীর হয়ে মুখ খারাপ করে গাল দিল গোটা দশেক।

হেডকোয়ার্টারে আলোচনায় বসেছে তিন গোয়েন্দা। তাদের মাথার ওপরে ঝোলানো খাঁচায় রাখা হয়েছে ব্ল্যাকবিয়ার্ডকে, খাঁচাটা বানানো হয়েছিল টমের জন্যে, সেই রেসিং হোমার কবুতরটা। ময়নার ভাব-ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে, মহাজ্ঞানী সে, ছেলেদের সব কথা শুনছে যেন মন দিয়ে, দরকার হলেই উপদেশ কিংবা পরামর্শ দেবে।

'বিলি শেকসপীয়ার আর লিটল বো-পীপ আছে হাইমাসের কাছে,' কিশোরের কথার পিঠে বলল মুসা। 'ও-তো কাল বললই, চারটে কাকাতুয়া আছে তার কাছে। সোজা গিয়ে এখন তাকে বলতে পারি, মিয়া, পাখিগুলো ফেরত দিলে দাও, নইলে যাচ্ছি পুলিশের কাছে। আসলে তো যাব না পুলিশের কাছে, কারণ দুজনকে কথা দিয়ে এসেছি, কিন্তু সেটা হিপোকে বলতে যাব কেন?'

'হুঁম্‌ম্‌,' আনমনে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। 'সমস্যা আছে। একটা কথা ঠিক, মিস্টার সিলভার চাইছিল, কাকাতুয়াগুলো হাইমাস পাক।'

'সেটা সমস্যা হলো নাকি?' রবিন প্রতিবাদ করল। 'সিলভার চেয়েছিল কিনে নিক। কিন্তু হাইমাস তো করেছে চুরি। মুসা ঠিকই বলেছে। চলো, গিয়ে পুলিশের ভয় দেখাই। সাথে বোরিস আর রোভারকে নিয়ে যাব। বেশি তেড়িবেড়ি করলে বাপের নাম ভুলিয়ে ছাড়বে মোটকার।'

'ঠিক আছে,' কার্ড বের করে দিল কিশোর। 'এই যে, হাইমাসের টেলিফোন নম্বর।'

পড়ল রবিন। লেখা আছে ঃ

হাইম হাইমাস
রেয়ার আর্ট ডিলার
লণ্ডন-প্যারিস-ভিয়েনা

তার নিচে হাতে লেখা রয়েছে হলিউডের একটা অ্যাপার্টমেন্টের ঠিকানা আর টেলিফোন নম্বর।

'আগে ফোন করো,' রবিনকে বলল কিশোর। 'তোমাকে দেখেনি, গলা চিনবে না। বলো, হলদে ঝুঁটিওলা একটা কাকাতুয়া আছে তোমার কাছে, বিক্রি করতে চাও। বলো, এক মেকসিকান ফেরিওলার কাছ থেকে কিনেছেন তোমার মা।

হাইমাসের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করো, জিজ্ঞেস করো কোথায় দেখা করতে চায়। আমরা সবাই যাব ওখানে।'

ডায়াল করল রবিন। ভাবছে, গুছিয়ে ঠিকমত বলতে পারবে তো মিছে কথাগুলো?

কিন্তু মিথ্যে বলার দরকার হলো না। অ্যাপার্টমেন্টের অপারেটর জানাল, দুই দিন আগে ঘর ছেড়ে চলে গেছেন মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস হাইমাস।

স্পীকারে কিশোর আর মুসাও ওপাশের কথা শুনতে পাচ্ছে।

'জিজ্ঞেস করো তো, কাকাতুয়াগুলোও নিয়ে গেছে কিনা?' বলল কিশোর।

অপারেটর জানাল, তাঁদের সঙ্গে কোন কাকাতুয়া ছিল না। কারণ অ্যাপার্টমেন্ট কর্তৃপক্ষ ভাড়াটেদের পশুপাখি সঙ্গে রাখতে দেন না, এ-ব্যাপারে খুব কড়াকড়ি।

রিসিভার রেখে দিয়ে বলল রবিন, 'গেল। হাইমাসকে কোথায় পাওয়া যাবে, তা-ও জানি না এখন।'

'চমৎকার অগ্রগতি,' নাক কুঁচকাল মুসা। 'খালি পিছিয়ে আসা।'

'এটা আপাতত হচ্ছে,' সহজে নিরাশ হওয়ার ছেলে নয় কিশোর। 'এক ঠিকানায় নেই, নিশ্চয় আরেক ঠিকানায় আছে। এমন কোথাও যেখানে কাকাতুয়া রাখতে বাধা নেই। বেশি ভাড়ার বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্টে আর বোধহয় থাকবে না, ওসব জায়গায় নানারকম ফ্যাকরা, অন্তত তার জন্যে। তাছাড়া এমন কোথাও থাকবে না যেখানে কাকাতুয়াগুলো খুব সহজে চোখে পড়ে।'

'আর আমার কোন কথা নেই,' হাত ডলছে মুসা। 'মাথায় কিছু ঢুকছে না।'

'রবিন কোন নতুন আইডিয়া দিতে পারো?' নথি-গবেষকের দিকে তাকাল গোয়েন্দাপ্রধান।

'হ্যাঁ, কিছু বলো,' মুসাও অনুরোধ করল। 'কিন্তু দোহাই, কিশোরের মত কঠিন করে বলো না।'

'সবগুলো ঘটনা আবার গোড়া থেকে ভেবে দেখা দরকার। মাঝখান থেকে ঢুকেছি আমরা,' বলল রবিন, 'মিস্টার ফোর্ডের কাকাতুয়া চুরি হওয়ার পর। অথচ ব্যাপারটা শুরু হয়েছে আরও অনেক আগে থেকে।'

'ইয়ো-হো-হো অ্যাণ্ড অ্যা বটল রাম!' কর্কশ চিৎকার করে উঠল ময়নাটা।

'বলো, রবিন,' হাত নাড়ল কিশোর, 'বলে যাও। অন্যের মুখে শোনার সময় চিন্তা করতে সুবিধে হয় আমার।'

'আমার ধারণা,' রবিন বলল, 'সব কিছুর মূলে ওই ইংরেজ লোকটা, ক্যাপ্টেন লঙ জন সিলভার, শুরুটা সে-ই করেছে। কয়েক মাস আগে ডিয়েগোর চাচার ওখানে এসে উঠল। বেআইনী ভাবে পালিয়ে এসেছিল ইংল্যাণ্ড থেকে। সঙ্গে একটা চ্যাপ্টা বাক্স, যেটাতে মূল্যবান কিছু ছিল, যেটা বিক্রি করতে ভয় পাচ্ছিল সে।'

কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। কোন প্রতিবাদ বা মন্তব্য করল না কিশোর।

'মারাত্মক কোন অসুখে ভুগছিল সিলভার,' আবার বলল রবিন, 'যে অসুখ সারার নয়। দ্রুত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারছিল লোকটা। মরার আগে বাক্সটা কোথাও লুকিয়ে ফেলল, তার গুপ্তধনসহ, সত্যিই যদি কোন গুপ্তধন থেকে

থাকে বাক্সে। রেখে গেল সাতটা পাখি, বিচিত্র কিছু বুলি শিখিয়ে।'

'হ্যাঁ, সত্যি বিচিত্র,' বিড়বিড় করল মুসা। 'মাথা ঘুরিয়ে দেয়ার মত।'

নোটবই দেখে বলল রবিন, 'লম্বা একটা চিঠি লিখে ডিয়েগোকে পোস্ট করতে দিল সিলভার। বলল, চিঠি পেয়ে মোটা এক লোক আসবে, স্যানটিনোকে হাজার ডলার দিয়ে নিয়ে যাবে পাখিগুলো। কিন্তু ঠিক সময়ে এল না হাইমাস। ঠেকায় পড়ে কাকাতুয়াগুলো তার আগেই বিক্রি করে দিতে বাধ্য হলো স্যানটিনো। এসে কাকাতুয়া না পেয়ে রেগে গেল মোটা লোকটা। ওগুলোর খোঁজে বেরোল। খুঁজে খুঁজে বের করে ফেলল চারটি পাখি। আমাদের জানামতে দুটো সে চুরি করেছে, অন্য দুটোও হয়তো তাই করেছে, কিংবা কিনে নিয়েছে। কি করেছে জানি না।

'বিলি শেকসপীয়ার চুরি হওয়ার পর কেস হাতে নিয়েছি আমরা। এখন আমাদের কাছে রয়েছে ব্ল্যাকবিয়ার্ড, কোন কারণে এটাকেই বেশি মূল্যবান মনে করছে হাইমাস। গেল পাঁচটা, বাকি আর দুটো পাখির কোন খোঁজ নেই। কিন্তু পাখিগুলো লোকটার কাছে কেন এত মূল্যবান, জানি না আমরা। এ-ও জানি না, নতুন কোন্ জায়গায় উঠেছে হাইমাস।' দম নিল রবিন। 'এ-যাবৎ যা যা ঘটেছে, এই হলো সারমর্ম।' লম্বা লেকচার শেষ করল সে।

'লুক আণ্ডার দা স্টোনস বিয়ণ্ড দা বোনস!' ডানা ঝাপটে চেঁচিয়ে উঠল ব্ল্যাকবিয়ার্ড। 'আই নেভার গিভ আ সাকার অ্যান ইভন ব্রেক!'

'বেশ সাজিয়ে বলেছ,' রবিনের দিকে চেয়ে মাথা কাত করল কিশোর। 'আমি আরও কিছু যোগ করছি। মিস্টার সিলভার বইয়ের পোকা ছিল, খুব পড়ত। নিজের ছদ্মনামটা কি রেখেছে খেয়াল করেছ? ক্যাপ্টেন লঙ জন সিলভার। ট্রেজার আইল্যাণ্ড বইয়ের সেই বিখ্যাত জলদস্যুর নামে নাম। ডাকাত সিলভারের কাঁধে থাকত একটা কাকাতুয়া, আর আমাদের মিস্টার সিলভারের কাঁধে ময়না।'

'তা-তো বুঝলাম,' মুসা বলল। 'কিন্তু এসব কি প্রমাণ করে?'

'জলদস্যুর সঙ্গে নাম মিলিয়ে রাখাটা প্রমাণ করে, কিছু একটা চুরি করেছে সে, হয়তো তার সেই রহস্যময় গুপ্তধন, যেটা বিক্রি করার সাহস হয়নি। চুরি করেছে বলেই হয়তো।

'তার সাহিত্যপ্রেমের আরেক নমুনা, নাম বাছাই,' বলে গেল কিশোর। 'কিভাবে কাকাতুয়াগুলোর নামকরণ করেছে লক্ষ করেছ? বিলি শেকসপীয়ার, লিটল বো-পীপ, ব্ল্যাকবিয়ার্ড দা পাইরেট, শার্লক হোমস, রবিন হুড, ক্যাপ্টেন কিড।'

'এবং স্কারফেস,' মনে করিয়ে দিল মুসা।

'ওটা কোন বই থেকে নয়। মারপিটের কোন সিনেমার হীরো কিংবা ডাকাতের নাম হবে। যাই হোক, ওই একটা ছাড়া বাকি সব নামই বই থেকে নেয়া, ক্লাসিক থেকে, নয়ত ইতিহাস থেকে।'

'আচ্ছা,' কথার মাঝেই বলে উঠল রবিন, 'তার গুপ্তধন কোন বইও তো হতে পারে? অনেক পুরানো দুর্লভ পুঁথি আছে, যে কোন যাদুঘর পেলে হাজার হাজার ডলার দিয়ে লুফে নেবে।'

ভুরু কোঁচকাল কিশোর। 'হতে পারে। কিন্তু মনে করে দেখো, সিলভার অন্য

কথা বলেছে। বলেছে ঃ রামধনুর একটা টুকরোর নিচে একপাত্র সোনা। বই বলে মনে হয়?'

'না,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল মুসা। 'কিন্তু তাতে কি? বিলি আর বো-পীপ কোথায় আছে জানি না, এমনকি হাইমাস কোথায় তা-ও অজানা। দেয়ালে ঠেকেছি আমরা, পথ বন্ধ।'

'কিন্তু ফোকর আছে,' নাটকের সংলাপ বলছে যেন কিশোর।

'গতকাল হাইমাসকে বলতে শুনেছি দুটো কাকাতুয়া এখনও নিখোঁজ। ওই দুটোকে জোগাড় করব আমরা। ব্ল্যাকবিয়ার্ড সহ আমাদের কাছে থাকবে তখন তিনটে, হাইমাসের কাছে চারটে। আগে পরে সেকথা সে জানবেই, নিতে আসবে।'

'কোন দরকার নেই,' দু-হাত নাড়ল মুসা। 'আবার ওই হিপোর মুখোমুখি হব? আমি পারব না। তাছাড়া কাকাতুয়া চুরি করতেও যেতে পারব না আমি লোকের বাড়িতে।'

'কে চুরি করতে বলেছে তোমাকে? কিনে নেব।'

'যেন দোকানে আছে, গিয়ে নিয়ে এলেই হলো। কোথায় আছে তাই তো জানি না।'

'জানতে হবে,' শান্ত কণ্ঠে বলল কিশোর। 'আবার চালু করে দেব ভূত-থেকে-ভূতে। কাকাতুয়া পছন্দ করে অনেক ছেলেমেয়ে, আর সেগুলো যদি ক্লাসিক ডায়ালগ বলে তাহলে কোন কথাই নেই। বাচ্চাদের চোখে পড়বেই পড়বে।' হলিউডের একটা ম্যাপ বের করে এক জায়গায় আঙুল রাখল সে। 'এখানকার তিনটে ছেলেকে চিনি আমি। ওরা ছড়িয়ে দেবে খবর।'

আট

খুব সহজেই কাজ হলো এবার।

'এটাই তো মনে হচ্ছে,' হাতের কাগজটার দিকে চেয়ে ঠিকানা মিলিয়ে নিল মুসা। দুটো ঠিকানা লিখে নিয়েছে, তার একটা মিলছে। 'গাড়ি রাখুন।'

রাস্তার ধারে রোলস নামিয়ে আনল শোফার। হ্যানসন নয়, নতুন আরেকজন। বেঁটে, শয়তানী ভরা চাহনি, নাম ক্র্যাব। মুসার মনে হলো কাঁকড়ার দাঁড়ার মতই হাত নাড়ে লোকটা। রবিনও রয়েছে গাড়িতে। দুজনের কেউই পছন্দ করতে পারছে না নতুন শোফারকে। সকালে রোলস-রয়েসের জন্যে ফোন করেছিল কিশোর, কোম্পানির ম্যানেজার জানিয়েছে জরুরী কারণে ছুটি নিয়েছে হ্যানসন। নতুন ড্রাইভার দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে গাড়ি।

এঞ্জিন বন্ধ করে দুই গোয়েন্দার দিকে ফিরে হাসল ক্র্যাব। কিশোর আসেনি সঙ্গে। বোরিস আর রোভার গেছে পুরানো মাল আনতে। চাচা-চাচী গেছেন আরেক কাজে। ফলে বাধ্য হয়ে ইয়ার্ডে পাহারায় থাকতে হয়েছে কিশোরকে।

'কিছু তদন্ত করতে যাচ্ছ তোমরা?' জিজ্ঞেস করল ক্র্যাব। 'হ্যানসন বলেছে

তোমাদের কথা। এসব ব্যাপারে আমিও খুব ইনটারেসটেড। যাও, আমি গাড়িতে আছি। দরকার পড়লে ডেকো।' নিজের কপালে টোকা দিল। 'চোর-ডাকাতের স্বভাব রেকর্ড করা আছে এখানে।'

লোকটার অহঙ্কারী ভাবসাব ভাল লাগল না মুসার । বলল , 'চোর-ডাকাত ধরতে যাচ্ছি না। একটা হারানো কাকাতুয়া খুঁজতে যাচ্ছি।'

'হারানো কাকা…' থেমে গেল ক্র্যাব, বিষয় পছন্দ হলো না। কিংবা হয়তো ভাবল মুসা তার সঙ্গে রসিকতা করছে। গম্ভীর হয়ে একটা খবরের কাগজ টেনে নিয়ে পড়ায় মন দিল।

ভূত-থেকে-ভূতে চালু করে দেয়ার কয়েক ঘণ্টা পরই দুটো কাকাতুয়ার খোঁজ পাওয়া গেছে। আরও কিছু তথ্যও জানা গেছে। কদিন ধরেই নাকি কয়েকটা কাকাতুয়ার জন্যে দ্বারে দ্বারে ঘুরেছে মোটা এক লোক, শেষে ক্যাপ্টেন কিড আর শারলক হোমস নামের দুটো কাকাতুয়া পেয়ে ডবল দাম দিয়ে কিনে নিয়ে গেছে।

বাকি দুটো কাকাতুয়া, স্কারফেস আর রবিন হুডকে নিতে এসেছে এখন রবিন আর মুসা। ওগুলোর বর্তমান মালিকেরা বিক্রি করতে রাজি হলে কিনে নিয়ে যাবে, আর তা নাহলে রেকর্ড করে নিয়ে যাবে কাকাতুয়া দুটোর বুলি। টেপরেকর্ডার নিয়ে এসেছে সে-জন্যে সঙ্গে করে।

সিমেন্টে বাঁধানো পথ ধরে হাঁটতে শুরু করল দুই গোয়েন্দা। দু-ধারে উঁচু পাতাবাহারের ঝাড়। পথের শেষ মাথায় পুরানো একটা বাড়ি, নতুন প্লাসটার করা হয়েছে।

ওরা বাড়িটার ফুট বিশেক দূরে থাকতেই খুলে গেল সামনের দরজা। বেরিয়ে এল ওদের চেয়ে সামান্য বেশি বয়েসী একটা ছেলে। টিংটিঙে তালপাতার সেপাই, মুসার চেয়ে লম্বা, বাঁকা নাক। দুই গোয়েন্দাকে দেখে বত্রিশ দাঁত বের করে হাসল।

'এহ্‌হেরে! আবার এসেছে জ্বালাতে!' বলে উঠল মুসা। 'এই রবিন সরো, সরো, শুঁটকির গন্ধ লাগবে গায়ে।'

রকি বীচে ফিরে এসেছে আবার তিন গোয়েন্দার চিরশত্রু টেরিয়ার ডয়েল।

মুসার কথায় কিছুই মনে করল না টেরি। হাসি আরও বিস্তৃত হলো। হাতের খাঁচাটা তুলে ধরে এগোল কয়েক পা, বলল, 'এটার জন্যেই এসেছ, না?'

খাঁচার ভেতরে একটা কাকাতুয়া। হলদে ঝুঁটি। এক চোখ কানা, ভয়ানক কোন লড়াইয়ে স্বজাতির ঠোঁট কিংবা নখের আঘাতে হারিয়েছে বোধহয় চোখটা।

'কাকাতুয়া?' বিস্ময় চেপে রাখতে পারল না মুসা। বলেই ফেলছিল, এটার জন্যেই এসেছে।

কিন্তু তাড়াতাড়ি বাধা দিল রবিন। 'কাকাতুয়া? ওই কানা পাখি আমাদের কি কাজে লাগবে, মিস্টার শুঁটকি?'

কিন্তু ধাপ্পাটা কোন কাজে লাগল না। টেরি জানে, এটার জন্যেই এসেছে রবিন আর মুসা।

'গতরাতে এসেই শুনলাম কাকাতুয়ার খবর,' হেসে মুসার দিকে চেয়ে চোখ

টিপল টেরি, রাগানোর জন্যে। 'তা কালু মিয়া কাকাতুয়া দিয়ে কি করবে? ভেজে খাবে?'

'শুঁটকির ভর্তা বানিয়ে খাব,' রেগে গেল মুসা।

হা-হা করে হাসল টেরি। 'দারুণ বলেছ হে কালু মিয়া। বুদ্ধি খুলছে আজকাল। তো তোমাদের খোকা শারলক কই? কাকাতুয়ার খবর চেয়েছে কেন?'

শার্টের হাতা গোটাতে শুরু করল মুসা।

হাত চেপে ধরল রবিন। টেরিকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি খবর পেলে কি করে?'

'এটা একটা প্রশ্ন হলো নাকি? আমেরিকার সব ছেলেই তো জানে, দুটো কাকাতুয়ার খোঁজ চায় শারলক পাশা। আমিও শুনলাম বন্ধুদের কাছে। তাই সকাল সকালই চলে এসেছি। চল্লিশ ডলারে কিনেছি এটা। নেবে নাকি? দেড়শো ডলার লাগবে।'

'এক আধলা দিয়েও নেব না আমরা,' জবাব দিল রবিন। 'ওই কাকাতুয়া চাইনি আমরা, কানা কাকাতুয়া।'

'তাই নাকি? তাহলে অযথা সময় নষ্ট করছি। আরেক কাস্টোমার আগেই বলে রেখেছে আমাকে। পুরো দেড়শো দেবে। চলি, বাই-বাই।' পা বাড়াল টেরি।

'আই নেভার গিভ আ সাকার অ্যান ইভন ব্রেক!' হঠাৎ কর্কশ গলায় বলে উঠল কাকাতুয়াটা।

অবাক হয়ে পাখিটার দিকে তাকাল টেরি। ভাবল, বকাটা তাকেই দিয়েছে। রেগে গিয়ে ধমক লাগাল, 'শাটাপ!' গটমট করে হেঁটে গেল গাড়িবারান্দার এক দিকে। এঞ্জিন স্টার্ট নিল। শাঁ করে ঝোপের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এল নীল একটা স্পোর্টস কার, চালিয়ে নিয়ে চলে গেল টেরি।

'শুঁটকি কার কাছে বেচবে?' রবিনকে জিজ্ঞেস করল মুসা। 'হাইমাস?'

জবাব দিতে পারল না রবিন। তাড়াতাড়ি নোট বই বের করে লিখে নিল, স্কারফেস—মানে কানা কাকাতুয়াটা কি বুলি আউড়েছে।

'একটা তো গেল,' বলল মুসা। 'চলো, দেখি আরেকটা পাই কিনা।'

ক্র্যাবকে আরেক ঠিকানায় যেতে বলল মুসা।

কয়েক ব্লক পরেই বাড়িটা। এত পুরানো বিলডিং, জায়গায় জায়গায় প্ল্যাস্টার খসে গেছে, বেরিয়ে পড়েছে ইঁটের পাঁজর।

গাড়ি থেকে নেমে বাড়িটার দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলল মুসা, 'ভাবছি, ভূত-থেকে-ভূতের সুবিধে যেমন, অসুবিধেও তেমনি। সবাই জেনে যাচ্ছে খবর, শত্রুরাও জেনে যাচ্ছে। ফলে বেকায়দা হয়ে যায়। শুঁটকি তো কয়েকবারই অসুবিধেয় ফেলল এভাবে।'

'রবিন হুডকে না নিয়ে গেলেই বাঁচি,' বলল রবিন।

পাওয়া গেল রবিন হুডকে। কোন কারণে খোঁজ পায়নি বা খবরই জানেনি শুঁটকি, কিংবা আগ্রহ দেখায়নি। যা-ই হোক, নিতে পারেনি, বা নেয়নি। আছে। বাড়ির মালিকের মাথা জুড়ে বিশাল টাক। জানাল, কেনার সময় একবারই কথা বলেছিল কাকাতুয়াটা, সে-জন্যেই কিনেছে, তারপর একেবারে জবান বন্ধ। আর

একটি বারও বুলি আউড়ায়নি। বাড়িওয়ালী গেছে রেগে। স্বামীকে কদিন ধরেই চাপ দিচ্ছে কাকাতুয়াটা বিদেয় করে দিয়ে একটা ক্যানারি কেনার জন্যে।

কাজেই, সস্তায়ই পাওয়া গেল কাকাতুয়াটা। পঁচিশ ডলারে কিনেছিল বাড়িওয়ালা, পঁচিশ ডলারেই বিক্রি করে দিল দুই গোয়েন্দার কাছে। টাকাটা গুণে নিয়ে পকেটে রেখে বলল, 'কেন কিনছ, বুঝতে পারছি না। কথা জানে ব্যাটা, কিন্তু বলে না। দেখো, তোমরা বলাতে পারো কিনা। বাচ্চারা অনেক সময় অনেক কিছু পারে, যা বুড়োদের পক্ষে অসম্ভব।'

'থ্যাংক ইউ, স্যার,' বলল রবিন। 'দেখব চেষ্টা করে।'

কাকাতুয়াটাকে নিয়ে বেরিয়ে এল ওরা।

বিষণ্ণ হয়ে খাঁচায় বসে আছে রবিন হুড। ছেলেদের দিকে ফিরেও তাকাল না।

'তাজ্জব ব্যাপার?' বলল মুসা। 'কথা বলে না কেন?'

'দেখা যাক, কিশোর বলাতে পারে কিনা···আরে, গাড়িটা গেল কোথায়? এখানেই তো ছিল।'

আশেপাশে গাড়িটাকে খুঁজল ওরা। কিন্তু নেই।

'ওই ক্র্যাবের বাচ্চাকে দেখেই ভাল্লাগেনি আমার,' গোমড়া মুখে বলল মুসা। 'ব্যাটা আমাদের ফেলে চলে গেছে।'

'তা-তো গেছে, যাই কি করে এখন?' আরেকটা গাড়ি কিংবা ট্যাকসির জন্যে. এদিক ওদিক তাকাল রবিন। যেন তার মনের খবর জানতে পেরেই ঘ্যাচ করে এসে পাশে থামল একটা ঝরঝরে ভ্যান। ড্রাইভিং সীট থেকে জানালা দিয়ে মুখ বের করল এক মহিলা। 'রোলস-রয়েসটাকে খুঁজছ? ওদিকে চলে যেতে দেখলাম।'

'কেন যে গেল বুঝতে পারছি না,' কপাল চুলকাল রবিন।

'যাবে কোথায় তোমরা?'

জানাল মুসা।

'এসো, বাস স্টেশনে নামিয়ে দেব। ওদিকেই যাচ্ছি,' আমন্ত্রণ জানাল মহিলা।

মহিলাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাল মুসা। 'এসো, রবিন। কি আর করা। উইলশায়ার থেকে বাস ধরব।'

মহিলার পাশে উঠে বসল মুসা।

রবিন উঠল তার পাশে। চিন্তিত। চেনা চেনা লাগছে মহিলার কণ্ঠস্বর, আগে কোথাও শুনেছে।

চলতে শুরু করেছে ভ্যান।

'আরে, ওদিকে কোথায়?' তাড়াতাড়ি বলল রবিন। 'উল্টোদিকে যাচ্ছেন তো। উইলশায়ার ওদিকে।'

'উইলশায়ারে যাচ্ছেটা কে?' পেছন থেকে বলে উঠল একটা কর্কশ কণ্ঠ, কথায় ব্রিটিশ টান। 'অন্যখানে যাচ্ছি আমরা।'

চমকে ফিরে চাইল দুই গোয়েন্দা।

সীটের পেছনের একটা পার্টিশন সরে গেছে। আরাম করে বসে আছে হাইমাস। গোল মুখে কুৎসিত হাসি।

'আমার সঙ্গে যাবে তোমরা, যেখানে নিয়ে যাব,' আবার বলল হাইমাস। 'একটু গোলমাল করেছ কি…' কথাটা শেষ করল না সে। ইয়া বড় এক ছুরি বের করল। পাতলা ঝকঝকে বাঁকা ফলা, হাতলের কাছটায় একটা সাপের ছবি খোদাই করা।

'এটার নাম সর্প-ছুরি,' ভীষণ ভঙ্গিতে ছুরিটা নাড়ল সে। 'হাজার বছর আগে দামেসকে তৈরি হয়েছিল। এটার একটা বাজে ইতিহাস আছে। বারোজন লোককে খুন করেছে ইতিমধ্যেই। আরও এক বা দুজনকে খুন করতে কোন আপত্তি থাকার কথা নয়। তেরো নম্বর কে হতে চাও? আনলাকি থারটিন?'

নয়

দ্রুত ছুটছে ভ্যান। হলিউডের পরে খাড়া রুক্ষ পাহাড়শ্রেণী ছাড়িয়ে এল।

'আগেই সতর্ক করেছি তোমাদের,' এক সময় বলল মহিলা। 'শোনোনি।'

এইবার মনে পড়ল রবিনের, কেন চেনা চেনা লাগছিল কণ্ঠস্বর। সেদিন এই মহিলাই ফোনে হুঁশিয়ার করেছিল। হাইমাসের ব্যাপারে নাক না গলাতে বলেছিল।

পাহাড়ী পথ ধরে পাহাড়ের মধ্যে ঢুকে যেতে শুরু করল গাড়ি, সরু গিরিপথ।

কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল মুসা, 'একটা কথা বলবেন, মিস্টার হাইমাস, ক্র্যাবকে তাড়ালেন কিভাবে?'

'আরে ওটা একটা গাধা,' হাসল হাইমাস। 'নিজেকে খুব চালাক মনে করে। সেদিন রেন্ট-আ-রাইড কোম্পানিতে একটা গাড়ি ভাড়া করতে গিয়ে দেখেছি ওকে, তখনই বুঝেছি। রেঞ্জারটা লোকের চোখে পড়ে তো, তাই সাধারণ একটা গাড়ি নিতে গিয়েছিলাম। রোলস রয়েসটা সেদিনই দেখলাম। তোমাদেরকে চড়তেও দেখেছি। জানলাম, একটা ওয়্যারলেস টেলিফোন আছে ওতে।

'আজ তোমাদের অনুসরণ করেছি। গাড়ি থেকে নেমে পুরানো বাড়িটায় যখন ঢুকলে, কোণের একটা স্টোর থেকে গিয়ে ক্র্যাবকে ফোন করলাম। বললাম, বাড়ির ভেতর থেকে বলছি। তোমরা দুপুরের খাবার খেয়ে যাবে, যেতে দেরি হবে, সে যেন চলে যায়। বিকেলে এসে নিয়ে যায় তোমাদের। সামান্যতম সন্দেহ করল না গাধাটা। চলে গেল।'

'হাইম,' কথাবার্তা থেকেই বোঝা গেল, মহিলা হাইমাসের স্ত্রী, 'তুমি নিশ্চই…'

'না,' বাধা দিল হাইমাস, বুঝে ফেলেছে তার স্ত্রী কি বলতে চায়। 'রাস্তা খারাপ, দেখে চালাও। রিয়ার-ভিউ মিররে চোখ রাখছ তো?'

'হ্যাঁ। ছোট একটা গাড়ি একবার দেখলাম মনে হলো। এখন আর দেখছি না।

'সাবধান। সামনে বাঁক।'

গতি কমিয়ে তীক্ষ্ণ মোড় নিল গাড়ি। বেরিয়ে এল পাহাড়ের মাঝের লম্বা ফাঁপা একটা ফাঁকা জায়গায়। একটা বাড়ি আছে ওখানে। ডাবল গ্যারেজ। তাতে দাঁড়িয়ে আছে সেই কালো রেঞ্জারটা। ওটার পাশে এসে থামল ভ্যান।

'বিচ্ছু মিয়ারা, নামো,' আদেশ দিল হাইমাস। 'তাড়াহুড়ো করবে না।

তোমাদের বিশ্বাস নেই।'

ধীরে সুস্থেই নামল দুই গোয়েন্দা। পেছনে নামল হাইমাস।

চমৎকার সাজানো গোছানো বড় একটা লিভিং রুমে ছেলেদের নিয়ে এল হাইমাস। এক কোণে একটা টেবিল রাখা চারটে খাঁচায় চারটে হলদে ঝুঁটি কাকাতুয়া। মানুষের সাড়া যেন কানেই যায়নি পাখিগুলোর। একই ভাবে বসে রয়েছে, নীরব। হাইমাস যখন রবিন হুডের খাঁচাটা রাখল ওগুলোর পাশে, তখনও নড়ল না।

বড় সোফায় বসল রবিন আর মুসা। তাদের মুখোমুখি উল্টো দিকের আরেকটা সোফায় বসল হাইমাস, আনমনে আঙুল দিয়ে ছুরির ধার পরীক্ষা করছে।

'তারপর বিচ্ছুরা,' বলল সে, 'কয়েকটা কথা জানাও তো আমাকে। সিলভারের ট্রেনিং দেয়া সাতটার মধ্যে পাঁচটা কাকাতুয়াই পেয়ে গেছি। বাকি দুটোও জোগাড় করব। তা শোঁপার খপ্পড়ে পড়লে কি করে তোমরা? কতখানি জানে সে?'

'শোঁপা?' চোখ মিটমিট করল মুসা।

রবিনের দৃষ্টি শূন্য।

'না জানার ভান করে লাভ হবে না,' অধৈর্য হয়ে ছুরি নাড়ল সে। 'শোঁপা, ওই ফরাসীটা। ইউরোপের সবচে বড় আর্ট থিফ। সাংঘাতিক লোক সে। আমার পেছনে লেগেছে।'

মাথা নাড়তে যাচ্ছিল রবিন, তার আগেই বলে উঠল মুসা, 'মাঝারি উচ্চতা, কালো সরু গোঁফ, কথায় ফরাসী টান, ওই লোকটার কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ। চেনো তাহলে, স্বীকার করছ।'

'চিনি বললে ভুল হবে, তবে দেখা হয়েছে,' বলল মুসা। 'আরেকটু হলেই রোলস-রয়েসের সঙ্গে লাগিয়ে দিয়েছিল ধাক্কা। ওই যে, বিলি শেকসপীয়ারকে যেদিন খুঁজতে গিয়েছিলাম, সেদিন। দোষ করল তার ড্রাইভার, উল্টে ঝগড়া লেগে গেল হ্যানসনের সঙ্গে,' সব কথা খুলে বলল সে।

'হ্যাঁ, ওই ব্যাটাই,' বলল হাইমাস। 'কিন্তু শোঁপার হয়ে কাজ না করলে কাকাতুয়াগুলোর ব্যাপারে এত আগ্রহ কেন তোমাদের?'

মিস্টার ফোর্ডের হারানো কাকাতুয়া খুঁজতে গিয়ে কিভাবে জড়িয়ে পড়েছে তিন গোয়েন্দা, বলল মুসা।

শঙ্কা আর উত্তেজনা দূর হয়ে গেল হাইমাসের। 'ও, এই ব্যাপার। আমি তো ভয় পাচ্ছিলাম, শোঁপার হয়ে কাজ করছ তোমরা। সেদিন হয়েছিল কি জানো?' চশমা খুলে শার্টের কোণায় ডলে পরিষ্কার করে নিয়ে আবার নাকে বসাল সে। 'অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে ফিরে দেখি রাস্তার মোড়ে বসে আছে শোঁপা। বাড়ির দিকে নজর। ঘরে ঢুকেই বুঝলাম কেউ ঢুকেছিল। কিছু খোঁজাখুঁজি করে গেছে।' স্ত্রীর দিকে চেয়ে বলল, 'তুমি তো সেদিন বিশ্বাস করতে চাওনি। এখন তো মানবে? ব্যাটা ঘরে ঢুকে সেদিন নোটগুলো পড়ে গেছে।'

'হ্যাঁ,' ঠোঁট কামড়াল মহিলা, 'শোঁপাই পিছে লেগেছে। তবে এখানে আমাদেরকে খুঁজে পাবে না।'

'তা কে জানে।' ছেলেদের দিকে ফিরল হাইমাস। 'এই পাহাড়ের মধ্যিখানে কেন বাড়ি ভাড়া নিয়েছি জানো? শোঁপার ভয়ে। তাছাড়া কাকাতুয়াগুলো রাখারও সুবিধেমত জায়গা পাচ্ছিলাম না। রেঞ্জারটাও এখানে লুকিয়ে রাখতে পারছি। তোমরা গাড়িটা যে খুঁজছিলে, অ্যাপার্টমেন্টের ম্যানেজারের কাছে শুনেছি। তার ছেলে বার বার নাকি জিজ্ঞেস করছিল গাড়িটার কথা। ধমক দিয়ে ছেলেকে থামিয়েছে ম্যানেজার, শাসিয়েছে, ভাড়াটের কোন কথা বাইরের কারও কাছে ফাঁস করলে ভাল হবে না। কিন্তু ধমক-ধামক দিয়ে বাচ্চাদের মুখ বন্ধ করা যায়? তাই পালিয়েই এলাম।'

'ওই ছেলেটার কাছেই তোমাদের নম্বর পেয়েছি,' জানাল হাইমাসের স্ত্রী। 'তোমাদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করেছিলাম, হাইমাসের ব্যাপারে নাক গলাতে মানা করেছিলাম।'

'রেগে গেলে আমার মেজাজ ঠিক থাকে না, সামলাতে পারি না নিজেকে,' স্বীকার করল হাইমাস। 'লোকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে বসি। তোমাদের সঙ্গেও করেছি। এতখানি অবশ্য করতাম না, যদি না ভাবতাম শোঁপার সঙ্গে তোমরা হাত মিলিয়েছ।'

হাতের ছুরিটার দিকে চোখ পড়ল তার, সরিয়ে রাখল তাড়াতাড়ি। লজ্জিত হেসে বলল, 'ভয় দেখাতে চেয়েছিলাম, আর কিছু না। এত বেশি দুশ্চিন্তায় আছি...'

'যা হয়ে গেছে, গেছে,' বাধা দিয়ে বলল তার স্ত্রী। 'এক কাজ করো না কেন? ওদের সাহায্য চাও। বুদ্ধিসুদ্ধি আছে ওদের, বোঝাই যায়। তুমি যা পারোনি তাই ওরা করেছে। স্কারফেস আর রবিন হুডকে খুঁজে বের করেছে।'

'ঠিকই বলেছ,' তোয়ালের সমান এক রুমাল বের করে থলথলে গালের ঘাম মুছল হাইমাস। 'সত্যিই আমি লজ্জিত, সরি। বদমেজাজী লোককে কেন লোকে পছন্দ করে না, বুঝতে পারছি।'

দৃষ্টি বিনিময় করল দুই গোয়েন্দা।

'থাক থাক, ভুল হয়েই থাকে মানুষের,' হাত তুলল রবিন।

'আমরা বয়েসে অনেক ছোট, আমাদের কথা বাদ দিন। কিন্তু মিস্টার ফোর্ড আর মিসেস বোরোর কাছে গিয়ে মাপ চাওয়া উচিত আপনার। তাদের কাকাতুয়া চুরি করেছেন, মিস্টার ফোর্ডকে তো হাত-পা বেঁধে ফেলে এসেছিলেন। যদি আমরা না যেতাম, কি অবস্থা হত?'

'না, কিছু হত না,' আরেক দিকে চেয়ে বলল হাইমাস। 'তোমরা না গেলে পরে এক সময় গিয়ে খুলে দিয়ে আসতাম। তবে হ্যাঁ, মাপ চাওয়া উচিত, ঠিকই বলেছ।'

'কাকাতুয়াগুলো চুরি করলেন কেন?'

'না করে উপায় ছিল না। জন সিলভারের লুকানো গুপ্তধনের চাবিকাঠি রেখে গেছে সে কাকাতুয়াগুলোর কাছে।'

কিশোর এটাই সন্দেহ করছে, হঠাৎ বুঝে ফেলল রবিন। 'মিস্টার হাইমাস,' বলল সে, 'কাকাতুয়াগুলোর বুলিতে রয়েছে সঙ্কেত। সাতটা বুলি মিলিয়ে বুঝতে

হবে কোথায় রয়েছে গুপ্তধন।'

'বুদ্ধিমান ছেলে,' বলল হাইমাস। 'ঠিক ধরেছ। আমার সঙ্গে তিক্ত রসিকতা করেছে জন সিলভার। আসলে এক ধরনের প্রতিশোধ। কাকাতুয়াকে বুলি শিখিয়ে গেছে, তাতে রয়েছে গুপ্তধনের সঙ্কেত, সেই সঙ্কেত বুঝে তারপর খুঁজে বের করতে হবে আমার। তার স্বভাবই ছিল এটা। অসাধারণ বুদ্ধিমান ছিল সিলভার, এবং পাগল।'

'হাইম,' বলে উঠল মিসেস হাইমাস, 'খালি কথা বললে পেট ভরবে? কিছু খেতেটেতে হবে না? সেই কখন খেয়েছি···যাই, কয়েকটা স্যাণ্ডউইচ বানিয়ে আনি।'

খাবারের কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মোচড় দিয়ে উঠল মুসার পাকস্থলী। অবাক হয়ে ভাবল, এতক্ষণ ভুলে ছিল কি করে? রবিনেরও খিদে পেয়েছ। উত্তেজনার কারণেই ভুলে ছিল।

মিসেস হাইমাস রান্নাঘরে চলে গেল।

'ইংল্যাণ্ডে থাকতেই মিস্টার সিলভারকে চিনতেন?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'হ্যাঁ, দু'বছর ধরে। আমার কর্মচারী ছিল। রেয়ার আর্ট কেনাবেচার কাজে সাহায্য করত। লণ্ডনে। উচ্চ শিক্ষিত লোক, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান। তবে অদ্ভুত রসবোধ ছিল, আর এ-কারণেই কোন চাকরিতে বেশি দিন টিকতে পারত না, গুণ থাকা সত্ত্বেও। শেষে তো এমন অবস্থা হলো, কেউ আর চাকরি দিতে চায় না। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ধাঁধা আর জোক পাঠিয়ে কোনমতে দু-বেলা দু-মুঠো জোগাড় করত।

'এই সময়ই একদিন চাকরির জন্যে এল আমার কাছে। সাহিত্য আর শিল্প সম্পর্কে তার জ্ঞানের বহর দেখে সত্যি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তার দুর্নাম আমার কানেও এসেছিল, তবু চাকরি দিলাম। বুঝেছিলাম, খুব কাজে লাগবে।

'ভালই কাজ চালাচ্ছিল, ছোটখাট রসিকতা করে মাঝেমাঝে জ্বালাত অবশ্য। তবে সহ্য করে নিচ্ছিলাম। যাই হোক, একদিন একটা ছবি কিনে নিয়ে এল। অতি সাধারণ ছবি, হলদে ঝুঁটিওয়ালা দুটো কাকাতুয়া গাছের ডালে বসে আছে। অনেক বেশি দাম দিয়ে বাজে একটা জিনিস নিয়ে আসায় রাগ হয়েছিল খুব, বকে ছিলাম। চুপ করে রইল সিলভার। ভাবলাম, ওটাও আরেক রসিকতা। গেলাম রেগে, মেজাজ ঠিক রাখতে না পেরে দিলাম চাকরি থেকে বরখাস্ত করে।

'জন সিলভার কিন্তু তার আসল নাম নয়, তবু ওই নামেই ডাকা হোক, এটা চাইত। নিজের নাম নিয়েও রসিকতা, পাগল আর কাকে বলে? অফিস থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে সে বলল, ওটা ডাবল পেইন্টিং। ডাবল পেইন্টিং মানে, রঙ লেপে মূল ছবিটাকে ঢেকে দিয়ে তার ওপর আরেকটা ছবি আঁকা। বিখ্যাত চিত্রকর্ম লুকিয়ে রাখার জন্যে কখনও কখনও করা হয় এটা। আমি তার কথা বিশ্বাস করলাম না। কিন্তু জোর গলায় বলে গেল সে, সেটা প্রমাণ করে দেখাবে। করলও তাই।' চুপ করল হাইমাস।

আগ্রহে সামনে ঝুঁকে এসেছে রবিন আর মুসা, রোমাঞ্চকর এক গল্প শুনছে যেন।

'হ্যাঁ, সত্যি সত্যি প্রমাণ করল সে। ওপরের ছবিটা মুছে ফেলল। বেরিয়ে পড়ল

এক অসামান্য চিত্রকর্ম। একটা ভেড়ার বাচ্চাকে আদর করছে এক মেষপালক। আমাকে দেখাতে নিয়ে এল।

'এক নজর দেখেই বুঝলাম কি ভুল করেছি তাকে তাড়িয়ে দিয়ে। এক মস্ত শিল্পীর আঁকা ওই ছবি নিখোঁজ ছিল অনেক দিন, কেন নিখোঁজ ছিল তখন বুঝতে পারলাম। চোরের ভয়ে ডাবল পেইন্ট করে ফেলা হয়েছিল। ছোট্ট ছবি, কিন্তু দাম অনেক। পাঁচ সাত-লাখ ডলারের কম নয়।'

'খাইছে!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'একটা ছবির এত দাম? এক ডলারেই তো ফ্রেমসহ পাওয়া যায় কত ছবি।'

'সেগুলো ছাপা কপি,' রবিন বলল। 'নিউ ইয়র্ক সিটির মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম অভ আর্ট যাদুঘরের নাম শুনেছ? বিখ্যাত ডাচ চিত্রকর রেমব্র্যান্ত-এর একটা ছবি বিশ লাখ ডলারে কিনেছে ওরা। কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলোর আসল মূল্যের চেয়ে অ্যানটিক মূল্য বেশি।'

'মারছে!' চোখ কপালে উঠল মুসার। 'একটা ছবির জন্যে বিশ লাখ ডলার! কত রকমের পাগল যে আছে দুনিয়ায়।'

'হ্যাঁ, তারপর কি হলো শোনো,' থেমে গেল হাইমাস। খাবারের ট্রে নিয়ে এসেছে তার স্ত্রী। বড় প্লেটে কয়েকটা স্যাণ্ডউইচ, দুই গ্লাস দুধ আর দুই কাপ কফি। টেবিলে নামিয়ে রাখল।

যার যার খাবার তুলে নিয়ে খেতে শুরু করল সবাই।

স্যাণ্ডউইচ শেষ করে কফির কাপে চুমুক দিয়ে বলল হাইমাস, 'হ্যাঁ, সিলভার বলল, যেহেতু সে তখন চাকরিতে নেই, ছবিটার মালিক সে। বললাম, চাকরিতে থাকার সময় আমার টাকায় কিনেছে, কাজেই ছবির মালিক আমি। অনেক তর্কাতর্কির পর আধাআধি বখরা অফার করল আমাকে।'

'ভালই তো প্রস্তাব,' দুধের শূন্য গেলাসটা নামিয়ে রাখল মুসা। 'হাজার হোক, ছবিটা তো সে-ই খুঁজে পেয়েছে।'

'কিন্তু আমাকে ধরল ভূতে,' আফসোসের সুরে বলল হাইমাস, 'তাতেও রাজি হলাম না। পুলিশের ভয় দেখালাম তাকে। রুখতে পারলাম না, ছবিটা নিয়ে পালাল। থানায় ডায়েরী করে তার নামে ওয়ারেন্ট বের করলাম। কিন্তু একেবারে গায়েব হয়ে গেল। পরে জানা গেল, একটা মালবাহী জাহাজে করে ইংল্যাণ্ড থেকে বেরিয়ে গেছে সে। সঙ্গে করে নিয়ে গেছে দামী মেষপালক।'

'দোষ তো তোমারই,' বলল মিসেস হাইমাস।

'হ্যাঁ, আমারই দোষ।' ছেলেদের দিকে ফিরে বলল হাইমাস, 'দেশ-বিদেশের চেনা সমস্ত চিত্রব্যবসায়ীকে জানিয়ে দিলাম ছবিটার কথা। চোখ খোলা রাখতে অনুরোধ করলাম। কিন্তু বাতাসে মিলিয়ে গেল যেন সিলভার। ক্যালিফোরনিয়ায় এসে লুকিয়ে রইল।'

'হ্যাঁ,' বলল রবিন, 'মিস্টার স্যানটিনোর বাড়িতে। সঙ্গে একটা ধাতুর বাক্স ছিল। রোজ রাতে নাকি খুলে দেখত আর বলত, আহা, কি সুন্দর রামধনুর টুকরো, নিচে একপাত্র সোনা।'

'একেবারে নিখুঁত বর্ণনা,' সায় দিল হাইমাস। 'রামধনুর সাতরঙেই আঁকা হয়েছে ছবিটা। সোনার চেয়েও দামী। হ্যাঁ, তারপর হঠাৎ একদিন সিলভারের লম্বা এক চিঠি এসে হাজির আমার অফিসে। লিখেছে, ছবিটা নিরাপদেই আছে, লুকানো। সেটা বের করতে হলে একটা ধাঁধার রহস্য সমাধান করতে হবে। আরেক রসিকতা। আমার মনের ওপর অত্যাচার, এটা তার প্রতিশোধ।

'চিঠিতে জানিয়েছে সে, ছয়টা কাকাতুয়া আর একটা ময়নাকে বুলি শিখিয়েছে, তাতেই রয়েছে ধাঁধার সমাধান। আমেরিকায় এসে স্যানটিনো নামের এক লোককে এক হাজার ডলার দিয়ে তার কাছ থেকে কিনে নিতে হবে পাখিগুলো। হলদে ঝুঁটি কাকাতুয়া বাছাই করেছে সে, কেন, তা-ও জানিয়েছে। ওই যে, মূল-ছবির ওপর ওই রঙের কাকাতুয়াই আঁকা ছিল, আর তাই নিয়ে আমার সঙ্গে ঝগড়া।'

'কিছু মনে করবেন না,' নরম গলায় বলল মুসা, ঠিকই করেছে সিলভার। 'আপনি তার সঙ্গে যে-রকম দুর্ব্যবহার করেছেন…'

'ঠিকই বলেছ,' খুব শান্তভাবেই স্বীকার করল হাইমাস। 'তবে এত কষ্ট হত না আমার। এটাকে দুর্ভাগ্য বলতে পারো, চিঠিটা যখন পৌঁছল, আমি তখন নেই। জরুরী একটা ব্যবসার কাজে জাপানে গেছি। ফিরতে দেরি হয়ে গেল। এসে চিঠি পেয়ে তো চমকে গেলাম, সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলাম আমেরিকায়। কিন্তু ততদিনে পাখিগুলো বিক্রি করে দিয়েছে স্যানটিনো।'

'ওই বেচারার সঙ্গেও কম দুর্ব্যবহার করেননি আপনি,' কায়দামত ঝাল ঝাড়ছে মুসা।

'হ্যাঁ, আগেই বলেছি, এ-জন্যে দায়ী আমার বদমেজাজ। তাছাড়া, কিভাবে জানি শুনে ফেলেছে শোঁপা, আমার পিছু নিয়েছে, সেটা আরেক দুশ্চিন্তা। মেজাজ ঠিক রাখতে পারিনি। ব্যাটা যে কিভাবে শুনল, কে জানে। হয়তো অফিসে লোকের সামনে খোলাখুলি কিছু বলে ফেলেছিলাম, ঘুষখোর কর্মচারীর তো অভাব নেই।'

'হ্যাঁ, শোঁপাকে নিয়ে ভয়ই,' মাথা দোলাল মিসেস হাইমাস। 'গন্ধ যখন পেয়েছে, সহজে ছাড়বে না।'

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম,' আবার শুরু করল হাইমাস, 'স্যানটিনোকে অনেক রকমে জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু কোথায় পাখিগুলো বিক্রি করেছে সঠিক বলতে পারল না। মোটামুটি ধারণা দিতে পারল শুধু। লোকের দ্বারে দ্বারে ফকিরের মত ঘুরলাম কয়েকদিন। চারটে পাখি জোগাড় করলাম, তোমরা বের করলে আরও দুটো।'

'চারটেই চুরি করেছেন?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'না, দুটো। আর দুটো ডবল দামে কিনেছি। মিস্টার ফোর্ড আর মিসেস বোরো বেচতে রাজি হলো না, তাই চুরি করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। ও হ্যাঁ, ফোর্ডের কাছেই লিটল বো-পীপ আর ব্ল্যাকবিয়ার্ডের কথা শুনেছি।

'এত বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম, যে কি বলব। কোনরকম ভাবনা চিন্তা না করে গিয়ে মিসেস বোরোর বাড়িতে ঢুকলাম। খালি বাড়ি, চুরি করলাম কাকাতুয়াটা। বেরিয়ে আসছি, এই সময় দুই কিশোরকে ঢুকতে দেখলাম। তুমি একজন,' মুসার দিকে আঙুল তুলল হাইমাস।

'হ্যাঁ, সঙ্গে কিশোর ছিল,' মুসা বলল। 'টালি ছুঁড়ে আরেকটু হলেই দিয়েছিলেন তো আমার মাথা ফাটিয়ে।'

'ভয় দেখাতে চেয়েছিলাম,' কপাল ডলল হাইমাস।

'ভয়? কিশোর আমাকে ধাক্কা দিয়ে না ফেললে তো গেছিলাম।'

'মেরেছিলাম যাতে তোমার আশেপাশে পড়ে, কিন্তু নিশানা ফসকে...'

হেসে ফেলল মুসা। 'নিশানা ফসকে লাগতে যাচ্ছিল। আমারও হয় ওরকম, এয়ারগান দিয়ে শিকারের সময়। একবার একটা ঘুঘুকে সই করে মারলাম, তিন হাত দূরের আরেকটা পড়ে গেল। হা হা...'

সে-কথা মনে করে রবিনও হেসে ফেলল।

পরিবেশ সহজ হলো অনেকটা। মিস্টার আর মিসেস হাইমাসও হাসল।

'এসব করেই জটিলতা আরও বাড়িয়েছেন আপনি,' বলল রবিন। 'খোঁচা মেরে জাগিয়ে দিয়েছেন কিশোর পাশাকে। ব্যাস, লেগে গেছে পেছনে। ও একবার যেটার পেছনে লাগে শেষ না দেখে ছাড়ে না।'

'মুসা, তোমার খুলি ভীষণ শক্ত,' এমনভাবে ভুঁড়িতে হাত ডলল হাইমাস, যেন ব্যথাটা এখনও রয়েছে।

'কেন হয়েছে, জানেন?' ব্যাখ্যা করল মুসা। 'পড়া না পারলে মা খালি গাঁট্টা মারত মাথায়। কত আর সওয়া যায়? একদিন টেলিভিশনে দেখলাম, জুডো-কারাতে শেখানোর আগে বালির বস্তায় ঘুসি মেরে, ইঁটে কোপ মেরে হাত শক্ত করে ছাত্ররা। চট করে বুদ্ধি এল মাথায়। সেদিন থেকেই লেগে গেলাম, হাত নয়, মাথা শক্ত করতে। দেয়ালে বাড়ি মেরে মেরে কপাল-মাথা ফুলিয়ে ফেলেছি কতদিন। তাআরপর একদিন,' হাসিতে বিকশিত হল ঝকঝকে সাদা দাঁত, 'পড়তে বসে ইচ্ছে করেই ভুল করতে লাগলাম। কষে এক গাঁট্টা মারল মা।...হি-হি...পুরো এক কৌটা বাতের মলম শেষ করেছে বাবা, মায়ের আঙুলে ডলে।'

হো-হো করে হেসে উঠল মিস্টার আর মিসেস। ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল যেন হাইমাসের ছোটখাট 'পাহাড়টা'।

'যাই হোক,' আবার কাজের কথায় এল হাইমাস, 'তোমরা পিছু লাগলে। শোঁপা তো আগে থেকেই আছে, লুকিয়ে পড়তে হলো আমাকে। রেঞ্জারটা লুকিয়ে ভ্যানটা ভাড়া নিতে হলো। আজ সকালে কাকাতুয়া খুঁজতে বেরিয়ে তোমাদের রোলস রয়েসটা নজরে পড়ল। কৌতূহল হলো। পিছু নিলাম।

'একটা বাড়ির কাছে গাড়ি রেখে নামলে তোমরা। লুকিয়ে তোমাদের ওপর চোখ রাখলাম। লম্বা একটা ছেলের সঙ্গে দেখা হলো তোমাদের।'

'শুঁটকি টেরি,' বলল মুসা। 'আমাদের শত্রু। পারে না তো কচুটাও করতে, খালি ঘাপলা বাধায়।'

'ওর হাতে একটা খাঁচা,' বলে গেল হাইমাস, 'তাতে একটা কাকাতুয়া। নীল স্পোর্টস কারে চড়ে চলে গেল পাখিটা নিয়ে। ভেবেছিলাম, পিছু নিই। পরে ভাবলাম, গাড়ির নম্বর তো জানাই রইল, খুঁজে বের করে ফেলব। তোমরা কি করো, দেখতে লাগলাম।' থামল এক মুহূর্তের জন্যে। 'তাছাড়া আরও একটা

কারণে তার পিছু নেয়ার দরকার মনে করিনি। কানা কাকাতুয়াটা কি বলেছে, শুনে ফেলেছি।'

'কি?' নোটবই বের করল রবিন।

হাইমাসও নোটবই বের করল। 'বলেছে, আই নেভার গিভ আ সাকার অ্যান ইভন ব্রেক।'

'গালি,' বিড়বিড় করল মুসা।

'গালি ঠিক নয়, একটা পুরানো স্ল্যাঙ। তবে সঙ্কেত হিসেবে খুবই কঠিন। কি বোঝাতে চেয়েছে সিলভার, সে-ই জানে।'

'সাতটা পাখির বুলি এক করে ভাবলে হয়তো কিছু বোঝা যাবে,' রবিন বলল।

'সেটাই তো হলো সমস্যা,' মুখ বাঁকাল হাইমাস। 'সাতটার মাঝে পাঁচটা পেয়ে গেছি, বাকি রয়েছে শুধু স্কারফেস আর ব্ল্যাকবিয়ার্ড। স্কারফেসের বুলিও জানি। কিন্তু, সেটা সহ জানা হয়েছে মাত্র তিনটে।'

'তিনটে কেন?' জিজ্ঞেস করল রবিন। 'ছ-টা তো হওয়ার কথা।'

'কথা, কিন্তু হয়েছে তিনটে,' বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল হাইমাস। 'কথা বলেছে শুধু বিলি আর বো-পীপ। বাকিগুলো একেবারে চুপ। টুঁ শব্দও করে না। কি বুলি জানে, কি জানি!'

দশ

মুখ ফিরিয়ে খাঁচাগুলোর দিকে তাকাল দুই গোয়েন্দা। চুপ করে বসে আছে পাখিগুলো, যেন প্রাণ নেই। নড়ছেও না। কথা বলার মুড যে নেই বোঝাই যাচ্ছে।

খাঁচার দিকে চেয়ে মেজাজ আবার খারাপ হয়ে গেল হাইমাসের। লাফিয়ে উঠে গটমট করে গিয়ে দাঁড়াল টেবিলের কাছে। গর্জে উঠল, 'বল, হারামজাদারা! জলদি বল সিলভার কি শিখিয়েছে? এই, শুনছিস? বলবি?'

ভয় পেয়ে আরও দূরে সরার চেষ্টা করল কাকাতুয়াগুলো, খাঁচার কোণে জড়সড় হয়ে রইল।

'এই রকমই করে,' জানাল মিসেস হাইমাস। 'প্রথম পাখিটা আনার পর থেকেই খালি ধমকাচ্ছে। কোনোটাকে বাদ দিচ্ছে না।'

'এ-কারণেই মুখ খুলছে না ওরা, হয়তো,' রবিন বলল। 'খুব নাজুক স্বভাব। জোরে কোন শব্দ করলে, কিংবা জায়গা বদলালে চুপ হয়ে যায়।'

ফিরে এসে ধপাস করে সোফায় গড়িয়ে পড়ল পাহাড়। 'আর ধৈর্য নেই!' গুঙিয়ে উঠল হাইমাস। 'এভাবে আর কত? ওদিকে পিছে লেগেছে শোঁপা। যখন-তখন এসে হাজির হতে পারে। সাংঘাতিক লোক।'

'তাহলে বসে আছো কেন, বাপু? টাকার লোভ ছেড়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও না, তাহলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়,' কথাগুলো বলতে ইচ্ছে করল মুসার। বলল, 'কয়েকটা বুলি···বা মেসেজও বলা যায়, জানি আমরা। কিন্তু মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারছি না আমি। তবে, আমরা আপনার কাছে যা যা জানলাম, কিশোরকে

জানালে হয়তো উপায় একটা করে ফেলতে পারবে।'

'এক কাজ করি না কেন? পরামর্শ দিল রবিন। 'যে কটা মেসেজ জানি, লিখে ফেলি কাগজে। তারপর দেখি, কোন মানে বের করা যায় কিনা।'

'ভাল কথা বলেছ,' তর্জনী নাচাল মিসেস হাইমাস। স্বামীকে বলল, 'তোমাকে সেদিনই বলেছি, ছেলেগুলো চালাক। ওদের সঙ্গে কথা বলো।'

'তা বলেছ। কিন্তু কতখানি দুশ্চিন্তায় রয়েছি...'

'রাখো তোমার দুশ্চিন্তা,' মুখ ঝামটা দিল মিসেস। 'এক কথা শুনতে শুনতে কান পচে গেল। রবিন, আমি একটা প্রস্তাব দিচ্ছি। ভেবে দেখো। ছবিটা যদি বের করে দিতে পারো, এক হাজার ডলার পুরস্কার দেব।'

'খাইছে!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'এই রবিন, দেরি করছ কেন? শুরু করে দাও।'

'দাঁড়াও,' হাত তুলল হাইমাস, 'আরেকটা কথা মনে পড়েছে। চিঠিতে সিলভার লিখেছিল, সাত ভাগে ভাগ করেছে সে মেসেজটা। সিরিয়ালি সাজিয়েছে। এভাবে ঃ লিটল বো-পীপ এক নম্বর, দুই—বিলি শেকসপীয়ার, তিন—ব্ল্যাকবিয়ার্ড, চার—রবিন হুড, পাঁচ—শারলক হোমস, ছয়—ক্যাপ্টেন কিড, এবং সাত—স্কারফেস।'

'ভাল পয়েন্ট মনে করেছেন,' বলল রবিন, খসখস করে লিখে চলেছে নোটবুকে। 'নইলে উল্টোপাল্টা লিখতাম, ধাঁধার সমাধান হয়তো হত না।'

লিখে এক টানে ফড়াত করে ছিঁড়ে কাগজটা হাইমাসকে দেখাল রবিন। লিখেছেঃ

ক্যাপ্টেন লঙ জন সিলভারের মেসেজ (অসম্পূর্ণ)

১। লিটল বো-পীপ ঃ	**লিটল বো-পীপ হ্যাজ লস্ট হার শীপ অ্যাণ্ড ডাজন্ট্ নো হোয়্যার টু ফাইণ্ড ইট। কল অন শারলক হোমস।**
২। বিলি শেকসপীয়ার ঃ	**টু বি অর নট টু বি, দ্যাট ইজ দা কোয়েশচেন।**
৩। ব্ল্যাকবিয়ার্ড ঃ	**আ'য়্যাম ব্ল্যাকবিয়ার্ড দা পাইরেট, অ্যাণ্ড আ'হ্যাভ বারিড মাই ট্রেজার হোয়্যার ডেড ম্যান গার্ড ইট এভার। ইয়ো-হো-হো অ্যাণ্ড অ্যা বটল অভ রাম।**
৪। রবিন হুড ঃ	**?**
৫। শারলক হোমস ঃ	**?**
৬। ক্যাপ্টেন কিড ঃ	**?**
৭। স্কারফেস ঃ	**আই নেভার গিভ আ সাকার অ্যান ইভন ব্রেক।**

'তাহলে,' রবিন বলল, 'সাতটার মাঝে চারটা মেসেজই জেনে গেলাম।'

ব্ল্যাকবিয়ার্ডকে যে পেয়েছে তিন গোয়েন্দা, সেকথা হাইমাস দম্পতিকে জানানোর ইচ্ছে নেই। 'ব্ল্যাকবিয়ার্ডের বুলি শুনেছি, স্যানটিনোর ভাতিজা ডিয়েগোর কাছে।'

হতাশায় চোখের দু-ধারে ভাঁজ পড়ল হাইমাসের। 'কিছু বোঝা যায় না…কিচ্ছু না।'

'হাইম,' স্বামীর চেয়ে স্ত্রীর মেজাজ অনেক ঠাণ্ডা, বুদ্ধিও রাখে, 'এত ভেঙে পড়ছ কেন? দেখিই না চেষ্টা করে। প্রথম কাকাতুয়াটার কথাই ধরি, বো-পীপ তার ভেড়া হারিয়েছে বলছে। ধরে নেয়া যায়, ছবিটার কথা বলছে। ওটাও তো একরকম হারানোই আছে এখন। কোথায় আছে জানে না, তারমানে আমরা জানি না।'

'বেশ, হলো,' বলল হাইমাস। 'কিন্তু শারলক হোমসকে ডাকার মানে কি?'

'বুঝতে পারছি না। এবার দু-নম্বরটার কথা ধরা যাক। বিলি শেকসপীয়ার বলে, টু বি অর নট টু বি…'

'ও ভাবে বলে না, তোতলায়,' ফাঁস করে দিল মুসা।

'তোতলায়! কাকাতুয়া?' আঁতকে উঠেছে হাইমাস। 'না, আর হলো না। এ-রহস্যের সমাধান আমার কাজ নয়।' গোঙাতে শুরু করল সে। 'লরা, পেটটা চিনচিন করছে আবার।'

'কতবার বলেছি, উত্তেজিত হয়ো না,' উদ্বিগ্ন হলো মিসেস।

'ডাক্তারও তো বারণ করেছে। একটা ছবির জন্যে মিছেমিছি…হ্যাঁ, যা বলছিলাম, দুই নম্বর মেসেজ কিছুই বুঝছি না। তিন নম্বরে বোধহয় বোঝাতে চাইছে, কোন এলাকায় লুকানো রয়েছে ছবিটা।'

'হোয়্যার ডেড ম্যান গার্ড ইট এভার,' এক হাতে পেট চেপে ধরে আরেক হাতে কপালের ঘাম মুছল হাইমাস। 'কোন জলদস্যুর দ্বীপ মনে হচ্ছে। জলদস্যু আর গুপ্তধনের গল্প দারুণ ভালবাসত জন সিলভার।'

'হ্যাঁ, জলদস্যুর দ্বীপের মতই শোনায়,' একমত হলো মিসেস হাইমাস। 'ভালমত ভাবতে হবে।'

'কিন্তু ওই সাত নম্বরটা কি?' ভুরু নাচাল হাইমাস। 'একটা আমেরিকান স্ল্যাঙ, শুনে মনে হয় এক ডাকাত আরেক ডাকাতকে তার ন্যায্য পাওনা কিংবা অধিকার দিতে চাইছে না। কিংবা কোন সমঝোতায় আসতে চাইছে না। এর একটাই মানে, আপনাদের পাওনা দেয়ার ইচ্ছে নেই সিলভারের, আমাদের সঙ্গে কোন চুক্তিতে আসতে রাজি নয়।'

'বাকি তিনটে মেসেজ পেলে হয়তো কিছু বোঝা যাবে,' বলল মিসেস। 'ওগুলো ছাড়া হবে না।'

'এক কাজ করলে হয়,' আঙুলে চুটকি বাজাল রবিন।

'কী?' এক সঙ্গে প্রশ্ন করল মিস্টার আর মিসেস।

'রবিন হুড, শারলক হোমস আর ক্যাপ্টেন কিড তো আছেই। ওদের দিয়ে কথা বলালে হয়। তারপর সঙ্কেতের মানে বের করে ফেলতে পারবে কিশোর।'

'কিন্তু কথা তো বলে না,' মুখ গোমড়া হয়ে গেল হাইমাসের। 'ওই দেখো না, কেমন চুপ করে আছে? টেঁ-টোঁও করছে না।'

'স্যানটিনো হয়তো বলাতে পারবে,' বলল মুসা। 'তিন হপ্তা কাকাতুয়া-গুলোকে পুষেছে, তাকে ওরা চেনে। আমার মনে হয় ও চেষ্টা করলে পারবেই।'

'ঠিক বলেছ,' লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল হাইমাস, দুলে উঠল জালার মত পেট, 'স্যানটিনো পারবে। চলো, এক্ষুণি।'

এগারো

ছুটে চলেছে ভ্যান।

সামনের সীটে হাইমাসের পাশে বসেছে রবিন আর মুসা।

পেছনে মিসেস হাইমাস। তার মাথার ওপরে ভ্যানের ছাতের রডে ঝুলছে পাঁচটা খাঁচা।

হাইমাস যেখানে নতুন বাসা নিয়েছে, তার থেকে অনেক দূরে স্যানটিনোর গ্রাম, উপকূলের ধারের সমভূমিতে। পৌঁছতে বিকেল হয়ে যাবে।

আঁকাবাঁকা নির্জন পাহাড়ী পথ ধরে ছুটছে গাড়ি।

হঠাৎ শোনা গেল মিসেসের উত্তেজিত কণ্ঠ, 'হাইম, একটা গাড়ি! পিছু নিয়েছে।'

'গাড়ি?' রিয়ার-ভিউ মিররে তাকাল হাইমাস। 'কই?'

'মোড়ের ওধারে...ওই যে বেরোচ্ছে...কোয়ার্টার মাইল দূরে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখেছি। সেডান পিছু নিয়েছে, কি করে বুঝলে?'

'তাই তো মনে হচ্ছে?'

'কি রঙ? ধূসর?' উত্তেজিত হয়ে বলল মুসা। 'কই, দেখি তো?'

তার পাশের মিররে দেখা যাচ্ছে না গাড়িটা, পেছন দিকে উঁকি-ঝুঁকি দিয়েও কিছু দেখল না। শেষে কেবিনের দরজা খুলে শক্ত করে তার হাত ধরতে বলল রবিনকে। দরজা দিয়ে বের করে দিল শরীরের অর্ধেকটা। 'কই...ও, হ্যাঁ, দেখেছি। সেদিন ওই গাড়িটাই দেখেছিলাম, ধাক্কা লাগিয়ে দিচ্ছিল।'

'শোঁপা!' গুঙিয়ে উঠল হাইমাস। 'কি করি এখন?'

'চালিয়ে যাও,' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে মিসেসের কণ্ঠ, 'সামনের শহরটায় ঢোকার আগে ধরতে দেবে না।'

'কিন্তু মাইল পাঁচেকের ভেতর তো কোন শহর নেই। খালি পাহাড় আর পাহাড়। অ্যাক্সিলারেটর টিপে ধরল সে, যতখানি গেল। প্রচণ্ড গোঁ গোঁ করে প্রতিবাদ জানাল পুরানো এঞ্জিন, ঝনঝন করে কাঁপছে ঝরঝরে বডি, বিপজ্জনক গতিতে ছুটল পাহাড়ী পথ ধরে।

টায়ারের কর্কশ আর্তনাদ তুলে বাঁক ঘুরল গাড়ি। এক ধারে হালকা লোহার বেড়া, জোরে ধাক্কা লাগলে ঠেকাতে পারবে না, উড়ে গিয়ে পাঁচশো ফুট নিচের খাদে পড়বে গাড়ি। জোরে মোড় নিতে গিয়ে বেড়ার সঙ্গে নাক ছুঁই-ছুঁই হয়ে গেল ভ্যানের, দম বন্ধ করে ফেলল দুই গোয়েন্দা। কিন্তু সময়মত সরিয়ে আনল হাইমাস।

'একেবারে পিছে এসে গেছে,' চেঁচিয়ে জানাল মিসেস। 'পাশ কাটাতে চাইছে।'

'আয়নায় দেখতে পাচ্ছি,' বিড় বিড় করল হাইমাস। 'কিন্তু সাইড দেব না।'

সাঁই করে রাস্তার মাঝখানে গাড়ি নিয়ে এল সে। পেছনে টায়ারের তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনা গেল, গাল দিয়ে উঠল যেন হর্ন।

ঝাঁকুনি খেতে খেতে ছুটে চলেছে পুরানো ভ্যান, বডির বিচিত্র শব্দে আরোহীদের কান ঝালাপালা। কিন্তু উপায় নেই। গতি কমানো যাবে না। পেছনে ছায়ার মত লেগে আছে বিশাল সেডান। খালি পাশ কাটানোর চেষ্টা।

খানিকদূর নেমে ধীরে ধীরে আবার উঠে গেছে পথ। হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে উদয় হলো বিশাল এক ট্রাক, পথের শেষ মাথায়। পুরো রাস্তা জুড়ে আসছে, ফাঁক খুবই সামান্য।

মস্ত এক দানব যেন ছুটে আসছে পাহাড় কাঁপিয়ে।

চিৎকার করে মাথা নুইয়ে ফেলল রবিন।

শেষ মুহূর্তে স্টিয়ারিং ঘোরাল হাইমাস, কোনমতে পাশ কাটিয়ে এল ট্রাকের।

পলকের জন্যে ট্রাক-ড্রাইভারের এক জোড়া বিস্মিত চোখ নজরে পড়ল মুসার।

সেডানটাও নিরাপদেই ট্রাকের পাশ কাটাল। খানিকটা পিছিয়ে পড়ল। কিন্তু গতি বাড়িয়ে পুষিয়ে নিল আবার ফারাকটা। রাস্তার মাঝখানে ভ্যান তুলে আনার কথা যেন ভুলে গেল হাইমাস, সুযোগটা কাজে লাগাল সেডান। চলে এল ভ্যানের পাশে।

সীটের ধার, দরজার কিনার, যে যেটা পারছে খামচে ধরে সীটে বসে থাকার চেষ্টা চালাচ্ছে দুই গোয়েন্দা। ঝাঁকুনির চোটে বার বার সরে যাচ্ছে, পড়ে যেতে চাইছে সীট থেকে। ওই অবস্থায় থেকেই নজর দিল সেডানের ভেতর। চারজন আরোহী, তিনজন বয়স্ক, আরেকজন তরুণ। ফেকাসে চেহারা। লম্বা নাক চেপে ধরেছে জানালার কাঁচে, বিকৃত হয়ে গেছে চেহারা। কিন্তু তা-সত্ত্বেও চিনতে পারল দুই গোয়েন্দা।

টেরিয়ার ডয়েল।

'শুঁটকি!' বোম ফাটল যেন মুসার কণ্ঠে। 'হারামী কোথাকার।...দাঁড়াও, আগে ধরি, তারপর...' আস্তিন গোটানোর জন্যে হাত সরিয়ে আনতেই খামচে ধরল জানালার কিনার।

ঢালু হয়ে গেছে আবার পথ। ভ্যানের এক পাশে একশো ফুট গভীর খাদ, আরেক পাশে সেডান। সরে আসছে পাশে, ইঞ্চি ইঞ্চি করে ভ্যানটাকে সরিয়ে দিচ্ছে খাদের দিকে। ধাক্কাধাক্কি করে সেডানের শক্তিশালী এঞ্জিনের সঙ্গে পারা যাবে না, বুঝে গেছে হাইমাস। ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় বলল, 'না, হবে না। না থামলে খাদে ফেলে দেবে।'

ব্রেক কষল সে। থেমে গেল ভ্যান, ডান পাশের চাকা দুটো খাদের কিনার থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে। বাঁ পাশে ভ্যানের একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়াল সেডান। দরজা খোলার উপায় নেই। ডান পাশের দরজা খোলা যায়, কিন্তু লাভ

কি? একশো ফুট নিচে তো লাফিয়ে নামতে পারবে না।

ওদের দিকে চেয়ে মসৃণ হাসি হাসল ফরাসী লোকটা, দাঁতে চেপে রেখেছে সাগর কলার মত মোটা এক সিগার। ওটা সরিয়ে শান্ত কণ্ঠে বলল, 'এই যে, হাইমাস, দেখা হয়েই গেল। যতখানি ভেবেছিলাম তত বড় নয় আমেরিকা।'

'কি চাই এনথনি?' ভোঁস ভোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছে হাইমাস, ঘামছে দরদর করে। 'মেরেই ফেলেছিলে।'

'কি যে বলো। মারব কেন? খুব বাজে ড্রাইভ করো তুমি, মাতালে ওরকম করে। এক কাজ করো, খাঁচাগুলো আমার গাড়িতে তুলে দাও। টমাস, যাও তো, ভ্যানের পেছনের দরজাটা খুলে দেবে ওরা। খাঁচাগুলো নিয়ে এসো,' সহজ ভঙ্গিতে কথা বলছে সে। যেন কোন ব্যাপারই না এসব।

'যাচ্ছি, স্যার,' মনিবের মত শান্ত নয় বেঁটে ড্রাইভার, গাড়ি চালাতে হয়েছে তো, তাই বোধহয় সামান্য হাঁপিয়ে পড়েছে।

'লরা, দরজা খুলে দাও,' হাইমাস বলল, 'আর কিছু করার নেই। বাধা দিলে খাদে ফেলে দেবে।'

অনিচ্ছাভরে উঠল মিসেস হাইমাস, পেছনের দরজার হুক সরিয়ে ওপরের দিকে তুলে দিল দরজা।

দুই গোয়েন্দা দেখছে টেরিকে। খুব মজা পাচ্ছে সে। হাসছে দাঁত বের করে। জোরে ঠোঁট কামড়ে ধরল মুসা। পারছে না নামতে, নইলে হাসি বের করে দিত। টেরির দাঁত ফেলে দেয়ার জন্যে হাত নিশপিশ করছে তার।

ব্যাপারটা বুঝতে পারছে টেরি। মুসাকে আরও রাগিয়ে দেয়ার জন্যে ভেঙচি কাটল। 'হাহ্, গোয়েন্দা। চোরের সঙ্গে গিয়ে হাত মিলিয়েছে।'

অনেক কষ্টে চুপ রইল মুসা আর রবিন।

খাঁচাগুলো নামাচ্ছে টমাস, শব্দ শোনা যাচ্ছে।

'বস,' টমাসের গলা শোনা গেল, 'জায়গা হচ্ছে না সবগুলো। ছেলেটাকে নামিয়ে দিলে হবে।'

'এই ছেলে,' শোঁপা বলল। 'নামো তো।'

'নামব?' হাসি হাসি ভাবটা চলে গেল টেরির। 'নামব কেন? আমিই তো দেখালাম।'

'দেখানো শেষ হয়েছে। এবার নামো।'

তর্ক শুরু করল টেরি।

'টমাস,' বলল শোঁপা, 'ছুঁড়ে ফেলে দাও তো বেয়াদবটাকে।'

কুৎসিত হাসি হেসে এগিয়ে এল টমাস। টেরির ঘাড় ধরে বেড়াল-ছানার মত টেনে বের করে ফেলে দিল রাস্তায়।

উঠে বসল টেরি। বোকা হয়ে গেছে, বিশ্বাস করতে পারছে না এই ব্যবহার করা হবে তার সঙ্গে। 'কিন্তু আমাকে পাঁচশো ডলার পুরস্কার দেবেন বলেছিলেন।'

'বিল পাঠিয়ে দিয়ো তোমার বাবার কাছে। অনেক বড়লোক, আমাদের হয়ে দিয়ে দেবে,' ময়লা দাঁত বের করে হেসে চোখ টিপল টমাস। সব কটা খাঁচা

গাড়িতে তুলল। 'বস্, একটা কম। কালো পাখিটা নেই।'
'নেই?' জানালা দিয়ে মুখ বের করল শোঁপা। 'হাইমাস? ব্ল্যাকবিয়ার্ড কোথায়? সাতটা পাখিই তো লাগবে।'
'ও, আমার ঘরে ঢুকেছিলে তুমিই?' কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক হচ্ছে না হাইমাসের। 'জেনেছ সবাই। চোর কোথাকার।'
'ব্ল্যাকবিয়ার্ড কোথায়?' হাসি সামান্যতম মলিন হলো না শোঁপার। 'সাতটাই লাগবে।'
'উড়ে গেছে।'
'যাহ্ মিছে কথা বলছ।' মুসা আর রবিনের দিকে তাকাল শোঁপা, শীতল চাহনি। 'তোমাদের কাছে আছে, না? খুব চালাক তোমরা।'
'নেই,' চোখ সরিয়ে নিল রবিন। 'কোথায় আছে জানি না।'
হাইমাসের পকেটের দিকে চোখ পড়ল শোঁপার। তাড়াহুড়ো করে রবিনের লেখা কাগজটা গুঁজে রেখেছিল হাইমাস, অনেকখানি বেরিয়ে আছে। শোঁপার দৃষ্টি অনুসরণ করে পকেটের দিকে চেয়েই সামান্য চমকে গেল সে। ঠিকই খেয়াল করল ধুরন্ধর চিত্র-চোর। হাত বাড়াল, 'দেখি কাগজটা? নইলে ধাক্কা দিয়ে গাড়ি খাদে ফেলে দেব।'
মুসার হাতে কাগজটা দিল হাইমাস, মুসা দিল শোঁপাকে।
'হুঁ,' হাসিমুখে মাথা দোলাল শোঁপা, 'সাতটার মধ্যে তিনটে। বাকিগুলো কথা বলেনি, না? বলবে, বলবে। ব্ল্যাকবিয়ার্ডকে দরকার। দেখি পারলে খুঁজে নেব। চলি হাইমাস, লণ্ডনে দেখা হবে।'
চলে গেল সেডানটা।
ছাই হয়ে গেছে হাইমাসের চেহারা। স্টিয়ারিং খামচে ধরে গুঙিয়ে উঠল সে, পরক্ষণেই দু-হাতে চেপে ধরল পেট। 'উফ্ফ্...'
'কি হলো, হাইম?' ভুরু কোঁচকালো মিসেস। 'খারাপ লাগছে?'
'ব্যথা।...বেড়েছে...'
হ্যাঁচকা টানে দরজা খুলে নেমে এল মিসেস হাইমাস। মুসা আর রবিনকে নামতে বলল। হাইমাসকেও নামাল ধরে ধরে। নিজে উঠে বসল ড্রাইভিং সীটে। তার পাশে উঠল আবার হাইমাস। মুসা আর রবিন উঠল পেছনে।
তাদের দিকে ফিরে বলল মিসেস, 'বেশি উত্তেজনা। অ্যাসিডিটি বেড়ে যায় ওর, আলসার আছে।' গাড়ি স্টার্ট দিল, 'এখন সোজা হাসপাতাল। পড়ে থাকবে কয়েকদিন।' স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে খাদের ধার থেকে গাড়ি সরিয়ে আনতে আনতে বলল, 'কাউকে কিছু বোলো না। পুলিশকে বলে কিছু হবে না। এদেশে শোঁপার বিরুদ্ধে অভিযোগ নেই পুলিশের।...তবে, তোমাদের হাজার ডলার ঠিকই পাবে, যদি ছবিটা আমাকে দিতে পারো।'
ব্রেক কষল মিসেস। সামনে দু-হাত তুলে দাঁড়িয়েছে টেরিয়ার। 'শুনুন। আমাকে ফেলে যাবেন না, প্লীজ।'
কঠিন চোখে তাকাল মিসেস হাইমাস। কুঁকড়ে গেল টেরিয়ার।

'যাও, ওঠো,' কড়া গলায় বলল মিসেস।

গাড়িতে উঠল টেরিয়ার।

'বলো, কি হয়েছিল,' গাড়ি চালাতে চালাতে বলল মিসেস হাইমাস। 'শোঁপা খুজে পেল কি করে আমাদের? তুমি কিছু করেছ।'

'এই শুঁটকি, সরো, গন্ধ লাগে,' ঝাল মেটানোর সুযোগ পেয়ে গেছে মুসা।

'থাক, মুসা,' বাধা দিল মিসেস। 'এই, তুমি বলো। চুপ করে আছো কেন?'

'রকি বীচের মেইন রোডে হাঁটছিলাম,' মিনমিন করে বলল টেরিয়ার। 'হঠাৎ পাশে এসে থামল শোঁপার গাড়ি। জিজ্ঞেস করল, রোলস-রয়েস চড়ে এমন তিনটে ছেলেকে চিনি কিনা। বললাম, চিনি,' আড়চোখে রবিন আর মুসার দিকে তাকাল, অস্বস্তি চাপা দিতে পারছে না। 'শোঁপা বলল, হলুদ ঝুঁটিওয়ালা কয়েকটা কাকাতুয়া খুঁজে বের করে দিতে পারব কিনা, ওগুলো নাকি তার, চুরি হয়েছে। প্রতিটি পাখির জন্যে দেড়শো ডলার করে দেবে। বললাম, পারব। আমাকে একটা ফোন নম্বর দিয়ে সে চলে গেল।

'সে-রাতে এমনি ঘুরতে গিয়েছিলাম হলিউডে, কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করলাম। ওরা সবাই জানে কাকাতুয়ার কথা, খোঁজাখুঁজি করছে। আমিও যোগ দিলাম। একটা কাকাতুয়া কোথায় আছে, জেনে ফেললাম। গো···ইয়ে··· গোয়েন্দাদের আগেই গিয়ে হাজির হলাম। নিয়ে গেলাম। ফোন করলাম শোঁপাকে।

'খুব খুশি হলো ও। তখন বলল, কিশোর গোয়েন্দারা নাকি কয়েকটা চোরকে সাহায্য করছে। ওদের পিছু নিতে বলল।

'রোলস রয়েসের পিছু নিলাম। একটা পুরানো বাড়ির সামনে থামল গাড়িটা। কিছুক্ষণ পর দেখলাম, গোয়েন্দাদের না নিয়েই গাড়িটা চলে যাচ্ছে। একটু পর দুই গোয়েন্দা বেরোল আরেকটা কাকাতুয়া নিয়ে। তারপর আপনাদের ভ্যান এল, ওদের তুলে নিতে দেখলাম।

'ভ্যানকে অনুসরণ করে দেখে এলাম কোথায় থামে। পাহাড়ের চিপা থেকে বেরিয়ে একটা ফোনবুদে গিয়ে আবার ফোন করলাম শোঁপাকে। ছুটে এল সে।

'তারপর আর কি?' তিক্ত কণ্ঠে বলল টেরিয়ার। 'বেঈমানী করল সে, পাঁচশো ডলার দিল না···'

'ঘাড়েও হাত দিল···আহারে!' জিভ টাকরায় ঠেকিয়ে চুকচুক শব্দ করল মুসা।

'থাক, মুসা,' টেরিয়ারের করুণ দশায় দুঃখ হচ্ছে রবিনের। 'আর কিছু বোলো না।'

একটা মোড়ে এসে গাড়ি রাখল মিসেস হাইমাস। টেরিয়ারকে বলল, 'আমরা এখন হাসপাতালে যাব। হেঁটে চলে যাও বাস স্টপেজে।'

টেরিয়ার নেমে গেলে দুই গোয়েন্দাকে বলল মিসেস হাইমাস। 'হ্যাঁ, তোমরা কিন্তু খোঁজা বন্ধ কোরো না, হাজার ডলার পাবে।'

বারো

হেডকোয়ার্টারে আলোচনায় বসেছে তিন গোয়েন্দা।

সারাদিন ইয়ার্ডে ব্যস্ত থেকেছে কিশোর, একা একা অনেক কাজ করেছে। রবিন আর মুসাকে আরেকটা বাস স্টপেজে নামিয়ে দিয়েছিল মিসেস হাইমাস। ওখান থেকে রকি বীচে ফিরে যার যার বাড়ি গিয়ে খেয়ে তারপর ইয়ার্ডে এসেছে।

তিনজনেই শ্রান্ত।

'ওই রোলস-রয়েসই যত নষ্টের মূল,' কথা শুরু করল কিশোর। 'ওটাই ফাঁস করে দিল দু-বার, চোরেরা আমাদের পিছু নিতে পারল। শিক্ষা হলো একটা। চট করে লোকের চোখে পড়ে এমন কোন কিছু ব্যবহার করা উচিত নয় গোয়েন্দাদের।'

'শুধু একথা বলার জন্যেই বসেছ?' হাত ওল্টাল মুসা। 'সারাদিন কত কাণ্ড হলো। হাতে পেয়েও হারালাম কাকাতুয়াগুলো। কষ্ট করলাম আমরা, আর শুঁটকির বদৌলতে ওগুলো সব পেল শোঁপা।'

'কাকাতুয়াগুলোরও অনেক হয়রানি হচ্ছে,' কিশোর বলল। 'আমার মনে হয় না, এত সহজে শোঁপার কাছে মুখ খুলবে।'

'কিন্তু ও খোলাবেই,' রবিন বলল। 'ও যে-রকম মানুষ দেখলাম, কাকাতুয়াও ওর কাছে মুখ না খুলে পারবে না।'

'পারলেও সময় লাগবে। তাতে কিছুটা সময় পাব আমরা।'

'কি হবে তাতে? মুসা জিজ্ঞেস করল। 'চারটে মেসেজ জানি আমরা, লাগবে সাতটা। বাকি তিনটে শোঁপার কাছ থেকে ছিনিয়ে আনবে নাকি?'

'না, তা আনতে পারব না,' স্বীকার করল কিশোর। 'মিস্টার ফোর্ডের কাকাতুয়া এনে দিতে পারব না, মিসেস বোরোরটাও দিতে পারব না। ছবিটা খুঁজতে সাহায্য করতে পারব না মিসেস হাইমাসকে...'

'এমনকি শুঁটকির লম্বা নাকটা ঘুসি মেরে ভোঁতাও করে দিতে পারব না,' মুসার সব রাগ গিয়ে পড়েছে টেরিয়ারের ওপর, তার জন্যেই হাত থেকে ফসকে গেল পাখিগুলো। 'ব্যাটা পালিয়েছে, আসার সময় শুনলাম। কোন আত্মীয়ের বাড়ি নাকি বেড়াতে গেছে। মরুকগে, হারামজাদা।'

কয়েক মিনিট নীরবতা। চুপচুপ নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। অবশেষে মাথা ঝাঁকাল, 'হ্যাঁ, ভরসা কম।'

আবার নীরবতা। ব্ল্যাকবিয়ার্ড দানা ঠুকরে খাচ্ছে, শুধু তার মৃদু খুটখুট আওয়াজ।

'ক্যাপ্টেন কিড, শারলক হোমস আর রবিন হুডকে কথা বলাতে পারলে কিছু হয়তো করা যেত,' বিড়বিড় করল রবিন।

'রবিন হুড,' খপ করে কথাটা ধরল ব্ল্যাকবিয়ার্ড। মাথা কাত করে তাকাল তিন গোয়েন্দার দিকে। ডানা ঝাপটাল। 'আ'য়্যাম রবিন হুড,' স্পষ্ট উচ্চারণ। 'আই শট অ্যান অ্যারো অ্যাজ এ টেস্ট, আ হানড্রেড পেসেস শট ইট ওয়েস্ট।'

ঝট করে মুখ তুলে তাকাল তিনজনেই।

'শুনলে কি বলল?' মুসার প্রশ্ন।

'তোমার কি মনে হয়…' কিশোরের দিকে চেয়ে থেমে গেল রবিন, ঢোক গিলল।

'চুপ,' ফিসফিস করে বলল কিশোর। 'ওকে বাধা দিয়ো না। দেখি, আবার বলে নাকি?' ময়নার দিকে চেয়ে জোরে বলল, 'হালো, রবিন হুড।'

'আ'য়্যাম রবিন হুড,' আবার বলল ব্ল্যাকবিয়ার্ড। 'আই শট অ্যান অ্যারো অ্যাজ এ টেস্ট আ হানড্রেড পেসেস শট ইট ওয়েস্ট,' বলেই ডানা ঝাপটাল আবার।

হাঁ হয়ে গেছে মুসা।

কিশোরও অবাক। আস্তে বলল, 'মনে আছে, ডিয়েগো বলেছিল, ময়নাটা জন সিলভারের কাঁধে বসে থাকত? কাকাতুয়াগুলোকে যখন বুলি শেখাত তখনও।'

'হ্যাঁ,' উত্তেজনায় কথা আটকে যাচ্ছে রবিনের। 'আরেকটা ব্যাপার সেদিন খেয়াল করিনি, ময়নাটা কিন্তু স্কারফেসের বুলি বলেছিল, আই নেভার গিভ আ সাকার অ্যান ইভন ব্রেক…সত্যি, ময়নারা কাকাতুয়ার চেয়ে অনেক ভাল কথা শেখে…কিশোর, অন্য দুটো…'

'দেখি চেষ্টা করে,' বেছে ভাল একটা সূর্যমুখীর বীচি নিয়ে ব্ল্যাকবিয়ার্ডের ঠোঁটের কাছে বাড়িয়ে ধরল কিশোর। ডাকল, 'হালো, শারলক হোমস। হালো, শারলক হোমস।'

আগের বারের মতই সাড়া দিল ময়না। ডানা ঝাপটে বলল, 'ইউ নো মাই মেথডস, ওয়াটসন। থ্রি সেভেনস লীড টু থারটিন,' কথায় কড়া ব্রিটিশ টান।

'লিখে নাও, রবিন,' নিচু গলায় বলল কিশোর। দরকার ছিল না, সে বলার আগেই লিখতে শুরু করেছে নথি-গবেষক।

'ক্যাপ্টেন কিড,' ময়নার ঠোঁটের ফাঁকে আরেকটা বীচি ধরিয়ে দিল কিশোর। 'হালো, ক্যাপ্টেন কিড।'

'আ'য়্যাম ক্যাপ্টেন কিড,' জবাব দিল ময়না। 'লুক আনডার দা স্টোনস বিয়ণ্ড দা বোনস ফর দা বক্স দ্যাট হ্যাজ নো লকস।'

'খাইছে!' কণ্ঠস্বর কিছুতেই দাবিয়ে রাখতে পারল না মুসা। 'এ-তো দেখি জ্যান্ত টেপ রেকর্ডার। সব মুখস্থ করে রেখেছে…'

'আগেই আন্দাজ করা উচিত ছিল আমার,' গম্ভীর হয়ে বলল কিশোর। 'ওই যখন, স্কারফেসের বুলি বলল…'

বলার নেশায় পেয়েছে যেন ব্ল্যাকবিয়ার্ডকে, স্কারফেসের নাম শুনেই চেঁচিয়ে উঠল, 'আই নেভার গিভ আ সাকার অ্যান ইভন ব্রেক! অ্যাণ্ড দ্যাটস আ লেড পাইপ সিনশ্। হাহ্-হাহ্-হা!' টেনে টেনে হাসল সে, যেন এক মহা-রসিকতা করে ফেলেছে।

কাগজের ওপর পেন্সিলের তুফান চালাচ্ছে রবিন। লেখা শেষ করে পাতাটা বাড়িয়ে দিল কিশোরের দিকে। 'নাও, সাতটাই হয়ে গেল।'

'তা হলো,' মাথা কাত করল মুসা। 'কিন্তু আরেকটা কাজ বাকি রয়ে গেল। খুব ছোট্ট সহজ একখানা কাজ।'

'কি?' রবিন বলল।

'মেসেজগুলোর মানে বের করা। খুবই সহজ, না?'

তেরো

লাইব্রেরির কাজে কিছুতেই মন বসাতে পারছে না রবিন। শেষে বই গোছানো বাদ দিয়ে 'কোডস অ্যাণ্ড সাইফারস' নাম লেখা একটা বই তাক থেকে নিয়ে টেবিলে মেলে বসল। মাথায় ঘুরছে সাতটা মেসেজ। কিন্তু বইয়ের সাহায্য নিয়ে অনেক চেষ্টা করেও কিছু বুঝল না। বিরক্ত হয়ে রেখে দিল শেষে। আশা করল, এতক্ষণে হয়তো মানে বের করে ফেলেছে কিশোর।

ছুটির পর বাড়ি ফিরে কোনমতে নাকেমুখে কিছু গুঁজে দিয়ে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ল আবার।

নিরাশ হলো হেডকোয়ার্টারে ফিরে। শূন্য চোখে তার দিকে তাকাল মুসা।

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। রবিনের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির জবাবে বলল, 'কয়েকটা ব্যাপার মোটামুটি আন্দাজ করা যাচ্ছে, বাকি কিছুই বুঝছি না। এক নম্বর ধরো, বো-পীপ তার ভেড়া হারিয়েছে, তারমানে ছবিটা হারানোর কথা বলছে, মিসেস হাইমাসেরও তাই ধারণা।'

সায় জানিয়ে মাথা ঝাঁকাল অন্য দুজন।

'কিন্তু কল অন শারলক হোমসের মানে কি?' প্রশ্ন করল রবিন।

'ডেকে আনা গেলে তো ভালই হত,' মুসা বলল। 'ভদ্রলোকের সাহায্য এখন খুব দরকার আমাদের।'

'বুঝতে পারছি না,' মুসার রসিকতায় কান দিল না কিশোর। 'পাঁচ নম্বরে আবার শারলক হোমসের কথা বলা হয়েছে ঃ ইউ নো মাই মেথডস, থ্রি সেভেনস লীড টু থারটিন...'

মাথা কাত করল ব্ল্যাকবিয়ার্ড, বলে উঠল, 'থ্রি সেভার্ন্স্ লীড টু থারটিন।'

'সেভারন্স্?' মুসা ধরল শব্দটা।

'সেভেনসকেই ওরকম উচ্চারণ করে অনেক ইংরেজ,' বলল রবিন। 'তারপর, বলো, কিশোর?'

'দুই নম্বরে বিলি শেকসপীয়ার যা বলছে,' বলল কিশোর, 'কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'তিন নম্বরে,' রবিন বলল, 'মনে হয় কোন জলদস্যুর দ্বীপের কথা বোঝানো হয়েছে।'

একটা ম্যাপ খুলল কিশোর। 'এই যে, এটা লোয়ার ক্যালিফোর্নিয়া। ডিয়েগো বলেছে, তিনদিনের জন্যে চলে গিয়েছিল জন সিলভার। হেঁটে গিয়েছিল, না কাউকে ধরে গাড়িতে করে গিয়েছিল, জানি না। ওই তিন দিনেই বাক্সটা লুকিয়ে রেখে ফিরে

এসেছিল। ধরি, হেঁটেই গিয়েছিল, অন্তত যাওয়ার সময়। গাড়িতে উঠলে তার চেহারা, পোশাক আর হাতের বাক্স দেখে লোকের কৌতূহল হতে পারে, সেটা এড়ানোর জন্যে। কতদূর যেতে পারে? ক্যাটালিনা আইল্যাণ্ড? মেকসিকো? বড় জোর ডেথ ভ্যালি?'

'ডেথ ভ্যালি,' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'মানুষের হাড়ের অভাব নেই ওখানে। ওটাই। কিন্তু একটা ছবির জন্যে যাব ওখানে? দু-দিনেই ওখানে আরও তিনটে কঙ্কাল বাড়বে।'

'সম্ভাবনার কথা বলছি,' বলল কিশোর। 'ওখানেই আছে, বলিনি।'

'চার নম্বরে বলছে,' রবিন বলল, 'একশো কদম পশ্চিমে। কোনও একটা নির্দিষ্ট জায়গা থেকে কোনদিকে কতখানি যেতে হবে।'

'তা-তো বুঝলাম,' সঙ্গে সঙ্গে বলল মুসা। 'কিন্তু কোন জায়গা থেকে? হলিউড, নাকি ভাইন? নাকি পুরো উত্তর আমেরিকা?'

'পাঁচ নম্বর বুঝতে পারছি না,' এবারেও মুসার কথায় কান দিল না কিশোর। 'ছয় নম্বরে আবার দিক নির্দেশনা, এবং ঠিক কোন্ জায়গায় খুঁজতে হবে, বলছে।'

'কিন্তু আবার সেই পাথর আর হাড়ের কথা,' গজগজ করল মুসা।

'ঘুরেফিরে সেই জলদস্যুর দ্বীপ,' রবিন যোগ করল।

'ক্যাটালিনা আইল্যাণ্ডে কখনও জলদস্যু ছিল বলে তো শুনিনি? আর, ওদিকে ওই একটা দ্বীপই আছে।'

'স্বর্ণ-সন্ধানের যুগে দলে দলে চোর-ডাকাত ওদিকে ছুটেছিল,' মনে করিয়ে দিল কিশোর। 'ওদের কথাও বলে থাকতে পারে।'

'হ্যাঁ, তা পারে,' মাথা দোলাল রবিন। 'এবার শেষ মেসেজটা, কি বলতে চায়? আমার মনে হয় কি জানো, এটাতেই রয়েছে জন সিলভারের প্রতিশোধ। হয়তো বলছে, সবগুলো মেসেজের মানে বের করার পরও ছবিটা তুমি খুঁজে পাবে না।'

'তাহলে আর কষ্ট করে লাভ কি?' হাত ঝাড়ল মুসা।

রহস্য ভালবাসে কিশোর। জটিল রহস্যের সমাধান করে আনন্দ পায়। কিন্তু গোলকধাঁধায় পথ হারাতে রাজি নয়। এই কেস যেন অনেকটা তাই, গোলকধাঁধায় ফেলে দিয়েছে তাকে, কিছুতেই কিছু করতে পারছে না। 'শোঁপারও অবস্থা হয়তো আমাদেরই মত,' বলল সে। 'মাথা ঘুরছে। আমাদের তো তবু ব্ল্যাকবিয়ার্ড আছে, মেসেজ সব পেয়েছি, তার তো তা-ও নেই। তবে, চিত্র-চোর তো, কোড-ফোড নিশ্চয় আরও অনেক ভেদ করতে হয়েছে, অভ্যস্ত। হয়তো বুঝে ফেলবে। তার আগেই কিছু একটা করা দরকার আমাদের।'

কিছুক্ষণ নীরবতা।

তারপর উঠে দাঁড়াল গোয়েন্দাপ্রধান, 'যাও, বাড়ি চলে যাও, বসে থেকে লাভ নেই। কিছু বুঝলে ফোন করে জানাব। তোমরাও বুঝলে জানিয়ো।'

এত তাড়াতাড়ি ছেলেকে বাড়ি ফিরতে দেখে রবিন আর মুসা দু-জনেরই বাবা-মা অবাক হলেন।

পরদিন, সারাদিন ইয়ার্ডে কাজ করল কিশোর। খরিদ্দারদের জিনিসের দাম হিসেব করতে ভুল করল তিনবার।

গ্যারেজে নিজেদের গাড়ি পরিষ্কার করতে গিয়ে আরও ময়লা লাগাল মুসা।

লাইব্রেরিতে এক তাকের বই আরেক তাকে রাখল রবিন, এক বই এনে দিতে বললে ভুলে এনে দিল অন্য বই। অন্যমনস্ক। ব্যাপারটা বুঝলেন লাইব্রেরিয়ান, ছুটি দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন রবিনকে।

বাড়ি এসে সোজা বিছানায় গড়িয়ে পড়ল রবিন। চিত হয়ে বালিশে মাথা রেখে খোলা জানালা দিয়ে চেয়ে রইল সান্তা মনিকা পর্বত-চূড়ার ওপরে ভেসে যাওয়া মেঘের দিকে। সাতটা প্রশ্ন অস্থির করে তুলছে তাকে।

বাড়ি ফিরে ছেলের ভাবসাব দেখে অবাক হলেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'কি রে, রবিন, কি হয়েছে? শরীর খারাপ?'

'বাবা, একটা জিনিস বুঝতে পারছি না, একটা ধাঁধা,' উঠে বসল রবিন। 'ধরো, কেউ তোমাকে বলল, আ'হ্যাভ বারিড মাই ট্রেজার, হোয়্যার ডেড ম্যান গার্ড ইট এভার। কি বুঝবে?'

'ট্রেজার আইল্যাণ্ড,' দাঁতের ফাঁক থেকে পাইপ সরিয়ে বললেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'রবার্ট লুই স্টিভেনসনের সেই বিখ্যাত বই, জলদস্যুদের কাহিনী।'

'কিন্তু ধরো, যেখানকার কথা বলা হচ্ছে, তার ধারে-কাছে কোথাও কোন দ্বীপ নেই। তাহলে গুপ্তধন আর কোথায় লুকানো থাকতে পারে?'

জোরে জোরে বার দুই পাইপ টানলেন বাবা, ধোঁয়া ছাড়লেন নাক দিয়ে, তারপর বললেন, 'তাহলে আর একটা জায়গার সঙ্গেই ওই বর্ণনা মেলে।'

'কোন জায়গা?' লাফিয়ে বিছানা থেকে নামল রবিন।

'গোরস্থান,' মিটিমিটি হাসছেন তিনি।

এত জোরে টেলিফোনের দিকে ছুটে গেল রবিন, আরেকটু হলে ধাক্কা দিয়ে বাবার হাত থেকে পাইপ ফেলে দিয়েছিল।

ছেলের কাণ্ড দেখে হেসে মাথা নাড়লেন মিস্টার মিলফোর্ড, হাত-মুখ ধোয়ার জন্যে বাথরুমে গিয়ে ঢুকলেন।

'কিশোর,' ওপাশ থেকে কথা শোনা যেতেই বলল রবিন, 'গোরস্থান! দ্বীপ বাদ দিলে আর একমাত্র ওখানেই মরা মানুষেরা গুপ্তধন পাহারা দিতে পারে।'

দীর্ঘ এক মুহূর্ত নীরবতার পর শোনা গেল আবার কিশোর পাশার কণ্ঠ, 'রবিন, ফোনের কাছাকাছি থেকো। কোথাও বেরিয়ো না।'

খাবার টেবিলে খাবারের দিকে মন দিতে পারল না রবিন, বার বার তাকাচ্ছে ফোনের দিকে। আধপ্লেট বাকি থাকতেই বাজল ফোন। দ্বিতীয় বার রিঙ হওয়ার আগেই রিসিভার তুলে নিল সে। 'বলো?'

'রবিন,' কিশোরের উত্তেজিত গলা, 'লাল কুকুর চার! জলদি!'

রিসিভার রেখে মা-বাবার দিকে তাকাল রবিন। 'আমার ফিরতে দেরি হবে…রাত দশটা…'

কেউ মুখ খোলার আগেই ছুটে বেরিয়ে গেল সে।

'ব্যাপার কি?' জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'এত উত্তেজিত?'

'একটা হারানো কাকাতুয়া খুঁজছে,' জানালেন মিসেস মিলফোর্ড, 'সেদিন বলেছিল আমাকে।'

'হারানো কাকাতুয়া? হাহ্-হা,' কফির কাপে চুমুক দিলেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'কিন্তু গোরস্থানে কি করতে যাবে...'

চমকে উঠলেন মা। তাড়াতাড়ি দরজার দিকে ছুটলেন। কিন্তু রবিনকে দেখা গেল না। চলে গেছে।

চোদ্দ

প্রায় একই সময়ে লাল কুকুর চার-এর কাছে পৌঁছল রবিন আর মুসা। কোন কথা বলল না। গেট খুলে সাইকেল ভেতরে ঢুকিয়ে রেখে, জঞ্জালের তলা দিয়ে ক্রল করে এসে ঢুকল হেডকোয়ার্টারে।

ডেস্কের ওধারে মহাব্যস্ত কিশোর। এক গাদা বই, ম্যাপ, কাগজ ছড়িয়ে রয়েছে ডেস্কে। তার চেহারাই বলছে, সুসংবাদ আছে।

'তাড়াতাড়ি করতে হবে আমাদের,' বলল কিশোর। 'সে জন্যেই ডেকেছি।'

'মানে বুঝেছ?' রবিন জিজ্ঞেস করল।

'পুরোপুরি নয়। তবে কাজ শুরু করা যেতে পারে। তোমার গোরস্থান থেকেই সূত্রটা পেয়েছি।'

'আমার আইডিয়া নয়, বাবার,' বলল রবিন, কিন্তু তার কথা কিশোরের কানে ঢুকল কিনা বোঝা গেল না। বইপত্র নিয়ে আবার ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এক সময় মুখ তুলে বলল, 'কিছুদূর এগিয়েছি। সাত ভাগে মেসেজগুলোকে ভাগ করেছে জন সিলভার। পাখির কথা ভুলে গিয়ে শুধু এক দুই করেই চালিয়ে যাব।'

'যেভাবে খুশি চালাও,' গুঙিয়ে উঠল মুসা। 'কিন্তু জলদি আসল কথা কিছু বলো।'

'তিনে বলেছে গোরস্থানে ছবিটা লুকিয়ে রেখেছে জন সিলভার। তারমানে, এক আর দুই আমাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে সেখানে।'

'কিভাবে?' রবিনের প্রশ্ন।

'এক-এ বলা হয়েছে ঃ লিটল বো-পীপ হ্যাজ লস্ট হার শীপ অ্যাণ্ড ডাজ্‌ন্ট্ নো হোয়্যার টু ফাইণ্ড ইট। কল অন শারলক হোমস। অস্বাভাবিক কিছু লক্ষ করেছ?'

'শারলক হোমস মারা গেছে, এই তো?' মুসা বলল।

'বইয়ের চরিত্র শারলক হোমস, মরল না বাঁচল, কিছু এসে যায় না। সাহায্যের জন্যে তাকে ডাকতে পারছি না আমরা,' বলল রবিন।

'ঠিক,' তর্জনী দিয়ে বাতাসে কোপ মারল কিশোর। 'তাই মেসেজে কল ইন শারলক হোমস না বলে বলা হয়েছে কল অন...মানে? তার বাড়ি গিয়ে দেখা করো। কোথায় বাড়ি শারলক হোমসের?'

'লণ্ডনে,' জবাব দিল মুসা।

'লণ্ডনে, বেকার স্ট্রীটে,' বলল রবিন।

'বেশ,' কিশোর বলল, 'তাহলে তাকে খুঁজতে বেকার স্ট্রীটেই যেতে হবে আমাদের। দুইয়ে বলা হচ্ছে, টু-টু-টু বি আর নট টু-টু-টু বি...কাকাতুয়া পাখি, তোতলায় না, তার জিভ আর কণ্ঠনালীর গঠনই এরকম, তোতলামি রোগই হয় না। তার মানে? ইচ্ছে করেই শেখানো হয়েছে, যেটা আগেই সন্দেহ করেছিলাম।'

'তাতে কি?' মুসার জিজ্ঞাসা।

একটা কাগজে কিছু লিখল কিশোর। 'এই যে, দেখো,' বাড়িয়ে দিল দু-জনের দিকে।

লিখেছে ঃ বেকার স্ট্রীট ২২২বি।

'আরি!' চমকে গেল মুসা। 'ঠিকানা!'

'গোরস্থানের?' ভুরু কোঁচকাল রবিন।

ম্যাপের স্তূপ থেকে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার পুরানো একটা ম্যাপ বের করল কিশোর। 'শত শত শহর রয়েছে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায়, একাধিক বেকার স্ট্রীট। তবে, কবরস্থানই পথ দেখিয়েছে। এই যে, লস অ্যাঞ্জেলেসের দক্ষিণে একটা শহর, মেরিটা ভ্যালি। আর এই যে বেকার স্ট্রীট, আর এটা ভ্যালি স্ট্রীট,' আড়াআড়ি কেটেছে দুটো পথ, এক কোণায় আঙুল রাখল সে, 'এই যে, গোরস্থান। এটার কেয়ারটেকারের বাড়ির নম্বর, টু-টু-টু বি।'

'আরিসব্বোনাশ! জানলে কি করে?' মুসা অবাক।

'এই যে রেফারেন্স বইগুলো ঘেঁটে,' ডেস্কে ছড়ানো বইগুলো দেখাল কিশোর। 'তাছাড়া টেলিফোন তো আছেই। গোরস্থানের ওপর লেখা একটা পুস্তিকা পেয়েছি, ট্যুরিস্টদের জন্যে ছাপা হয়েছে। শোনো,' পুস্তিকা খুলে পড়তে শুরু করল, 'ক্যালিফোর্নিয়ার সব চেয়ে পুরানো কবরস্থানগুলোর অন্যতম মেরিটা ভ্যালির গোরস্থান। এখন অব্যবহৃত, অযত্নে পড়ে আছে। শোনা যাচ্ছে, শিগগিরই সংস্কার করে ঐতিহাসিক স্থান হিসেবে চিহ্নিত করা হবে।' পুস্তিকাটা বন্ধ করল। 'স্যানটিনো আর ডিয়েগো যেখানে থাকে, সেখান থেকে জায়গাটা মাত্র তিরিশ মাইল দূরে। তিন দিনে হেঁটে গিয়ে হেঁটে ফিরে আসা সম্ভব ছিল না অসুস্থ জন সিলভারের পক্ষেও।'

'বাকি মেসেজগুলো কি বলে?' জিজ্ঞেস করল রবিন। 'বুঝেছ?'

'না, এখানে বসে বোঝা যাবে না। গোরস্থানে গিয়ে মেলাতে হবে।'

'চলো, কাল ভোরেই রওনা হয়ে যাই। রোলস-রয়েসের কথা বলে রাখতে হয়,' বলল মুসা।

'শোঁপা এতক্ষণে বুঝে ফেলেছে কিনা কে জানে,' হাত ওল্টাল কিশোর। 'বুঝলে সময় নষ্ট করবে না। আমাদেরও করা উচিত হয়। সকাল হতে অনেক দেরি। বেলা আছে এখনও। তাড়াহুড়ো করলে আঁধার নামার আগেই ফিরে আসতে পারব। তবে সবাই এক সঙ্গে যেতে পারছি না...'

'কেন?'

'শোঁপা নিশ্চয় লোক লাগিয়ে রেখেছে, চোখ রেখেছে আমাদের ওপর। রোলস-রয়েসটা চোখে পড়বেই। আমাদের পিছু নেবে।'

'তাহলে?'

কি কি করতে হবে, দ্রুত ব্যাখ্যা করল কিশোর। ক্ষীণ প্রতিবাদ জানাল রবিন, কিন্তু গোয়েন্দাপ্রধানের জোরাল যুক্তির কাছে টিকল না।

কয়েক মিনিট পর হাজির হলো রোলস-রয়েস।

ধীরেসুস্থে চড়ল তাতে তিন গোয়েন্দা, কেউ যদি চোখ রেখে থাকে, যেন সে ভালমত দেখতে পারে।

ছুটি শেষ হয়নি হ্যানসনের। আজও গাড়ি নিয়ে এসেছে ক্র্যাব। হলদে দাঁত বের করে হাসল। 'পাখি খুঁজে পেয়েছ এক-আধটা?'

'কয়েকটা,' লোকটার কথার ধরন পছন্দ হলো না কিশোরের। 'একটাকে পুলিশেও খুঁজছে। চালান এখন। সামনের গেট দিয়ে বেরিয়ে ঘুরে পেছনের রাস্তায় চলে যান। রাস্তায় গিয়ে খুব ধীরে চালাবেন, থামবেন না।'

পাত্তা না পেয়ে মুখ কালো করল ড্রাইভার। তবে যা বলা হলো করল।

গাড়ি পেছনের রাস্তায় আসতেই রবিনকে 'হেডকোয়ার্টারে থেকো' বলে দরজা খুলে ডাইভ দিয়ে লাল কুকুর চারের কাছে নেমে পড়ল কিশোর। মুসাও নামল।

'তারপর, মাস্টার মিলফোর্ড?' মুখ গোমড়া করে বলল শোফার। 'কোথায় যাব? কাকাতুয়া ধরতে?'

'না,' কিশোর আর মুসার সঙ্গে যেতে না পারার ক্ষোভ চাপতে পারছে না রবিন। 'উপকূল ধরে চালান আধঘণ্টা। তারপর পুবে মোড় নিয়ে কোন একটা গিরিপথের ভেতর দিয়ে ফিরে আসবেন এখানে।'

পনেরো

কাঁকর বিছানো অসমতল পথে ঝাঁকুনি খেতে খেতে ছুটে চলেছে ইয়ার্ডের ছোট ট্রাক। চালাচ্ছে বোরিস। পাশে বসে পথের দিকে তাকিয়ে রয়েছে দুই গোয়েন্দা।

মাত্র কয়েক মিনিট আগে উঠে বসেছে। এতক্ষণ হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল মেঝেতে। ইয়ার্ডের দশ মাইল দূরে চলে এসেছে গাড়ি। এতদূরে নিশ্চয় আর কেউ নেই তাদের ওপর চোখ রাখার জন্যে।

'কেউ পিছু নেয়নি আমাদের,' এক সময় বলল বোরিস। 'কিন্তু ও-কি? ওটা শহর না ভূতের গাঁ। আমাদের ব্যাভারিয়ায় ওরকম অনেক শহর আছে...' ভূতের গল্প আরম্ভ করল সে।

এমনিতেই চলেছে গোরস্থানে। এসব ভূতের গল্প এখন মোটেই ভাল লাগছে না মুসার।

মেরিটা ভ্যালিতে পৌঁছতে এক ঘণ্টা লাগল। ঠিকই বলেছে বোরিস, এটাকে শহর বলা চলে না। বাণিজ্য কেন্দ্রগুলো ফেলে এল পেছনে। ছাল চামড়া ওঠা পুরানো বেকার স্ট্রীট ধরে এগিয়ে চলল। দুই ধারে একটা বাড়িও চোখে পড়ল না। পথের শেষ মাথায় পাথরের ছড়ানো দেয়াল। দেয়ালের ওপাশে পাথরের শত শত ক্রুশ আর স্মৃতিস্তম্ভ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। মেরিটা ভ্যালির গোরস্থান।

হাত তুলে দেখাল মুসা। দেয়ালের এক জায়গায় ফাঁক, মানে দেয়াল নেই ওখানে। কাঠের একটা পুরানো সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে ঃ

২২২ বি বেকার স্ট্রীট।

'এখানেই থামব?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

মাথা নাড়ল কিশোর। 'বোরিস, ডানে যান। পরের রাস্তাটায়।'

'হোকে, যাচ্ছি।'

মস্ত কবরস্থান, অনেক পুরানো। দেয়ালের কোণের দিকে আসার পর চোখে পড়ল প্রাচীন গির্জার ধ্বংসাবশেষ, পাথর আর কাঁচা ইঁটে তৈরি। নির্জন, পরিত্যক্ত।

মোড় নিল বোরিস। এগোল আরও শ-খানেক গজ। কবরস্থান পেছনে ফেলে চলে এল ইউক্যালিপটাস গাছের বেশ বড়সড় একটা ঝাড়ের কাছে। পথের ওপর মাথা নুইয়ে আছে ডালপালা, বয়েসের ভারে বাঁকা হয়ে গেছে যেন কোমর। পাতার ঝাঁঝাল তৈলাক্ত গন্ধ ভারি করে তুলছে বাতাস।

'গাছের নিচে রাখুন,' বোরিসকে বলল কিশোর।

নামল দুই গোয়েন্দা।

'আমাদের দেরি হবে,' বলল কিশোর, 'আপনি এখানে থাকুন।'

'হোকে।' রেডিও অন করে দিয়ে একটা খবরের কাগজ টেনে নিল বোরিস।

'এবার কি?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

নীরবে একটা ফাঁকা মাঠ দেখাল কিশোর, কোণাকুণি গিয়ে মিশেছে গোরস্থানের দেয়ালের সঙ্গে। 'কেউ না দেখে ফেলে আবার। ভেতরে কেউ থাকতেও পারে।'

নিঃশব্দে দেয়াল টপকাল দুজনে।

'নেই কেউ,' বলল মুসা, 'তবে থাকলে ভাল হত। বড় বেশি নির্জন। ভয় লাগছে।'

জবাব দিল না কিশোর। অনেক দিনের অব্যবহৃত একটা পথ ধরে এগিয়ে চলল। দু-ধারে অসংখ্য ছোটবড় স্মৃতিস্তম্ভ আর ক্রুশ, কোনটা আস্ত কোনটা ভাঙা, কোনটা হেলে রয়েছে বিষণ্ন ভঙ্গিতে।

'পথ চিনে রাখো, মুসা, অন্ধকার হলেও যেন ফিরে যাওয়া যায়। তুমিই পারবে, আমাকে দিয়ে হবে না।...এহ্হে, যাহ্, টর্চ আনতে ভুলে গেছি।'

'মরেছি! অন্ধকারে?' কুকুরছানার মত কেঁউ করে উঠল মুসা। 'দরকার কি এতক্ষণ থাকার?' হালকা এক ঝলক ধোঁয়ার মত কিছু উড়ে গেল ওদের সামনে দিয়ে। 'আরে? আবার কুয়াশা।'

পশ্চিমে তাকাল কিশোর, প্রশান্ত মহাসাগরের অসীম বিস্তার যেন পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছে। হ্যাঁ, ঠিকই আন্দাজ করেছে মুসা। পানির ওপরে চাপ চাপ ধোঁয়ার মেঘ ভাসছে, বাতাসে দুলে ধীরে ধীরে সরে আসছে এদিকেই।

এরকম হয় দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায়। কোন আভাস না দিয়েই হঠাৎ করে কুয়াশা জমতে শুরু করে সাগরের ওপর, ধেয়ে আসে উপকূলে, দিনের বেলায়ও তখন কয়েক হাত দূরের জিনিস দেখা যায় না।

'দিল বোধহয় সর্বনাশ করে,' কিশোরের কণ্ঠে শঙ্কার ছায়া, মুখ গম্ভীর।

'অন্ধকারের চেয়েও খারাপ। এসে পড়ার আগেই যদি ছবিটা খুঁজে পেতাম।...ওই যে, রাস্তাটা।'

লম্বা লম্বা পায়ে হেঁটে চলল কিশোর। দুটো বড় স্মৃতিস্তম্ভের মাঝ দিয়ে এসে থামল অনেকগুলো পথের একটা সঙ্গমস্থলে। পথের শাখাপ্রশাখা এখান থেকে বেরিয়ে জালের মত ছড়িয়ে গেছে বিশাল গোরস্থানের ভেতরে ভেতরে। জায়গাটা '২২২ বি' লেখা সাইনবোর্ডের কাছেই।

'এবার?' অস্বস্তি লাগছে মুসার।

পকেট থেকে নোট লেখা কাগজ বের করল কিশোর। 'টু টু টু বি বেকার স্ট্রীটে এলাম। চার নম্বর মেসেজ বলছে, একশো কদম পশ্চিমে যাও। গেটের মুখ উত্তর দিকে...তাহলে, এই যে, এদিকে...'

'কি?'

'একশো কদম মানে একশো গজ,' বিড়বিড় করল কিশোর। 'জন সিলভারের কথা মোতাবেক এখান থেকে একশো গজ পশ্চিমে যেতে হবে আমাদের। মুসা, শুরু করো। তোমার পা লম্বা, বড়দের সমান হবে।'

এক...দুই...তিন করে গুণে গুণে পা ফেলতে শুরু করল মুসা। তার পেছনে রইল কিশোর।

এক জায়গায় চল্লিশ ফুট দূরের দেয়ালের সঙ্গে সমান্তরাল হয়ে চলে গেছে একটা পথ, ওটা ধরেই এগোচ্ছে এখন।

একশো গুণে থামল মুসা। 'এবার?'

'পাঁচ নম্বর বলছে, ইউ নো মাই মেথডস, ওয়াটসন। থ্রি সেভেনস লীড টু থারটিন।'

'মাথা লিখেছে,' রাগ করে বলল মুসা।

চিন্তিত চোখে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে কিশোর। হঠাৎ বলল, 'মুসা, তোমার কদম কি পুরো এক গজ?'

'কি জানি। মেপে তো দেখিনি।'

'তাহলে মেপে দেখা যাক।' পকেট থেকে একটা প্লাসটিকের টুকরো বের করল কিশোর, একটা তিন বছরের পকেট ক্যালেণ্ডার। এক ধারে চার ইঞ্চি লম্বা স্কেল রয়েছে। মুসার ছড়ানো কদম মেপে দেখল। 'হুঁম্‌ম্‌। তিরিশ ইঞ্চি। একশো কদমে কম হয়েছে পঞ্চাশ ফুট। হাঁটো। আরও বিশ কদম।'

একেবারে পেছনের দেয়ালের কাছে চলে এল ওরা। 'কিন্তু দৃষ্টি আর্কষণ করার মত পাথর বা কোন কিছু নেই।

'দেখো,' হাত তুলে উল্টোদিকে খানিক দূরের তিনটে পাথরের ফলক দেখাল মুসা। পাশাপাশি তিনটে কবরের মাথার কাছে গাঁথা। তিনটে ফলকে তিনটে নাম ঃ হিউগো সেভার্ন, পিটার সেভার্ন, মরিস সেভার্ন। ১৮৮৮ সালের একটা তারিখ লেখা রয়েছে নিচে, একই দিনে তিনজনে পীতজ্বরে মারা গেছে।

'সেভার্ন!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা, 'সেদিনই ধরেছিলাম! রবিন উড়িয়ে দিল ইংরেজদের কথার টান বলে। থ্রি সেভার্নস লীড টু থারটিন।'

'হ্যাঁ, সেভার্নরা রয়েছে এখানে। কিন্তু তেরোর কাছে নিয়ে যাবে কিভাবে?' দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল কিশোর।

'পাথরগুলো রয়েছে এক সারিতে,' বুদ্ধি খুলে যাচ্ছে মুসার, 'এক লাইন। লাইনটা ধরে ডানে-বাঁয়ে যে কোন একদিকে হাঁটি।...ইয়াল্লা, কিশোর, জলদি করো। কুয়াশা এসে পড়ছে।'

পাক খেয়ে খেয়ে এগিয়ে আসছে হালকা কুয়াশা, এটা সামনের স্তর, ঘিরে ধরল দুই গোয়েন্দাকে। হাহাকার করে গেল বাতাস, যেন অশরীরী কোন প্রেতের বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস। শিউরে উঠল মুসা। ককিয়ে বলল, 'কিশোর, জলদি করো, প্লীজ!'

বিষণ্ণ পরিবেশকে আরও বিষণ্ণ করে তুলছে বিচ্ছিরি কুয়াশা, কিন্তু কিশোরের ভাবান্তর নেই। গালে টোকা দিচ্ছে, তাকাচ্ছে আশেপাশে। 'হুঁ!, লাইনটা গিয়ে শেষ হয়েছে ওই পাথরটায়। চলো তো দেখি।'

আরেকটা প্রস্তরফলক। এপাশে কিছুই লেখা নেই। ঘুরে ওপাশে আসতেই দেখতে পেল ওরা, লেখা রয়েছে ঃ

চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে আছে এখানে
তেরোজন অচেনা ভ্রমণকারী
ইণ্ডিয়ানরা খুন করেছে এদের সবাইকে।
জুন ১৭, ১৮৭৬

'থারটিন!' ফিসফিস করল মুসা, জোরে বলতে ভয় পাচ্ছে, যেন ঘুম ভেঙে যাবে তেরোজন হতভাগ্য মানুষের। 'তিন সেভার্ন নিয়ে এল তেরোর কাছে।'

'ছয় নম্বর বলছে,' কিশোর বলল, 'লুক আনডার দা স্টোনস বিয়ণ্ড দা বোনস ফর দা বক্স দ্যাট হ্যাজ নো লকস।'

'কিন্তু কোন পাথরটা? এখানে তো পাথরে বোঝাই।'

'মেসেজ বলছে, বিয়ণ্ডা দা বোনস,' বাঁকা চোখে কয়েকটা পাথরের দিকে তাকাল কিশোর। 'দূর, কুয়াশা এসেই পড়ল দেখি।...ওই যে, দেয়ালের ধারের ওই মনুমেন্টের কাছে, পাথর পড়ে আছে কতগুলো...কোনকালে পড়েছিল কে জানে, ঠিক করেনি আর।...আচ্ছা, তেরোজনের হাড়গোড়কে "বোনস" ধরে নিলে ওগুলোকেই "স্টোনস" বোঝায়, আশেপাশে আর যা আছে, একটা করে পাথর, স্তূপ নেই...'

কিশোরের কথা শেষ হওয়ার আগেই ছুটে গেল মুসা। দু-হাতে পাথর সরাতে শুরু করল। মুখ না তুলে বলল, 'কিশোর, হাত লাগাও। কুয়াশার আগেই শেষ করতে হবে।'

কাজে এতই মগ্ন রয়েছে ওরা, পেছনে পদশব্দ শুনতে পেল না।

'বাহ্, খুব কাজের ছেলে,' বলে উঠল কেউ।

কানের কাছে যেন বাজ পড়েছে, এত জোরে চমকে উঠল দুজনে।

ঘনায়মান কুয়াশার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে তিনটে মূর্তি, একজন শোঁপা, কোন সন্দেহ নেই, পাশের দুজনকেও চেনে, একজনের নাম জানে, টমাস,

আরেকজনের জানে না।

'তোমাদের কাজ শেষ,' কাছে এসে হাসল শোঁপা। 'আর কষ্টের দরকার নেই। এবার আমরাই পারব। টমাস, ধরো ওদের।'

মনে মনে, এক সঙ্গে একই সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেল দুই গোয়েন্দা। লাফিয়ে উঠে দুজন ছুটল দুদিকে। কিন্তু পারল না। ধরা পড়ে গেল।

'টমাস, তুমি ধরে রাখো,' আদেশ দিল শোঁপা। 'ডিংকি, পাথর সরাও।'

মুসার হাত মুচড়ে ধরল টমাস, পিস্তল বের করে পিঠে ঠেকাল। কিশোরকে বলল, 'চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো। নাকি বন্ধুর পিঠ ফুটো করাতে চাও?'

ষোলো

ঠাণ্ডা, ভেজা শুঁড় দিয়ে ওদেরকে পেঁচিয়ে নিচ্ছে যেন ঘন কুয়াশা।

দ্রুত হাত চালাচ্ছে ডিংকি, লুকানো হাড় খুঁজছে যেন ক্ষুধার্ত কুকুর। ছোটবড় পাথর, টালি আর কাঁচা ইঁটের টুকরো ছুঁড়ে ফেলছে চারপাশে, একটা ভাঙা ডাল ছুঁড়ে ফেলল, একটা পুরানো পাইপ ফেলল, কাছেই দাঁড়িয়ে থাকা টমাস আর ছেলেদের গায়েও এসে পড়ছে কিছু।

'এই, দেখেটেখে ফেলো,' বলল টমাস। 'লাগে।'

'হ্যাঁ, এত তাড়াহুড়ো কি?' বলল শোঁপা। 'আরও আস্তে সরাও না।'

চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখছে দুই গোয়েন্দা। তেতো হয়ে গেছে মন। এত কষ্টের পর লাভটা কি হলো? ওরা ছবি বের করে দিল, মজা লুটবে এখন ওই বিদেশী চোর।

'মন খারাপ লাগছে?' শান্তকণ্ঠে বলল শোঁপা। 'জানো, দুনিয়ার অনেক জায়গায় গিয়েছি আমি, অনেক মিউজিয়ম থেকে ছবি চুরি করেছি, অনেক জাঁদরেল পুলিশ আর গার্ডকে বোকা বানিয়ে এসেছি, নিজেকে খুব চালাক ভাবতাম। কিন্তু না বলে পারছি না, তোমরা আমার মত লোককেও বহুত নাকানি-চুবানি খাইয়েছ। ওই গাড়ি বদলানোর বুদ্ধিটা তো রীতিমত···কি বলব? হতবাক করে দিয়েছে আমাকে।' কুয়াশায় ভিজে নিভে যাওয়া সিগারেট আবার ধরিয়ে নিয়ে হাসল। কুয়াশার মধ্যে জ্বলন্ত লাইটার হাতে কালো আলখেল্লা পরা মূর্তিটাকে ঠিক মানুষ মনে হচ্ছে না এখন, কবর থেকে উঠে এসেছে যেন, ভূত। 'আন্দাজ ঠিকই করেছিলে তোমরা, তোমাদের ওপর চোখ রাখতে বলেছিলাম। রেখেছিলও। রোলস-রয়েসটাকে অনুসরণ করেছিল। বিশ মিনিট পর ওটার পাশ কাটিয়ে আসার সময় দেখল ভেতরে মাত্র একটা ছেলে। ফোনে জানাল আমাকে। প্রথমে বুঝতেই পারিনি, ঘটনাটা কি ঘটেছে। অনেক ভাবার পর···নাহ্, ইয়াং ম্যান, তোমরা প্রতিভাবান। আমার ভক্তি এসে গেছে। আমি চোর, ঠিক, কিন্তু এনথনি শোঁপার শ্রদ্ধা পেতে হলে···' জোরে জোরে কয়েকবার টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল সে, কিন্তু কুয়াশার জন্যে দেখা গেল না ধোঁয়া, এক রঙ হয়ে গেছে।

পাথর সরিয়েই চলেছে ডিংকি।

'জন সিলভারের কয়েকটা মেসেজ বুঝেছি তাড়াতাড়িই,' আবার বলল শোঁপা।

'তবে এই কবরখানার কথা ভাবিনি প্রথমে। তাড়াহুড়ো ছিল। ম্যাপ-ট্যাপ নিয়ে বসতে পারলে অবশ্য বুঝে যেতাম। শেষে ট্যুরিস্ট ব্যুরোকে ফোন করে জিজ্ঞেস করলাম, আশেপাশে নির্জন পোড়ো জায়গা কোথায় কোথায় রয়েছে। মেরিটা ভ্যালির কথা ওরাই জানাল।'

টমের পায়ে এসে পড়ল মাঝারি সাইজের একটা পাথর। গাল দিয়ে উঠল সে। ধমক দিয়ে বলল, 'এই, দেখে ফেলতে পারো না?'

'দেখেই ফেলো, ডিংকি,' নরম গলায় বলল শোঁপা। 'পাথর হাড্ডিতে পড়লে ব্যথা লাগে।'

বড় চ্যাপ্টামত একটা পাথর সরিয়েই অস্ফুট শব্দ করে উঠল ডিংকি। টেনে পাথরের তলা থেকে বের করে আনল জিনিসটা। 'এই যে নিন, মিস্টার শোঁপা, আপনার বাক্স।'

'বাহ্!' এগিয়ে গিয়ে বাক্সটা নিল শোঁপা। পাশে চোদ্দ ইঞ্চি, লম্বায় তার প্রায় দ্বিগুণ। ছোট শক্ত একটা তালা লাগানো রয়েছে কড়ায়। 'হ্যাঁ, সাইজ ঠিকই আছে। ভেরি গুড, ডিংকি।'

'ওটাই,' বাংলায় বলল কিশোর, বিষণ্ণ কণ্ঠে।

মুসা বুঝল। কিশোরের কাছে বাংলা মোটামুটি শিখে নিয়েছে সে আর রবিন।

পকেট থেকে খুব শক্তিশালী ছোট একজোড়া কাটার বের করল শোঁপা, এক চাপেই কট করে কেটে ফেলল ধাতব আঙটা।

'বাজে অবস্থা,' কুয়াশার দিকে চেয়ে বলল শোঁপা। 'তবে মনে হয় না ছবিটার কোন ক্ষতি হবে। ভাল ছবি ভাল রঙ দিয়েই আঁকা হয়। এক পলক দেখি,' নিজেকেই বোঝাচ্ছে সে, আসলে লোভ সামলাতে পারছে না।

সাবধানে ডালা তুলে ভেতরে চেয়েই চেঁচিয়ে উঠল রাগে। লাফ দিয়ে তার পাশে এসে দাঁড়াল ডিংকি। ছেলেদের দিকে মনোযোগ হারিয়েছে টমাসও, গলা বাড়িয়ে উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করল বাক্সের ভেতর কি আছে।

এক টুকরো কাগজ রয়েছে শুধু বাক্সের ভেতরে। বের করে জোরে জোরে পড়ল শোঁপা, 'সরি, বন্ধু, মেসেজের মানে ঠিকমত বোঝনি।'

'কিশোর,' ফিসফিস করে বাংলায় বলল মুসা, 'এই-ই সুযোগ,' বলেই ঝাড়া মারল। বাক্সের ভেতর কি আছে দেখার জন্যে ঢিল দিয়েছিল টমাস, ঢিলই রয়ে গেছে আঙুল, ফলে ছুটিয়ে নিতে পারল মুসা। একই সঙ্গে ডাইভ দিয়ে পড়ল সামনে। ছোঁ মেরে তুলে নিল পায়ের কাছে পড়ে থাকা পুরানো পাইপটা। গুলি করবে কিনা দ্বিধা করছে টমাস, সুযোগটা কাজে লাগাল মুসা। এক বাড়ি দিয়ে ফেলে দিল পিস্তল। পরক্ষণেই গায়ের জোরে বাড়ি মারল টমাসের মাথা সই করে।

চট করে সরিয়ে নিয়ে মাথা কোনমতে বাঁচাতে পারল টমাস, কিন্তু কাঁধ বাঁচাতে পারল না। 'আঁউউ' করে উঠে কাঁধ চেপে ধরে বসে পড়ল। দাঁড়িয়েই আছে কিশোর। এসব বিশেষ মুহূর্তে তার পেশী যেন জড় হয়ে যায়, নড়তে চায় না। এক হাতে পাইপ, আরেক হাতে কিশোরের কব্জি চেপে ধরে টান মারল মুসা। দৌড়ে গিয়ে ঢুকে গেল ঘন কুয়াশার মধ্যে। সামনে খানিকটা জায়গায় কুয়াশা যেন

জট বেঁধে কালো হয়ে গেছে, আসলে ইউক্যালিপটাসের একটা ঝাড়। কিশোরকে নিয়ে ছুটে ওটার ভেতরে ঢুকে পড়ল মুসা।

'ট্রাকটা ওদিকে,' ফিসফিস করে বলল মুসা, হাত তুলে একটা দিক দেখাল। কিছুই চোখে পড়ল না কিশোরের। কোনটা যে কোন দিক, মুসা কি করে খেয়াল রেখেছে, সে-ই জানে। কিশোরের কাছে সব দিক একই রকম লাগছে।

'কি করে বুঝলে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'বুঝেছি,' শুধু বলল মুসা।

বিশ্বাস করল কিশোর। দিকচিহ্ন খুঁজে বের করার ব্যাপারে ওস্তাদ তার সহকারী। রাতের বেলায়ও এমন সব জায়গায় পথ খুঁজে বের করে ফেলে মুসা, কিশোর যেখানে দিনেই হারিয়ে যায়।

'শোনো,' দ্রুত বলল মুসা, 'দেয়ালের ধার ধরে যাও, মাঝে মাঝেই ইউক্যালিপটাসের ঝাড় পাবে। আমরা যেখান দিয়ে ঢুকেছিলাম সেই ফাঁকটার কাছে চলে যেতে পারবে। ঝাড়ের ভেতরে ভেতরে চলে যাও।'

'পারব না,' অনিশ্চিত শোনাল গোয়েন্দাপ্রধানের কণ্ঠ, 'হারিয়ে যাব।'

'হারাবে না…ওই যে. ব্যাটারা আসছে, ওদের ভুল পথে তুলে দিয়ে আসিগে। গাছের দিকে চোখ রাখবে। আশ্চর্যবোধক আর তীর চিহ্ন এঁকে এঁকে যাব। অসুবিধে হবে না তোমার। যাও।'

কাঁধ চেপে ধরে ঝটকা দিয়ে বন্ধুকে ঘুরিয়ে সামনে ঠেলে দিল মুসা। তারপর আরেক দিকে ঘুরে লোকগুলোকে শুনিয়ে জোরে জোরে বলল, 'এই কিশোর, এই যে এদিকে, এসো।'

হই-চই শোনা গেল তিনজন মানুষের।

আবার শোনা গেল মুসার কথা। সরে যাচ্ছে। দূর থেকে দূরে লোকগুলোকে সরিয়ে নিয়ে চলল সে।

অন্ধের মত ছুটছে কিশোর। ভাঙা ক্রুশ, স্তম্ভ আর পাথরে হোঁচট খেলো, হুমড়ি খেয়ে পড়ল কয়েকবার। কনুই আর হাঁটুর চামড়া ছিলল কয়েক জায়গায়। এক ঝাড় থেকে বেরিয়ে অনেক কষ্টে খুঁজে পেল আরেকটা ঝাড়।

কুয়াশা এখানে সামান্য হালকা, যেন পানির নিচে রয়েছে সে। কয়েক ফুটের বেশি নজর চলে না। কুয়াশা আসছে…আসছেই…ঢেউয়ের মত একনাগাড়ে। গাঢ় হচ্ছে ধূসর রঙ। ওপর দিকে কুয়াশা অনেক পাতলা, তার মধ্যে দিয়ে কোণাকুণি দৃষ্টি চলে অনেক দূর। প্রায় চল্লিশ ফুট দূরে একটা গাছের মাথা আবছামত দেখতে পেল কিশোর। দৌড় দিল সেদিকে।

তিন দিকে ছড়িয়ে পড়েছে তিনজন মানুষের কণ্ঠস্বর, পথ হারিয়েছে মনে হচ্ছে।

মুসার কোন সাড়াশব্দ নেই, কোথায় রয়েছে বোঝা যাচ্ছে না।

গাছের কাছে এসে থামল কিশোর। কুয়াশা এখানে খুবই পাতলা। গাছের গায়ে নীল চকে আঁকা আশ্চর্যবোধকটা স্পষ্ট। তীর চিহ্ন বাঁয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত করছে।

ছুটল কিশোর।

আরেকটা ঝাড়ের কাছে চলে এল। আশ্চর্যবোধক আর তীর চিহ্ন আঁকা আছে

গাছের গায়ে। কি ভাবে যেন কিশোরের আগে চলে গেছে মুসা। পেছনে একজন লোকের চিৎকার শোনা গেল, কোন কিছুতে হোঁচট খেয়ে পড়ে ব্যথা পেয়েছে। অন্য দুজনের গলাও শোনা যাচ্ছে, সরে যাচ্ছে দূরে।

কিশোর যেখানে রয়েছে, সেখানেও ঘন হতে শুরু করেছে কুয়াশা। ভীষণ এক দুঃস্বপ্নে রয়েছে যেন সে, কিংবা কোন প্রেতপুরীতে। গাছের ডালপাতাগুলোকে মনে হচ্ছে কোন পিশাচের বাহু, ধারাল নখ দিয়ে খামচে ধরতে আসছে তাকে। অতি সাধারণ স্তম্ভগুলোও ভয়াবহ ভূতুড়ে রূপ নিয়ে পথ রোধ করতে চাইছে তার। ছোটার সময় কয়বার যে বাড়ি খেয়েছে, কপাল ফুলে গেছে, ব্যথা করছে বুকের একপাশ। কিন্তু সেসব খেয়াল করার সময় এখন নেই।

ছুটে চলেছে কিশোর। যখন মনে করল, দেয়ালের ফাঁকের আর দেখা পাবে না, ঠিক সেই সময়ই দেখতে পেল দেয়ালটা। কুয়াশার মধ্যে দিয়ে শুধু ওপরের অংশ দেখা যাচ্ছে, কালো মোটা রেখার মত।

দেয়ালের ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে এসে পড়ল কিশোর। মোটা রেখাটা ধরার জন্যে হাত বাড়াল ওপরে।

কে যেন চেপে ধরল কব্জি, জীবন্ত আরেকটা হাত।

ঝটকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিতে যাচ্ছিল কিশোর, ফিসফিসিয়ে বলল মুসা, 'কিশোর, আমি।'

বন্ধুর গলা এত মধুর আর কখনও মনে হয়নি কিশোরের। টেনে তাকে দেয়ালের ওপর তুলে নিল মুসা।

দুজনে লাফিয়ে নামল ওপাশে।

হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল মুসা। নতুন অভিজ্ঞতা হচ্ছে আজ গোয়েন্দাপ্রধানের। কোন ব্যাপারে কারও ওপর এতখানি নির্ভরও আর কখনও করেনি।

ঘন কুয়াশার ভেতরে দেখা যাচ্ছে হলুদ দুটো ঘোলাটে আলো, যেন কোন দানবের চোখ। ট্রাকের হেডলাইট।

হাঁপাতে হাঁপাতে ট্রাকের কাছে এসে থামল দুই কিশোর।

'তোমরা হোকে?' পাশে এলিয়ে পড়া দুই গোয়েন্দাকে জিজ্ঞেস করল বোরিস।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, হোকে,' দম নিয়ে সারতে পারছে না কিশোর, ফেটে যাবে যেন ফুসফুস। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, আর আলসেমি নয়, কাল থেকেই সকালে উঠে মুসার সঙ্গে ব্যায়াম শুরু করবে সে। আরিব্বাপরে বাপ, দৌড়ানো এত কষ্ট! 'বাড়ি যান। হারামি এই কুয়াশার ভেতর থেকে বেরোন।'

সাবধানে এগিয়ে চলল বোরিস। পুবে। পাতলা হতে হতে এক সময় পেছনে পড়ে গেল কিশোরের 'হারামি' কুয়াশা।

সতেরো

ট্রাক ছুটছে।

অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারল না ছেলেরা।

'একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত,' অবশেষে বলল কিশোর। 'হারামী হোক আর যাই হোক, কুয়াশা আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছে। পিছু নিতে পারেনি শোঁপার দল।'

'কেন পিছু নেবে?' মুসা বলল। 'ছবিটা পাইনি আমরা।'

'ওদের ধারণা, পেয়েছি,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে শুরু করল কিশোর। 'খুব একচোট দেখিয়েছে জন সিলভার। সাংঘাতিক রসিকতা। এত কষ্টের পর পাওয়া গেল খালি বাক্স, তার ওপর আবার একটা নোট।'

'জাহান্নামে যাক ব্যাটারা,' কিশোরের কথায় বিশেষ কান নেই মুসার। 'এখন আসুক। বোরিস আছে আমাদের সঙ্গে। পিটিয়ে তক্তা করে দেব।' হাতের পাইপটা দেখাল সে। এখনও রয়েছে ওটা তার হাতে, ফেলেনি এত কিছুর পরও। তার কারণ, এটা একটা অস্ত্র। 'টমাসের বাচ্চাকে যদি আরেকটা খিঁচতে পারতাম!' দাঁতে দাঁত চাপল সে।

'যা একখান খিচেছ সেটাই জিন্দিগিভর মনে রাখবে, মাথায় লাগলে মরেই যেত,' বলল কিশোর। 'দারুণ দেখিয়েছ আজ তুমি, মুসা। আমিও অনেকদিন মনে রাখব।'

অবাক হলো মুসা, খুশিও। কিশোর পাশা প্রশংসা করছে। যে শুধু লোকের দোষ ছাড়া আর কিছু দেখে না (মুসার ধারণা) যাক, আজ তাহলে দেখিয়ে দিতে পেরেছে গোয়েন্দাপ্রধানকে, সুযোগ পেলে সে-ও 'মনে রাখার মত' কিছু করতে পারে।

'মেসেজের মানে তো বের করলাম,' বলল কিশোর। 'বাক্সটাও পেলাম। কিন্তু ছবি কই?'

'বলেছেই তো ঃ আই নেভার গিভ আ সাকার অ্যান ইভন ব্রেক,' মনে করিয়ে দিল মুসা। 'হাইমাসের ওপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে।'

'হয়তো,' ভাবনায় ডুবে গেল কিশোর।

সারা পথে আর কোন কথা হলো না। কিশোর ভাবতেই থাকল, মুসাও বাধা দিল না।

রকি বীচে ঢোকার আগে খানিক দূর হালকা কুয়াশার ভেতর দিয়ে আসতে হয়েছে। ছড়িয়ে পড়েছে কুয়াশা। মেরিটা ভ্যালির গোরস্থানে এখন কি অবস্থা ভাবতেই রোম খাড়া হয়ে গেল মুসার।

জোর বাতাস বইতে শুরু করল, দ্রুত দক্ষিণে সরে গেল কুয়াশা।

নিরাপদেই স্যালভিজ ইয়ার্ডে ঢুকল ট্রাক।

'চলো, হেডকোয়ার্টারে,' মুসাকে বলল কিশোর। 'রবিন নিশ্চয় বসে আছে।'

অধীর হয়ে আছে রবিন। বসতে পারছে না। খালি ছটফট করছে, পায়চারি

করছে ট্রেলারের ছোট্ট পরিসরে।

দুজনকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল সে, 'পেয়েছ?'

কিন্তু বন্ধুদের মুখ দেখেই প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেল রবিন। কারও হাতেই বাক্স নেই, মুসার হাতে শুধু পাইপটা। অস্ত্র—অনুমান করতে কষ্ট হলো না রবিনের, মারপিট করে এসেছে মুসা।

'শোঁপা ধরে ফেলেছিল,' ধপাস করে গিয়ে নিজের চেয়ারে গড়িয়ে পড়ল কিশোর।

'তবে ছবিটা সে-ও পায়নি,' যোগ করল মুসা। নিজের সীটে বসল। 'বাক্সটা পাওয়া গেছে, ভেতরে শুধু একটা নোট। তাতে লেখা, মেসেজটার মানে নাকি ঠিকমত করতে পারিনি।'

'তাই?' বলল রবিন। 'অবাক কাণ্ড! জন সিলভার শুধুই রসিকতা করল? খালি খাটানোর জন্যে? নো রেজাল্ট?'

'আমার তা মনে হয় না,' চেহারা বিকৃত করে রেখেছে কিশোর। 'তাহলে অন্য কিছু লিখত। মেসেজটার মানে ঠিকমত করা হয়নি, একথা লিখত না।'

'আগেই বলেছিলাম…' বলা আর হলো না, ফোন বেজে উঠল।

পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা। কে? এখন তো কারও ফোন করার কথা নয়।

'হবে হয়তো মিসেস হাইমাস,' বলতে বলতে রিসিভার তুলে নিল কিশোর, স্পীকারের সুইচ অন করে দিয়ে বলল, 'হালো, তিন গোয়েন্দা।'

'কংগ্রাচুলেশনস, ইয়াং ডিটেকটিভস,' শুকনো হাসির সঙ্গে বলল একটা খনখনে কণ্ঠ, কথায় কড়া ফরাসী টান।

কার গলা ঠিকই বুঝতে পেরেছে কিশোর, তবু জিজ্ঞেস করল, 'কে বলছেন?'

'এত তাড়াতাড়িই ভুলে গেলে? এই তো খানিক আগে মেরিটা ভ্যালির গোরস্থানে দেখা হয়েছিল। তোমাদের সঙ্গে কয়েকটা কথা বলার লোভ সামলাতে পারলাম না। জন সিলভার খুব বোকা বানিয়েছে আমাকে। আর ঘোরাঘুরি করে কি লাভ? আমি পরাজিত,' হতাশা ঢাকতে পারল না এনথনি শোঁপা।

চুপ করে রইল কিশোর।

'এয়ারপোর্ট থেকে বলছি,' আবার বলল শোঁপা। 'চলে যাচ্ছি আমি। পুলিশকে জানাতে পারো, লাভ হবে না। ওরা ধরতে পারবে না আমাকে। কেন ফোন করেছি জানো? আরেকবার তোমাদের প্রশংসা করতে। হাইমাসকে বলবে, আমি তার শুভকামনা করছি।'

'থ্যাংক ইউ,' শুধু বলল কিশোর।

'আমাকে টেক্কা দিয়েছ তোমরা,' আবার বলল শোঁপা, 'আজতক আর একজন কি দুজন সেটা পেরেছে। দাওয়াত দিয়ে রাখছি। যদি কখনও ইউরোপে বেড়াতে আসো, খুঁজে বের কোরো আমাকে। ইচ্ছে করলে সেটাও পারবে তোমরা, আমি জানি। ফ্রান্সের অপরাধ জগত ঘুরিয়ে দেখাব তোমাদের। কত রহস্য, কত রোমাঞ্চ আর উত্তেজনা যে লুকিয়ে আছে সেখানে, কল্পনাও করতে পারবে না। আরেকটা কথা, হয়তো ভাববে চোরের উপদেশ কি শুনব? তবু বলছি, মানুষের কল্যাণে

লাগিয়ো তোমাদের মেধা, মানুষের উপকার কোরো, আমার মত চোর হয়ো না। তোমাদের ওপর হয়তো অনেক অন্যায় করেছি, কষ্টও দিয়েছি, মাপ কোরো।'

'কি যে বলেন,' এতই অবাক হয়েছে কিশোর, মিটমিট করছে চোখের পাতা।

'কিশোর,' আবার বলল শোঁপা, 'লেকচারের মত শোনাচ্ছে কথাগুলো, তবু বলছি, তোমার দেশ, বাংলাদেশে গিয়েছিলাম একবার। আহা, কি যে কষ্ট ওখানকার মানুষের। চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। বড় হয়ে তোমার দেশে চলে যেয়ো, যদি কোনভাবে পারো, সাহায্য কোরো দেশের মানুষকে···ওরা সত্যি বড় অসহায়···'

জোরে জোরে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর, কি যেন মনে পড়ি পড়ি করেও পড়ছে না। কিন্তু মনে পড়ে গেল হঠাৎ। 'মঁশিয়ে শোঁপা, আপনি সেই লোক নন তো? ফ্রান্সের গরীব-দুঃখীরা যাঁকে আধুনিক রবিন হুড বলে?'

'ও হ্যাঁ, আরেকটা কথা,' কিশোরের প্রশ্ন এড়িয়ে গেল শোঁপা, 'কাকাতুয়াগুলো ওশেন স্ট্রীটের একটা গ্যারেজ আছে, ঠিকানাটা লিখে নাও চট করে···'

দ্রুত লিখে নিল রবিন।

'অউ রিভোয়া, মাই বয়েজ,' বলল শোঁপা, 'অ্যাণ্ড এগেন কংগ্রাচুলেশনস।'

কেটে গেল লাইন।

অদ্ভুত একটা পরিবেশ সৃষ্টি হলো হেডকোয়ার্টারে। অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলতে পারল না। যেন অতি পরিচিত একজন বন্ধু চলে গেল ওদের।

'কে ওই আধুনিক রবিন হুড?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'আমিও শুনেছি ওঁর নাম,' বলল রবিন। 'দুর্দান্ত এক দস্যু। সেই প্রাচীন কথাটা—ধনীর যম, গরীবের বন্ধু···'

'আমি পাল্টে দিচ্ছি কথাটা,' কিশোর বলল। 'উৎপীড়কের যম, উৎপীড়িতের বন্ধু···দুনিয়ার সব ধনীরাই খারাপ নয়···যাই হোক, আমাদের আসল আলোচনা থেকে অনেক দূরে সরে গেলাম।'

'হ্যাঁ, ছবিটা কোথায় থাকতে পারে?' পাইপ দিয়ে হাতের তালুতে আস্তে বাড়ি দিল মুসা। 'আরে অমন করে চেয়ে আছো কেন আমার দিকে···'

'ছয় নম্বর মেসেজে কি বলা হয়েছে?' নিঃশ্বাস ভারি হয়ে আসছে কিশোরের।

'লুক আণ্ডার দা স্টোনস বিয়ণ্ড দা বোনস ফর দা বক্স দ্যাট হ্যাজ নো লকস,' জবাব দিল রবিন।

'কিন্তু মুসা,' কিশোর বলল, 'ডিংকি যে বাক্সটা পেয়েছে, ওটাতে তালা লাগানো ছিল। অথচ মেসেজে পরিষ্কার বলছে, ছবি যেটাতে থাকবে তাতে কোন তালা থাকবে না।'

'ঠিক!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা, আরেকবার পাইপ দিয়ে বাড়ি দিল হাতের তালুতে। 'আরেকটা বাক্স আছে···না। আর থাকতে পারে না। খুব ভালমত খুঁড়েছে ডিংকি।'

'কিন্তু এমন যদি হয়?' হাতের তালুতে থুঁতনি রাখল কিশোর। 'ছোট অন্য কোন ধরনের বাক্স? যেটাকে বাক্স মনে হবে না? আচ্ছা, সাত নম্বরে কি লিখেছে?'

'আই নেভার গিভ আ সাকার অ্যান ইভন ব্রেক,' বলল মুসা। 'স্কারফেসকে

ওকথাই বলতে শুনেছি, না রবিন?'

'হ্যাঁ,' রবিন মাথা ঝাঁকাল। 'তবে তার সঙ্গে ব্ল্যাকবিয়ার্ড যোগ করেছে, অ্যাণ্ড দ্যাটস আ লেড পাইপ সিন্‌শ্‌। এটাও আরেকটা পুরানো স্ল্যাঙ।'

'তাই?' আপনমনে বলল কিশোর। 'প্রথম স্ল্যাঙে দৃষ্টি দূরে সরানো হয়েছে, তার পরেরটায় দৃষ্টি আর্কষণ করা হয়েছে, তাই তো বোঝায়? নাকি?'

'দূর!' ঠকাস করে পাইপটা টেবিলে নামিয়ে রাখল মুসা। 'মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে আমার।'

'মুসা, পাইপটা কোথায় পেয়েছ?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'কেন জানো না?' মুসা অবাক। 'গোরস্থানে। ডিংকি তুলে ছুঁড়ে ফেলেছিল।'

ঝট করে পাইপটার দিকে চোখ চলে গেল রবিনের।

খাঁচার ভেতরে অযথাই ডানা ঝাপটাল একবার ব্ল্যাকবিয়ার্ড।

'এটা দিয়েই খিঁচেছিলাম জনাব টমাস মিয়াকে,' হেসে রবিনকে বলল মুসা।

'ওই একই জায়গায় পাওয়া গেছে, যেখানে বাক্সটা পাওয়া গেছে,' মুসার কথা কানেই ঢুকছে না যেন কিশোরের।

'এবং এটা সীসার পাইপ,' যোগ করল রবিন।

চোখ বড় বড় হয়ে যাচ্ছে মুসার।

'এবং,' রবিনের কথার সঙ্গে যোগ করল কিশোর, 'সীসার পাইপ আজকাল খুব রেয়ার, কেউ ব্যবহার করে না। মাথায় দেখো, ক্যাপ লাগান রয়েছে। ভেতরের জিনিস সহজে নষ্ট হবে না।

'তালাও নেই,' থাবা দিয়ে পাইপটা তুলে নিল মুসা। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খুলতে শুরু করল ক্যাপ। এই প্রথম খেয়াল করল, পাইপটা চোদ্দ ইঞ্চির মত লম্বা।

ক্যাপটা টেবিলে রেখে পাইপের ভেতরে আঙুল ঢুকিয়ে দিল মুসা। টেনে বের করে আনল গোল করে পাকানো এক টুকরো ক্যানভাস।

খুলে টেবিলে বিছাল।

হাঁ হয়ে গেল তিন গোয়েন্দা।

চোদ্দ বাই চব্বিশ ইঞ্চি ক্যানভাসের টুকরো। তাতে আঁকা রয়েছে অপরূপ সুন্দরী এক কিশোরী, মধ্যযুগীয় মেষপালিকার পোশাক পরনে, এক মেষশিশুর ভাঙা পায়ের পরিচর্যা করছে। ছবি সম্পর্কে তেমন কোন ধারণা নেই ওদের, তবু স্বীকার না করে পারল না, অপূর্ব! দক্ষ শিল্পীর তুলির ছোঁয়ায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে, যেন এখুনি ভেড়ার বাচ্চা কোলে তুলে নিয়ে নাচতে নাচতে চলে যাবে মেয়েটা।

মাস্টারপীস, কোন সন্দেহ নেই।

'রামধনুর এক টুকরো,' বিড়বিড় করল কিশোর, 'এক পাত্র সোনা। ঠিকই বলেছে জন সিলভার। এত অল্প কথায় এর চেয়ে ভাল বর্ণনা আর হয় না।'

ঘুম পাতলা হয়ে এসেছিল বোধহয় ময়নার, জন সিলভার নামটা কানে যেতেই ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল। বার দুই ডানা ঝাপটে বলল, 'আমি জন সিলভার। কি সুন্দর ছবি, আহা!' খুক খুক করে কাশল কয়েকবার, যেন ভারি হয়ে কফ জড়িয়ে গেছে গলায়। তারপর আবার ঠোঁট গুঁজল পালকের তলায়, ঘুমিয়ে গেল।

তিন গোয়েন্দার মনে হলো, ব্ল্যাকবিয়ার্ড নয়, কথাগুলো বলল স্বয়ং জন সিলভার।

আঠারো।

দুই দিন পর। বিখ্যাত চিত্রপরিচালক মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারের অফিসে ঢুকল তিন গোয়েন্দা।

খবরের কাগজ পড়ছেন পরিচালক। ইঙ্গিতে ছেলেদেরকে চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে আবার পড়ায় মন দিলেন।

পড়া শেষ হলে কাগজটা ভাঁজ করে রেখে দিলেন। 'হুঁ। পত্রিকার খবর হয়ে গেছ দেখছি। ছবিও ছাপা হয়েছে।'

ফাইলটা পরিচালকের দিকে ঠেলে দিল রবিন।

টেনে নিয়ে খুললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। পাতা উল্টে চললেন একের পর এক।

ঘরে পিনপতন নীরবতা। অপেক্ষা করে আছে ছেলেরা।

ফাইল পড়া শেষ করলেন পরিচালক। ঘড়ি দেখলেন। 'আজকে সময় খুব কম। জরুরী কাজ আছে। সংক্ষেপে কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দাও তো। কাকাতুয়াগুলো কি করেছ?'

'বিলি শেকসপীয়ার আর লিটল বো-পীপকে যার যার মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছি,' জবাব দিল কিশোর। 'অন্যগুলোর তো মালিক নেই, হাইমাসের স্ত্রীকে নিতে বলেছি, রাজি হয়নি। ভাবছি মিস কারমাইকেলের পাখির আশ্রমেই দিয়ে আসব।'

'হ্যাঁ, সেই ভাল হবে,' একমত হলেন পরিচালক। 'তা হাইমাসের খবর কি? তার অসুখ?'

'পুরোপুরি ভাল হয়নি এখনও,' রবিন বলল। 'আরও কয়েক দিন লাগবে।'

'মিসেস হাইমাস তোমাদের এক হাজার ডলার দিয়েছে?'

'দুই হাজার দিয়েছে। এত দামী ছবি খুঁজে পাওয়ার খুশিতে আত্মহারা মহিলা,' বলল কিশোর।

'খুব ভাল। অনেক টাকা। আচ্ছা, ডিয়েগো আর তার চাচার কি খবর?'

'দুই হাজার ডলারই মিস্টার স্যানটিনোকে দিয়ে দিয়েছি আমরা,' বলল কিশোর। 'টাকাটা তো আসলে তারই প্রাপ্য। জন সিলভারকে আশ্রয় দিয়েছিল, খাইয়েছিল। কবর দিয়েছিল। এই কেসে যে আনন্দ আমরা পেয়েছি, আমরা তাতেই খুশি।'

এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন পরিচালক। মনে মনে বোধহয় প্রশংসা করছেন ছেলেদের। 'স্যানটিনো কোথায়?'

'মেকসিকো চলে গেছে, বাড়িতে। অনেক টাকা পেয়েছে, ওখানে গিয়ে ফুলের বাগান করতে পারবে। কাশির চিকিৎসাও করাতে পারবে,' বলল কিশোর।

'আর ডিয়েগো?'

'ও-তো মহাখুশি, স্যার,' বলে উঠল মুসা। 'অটো কোম্পানিতে গিয়েছিলাম আমরা তিনজনে। ম্যানেজারকে অনুরোধ করতেই রাজি হয়ে গেল। ডিয়েগোকে অ্যাপ্রেনটিস হিসেবে নিয়ে নিয়েছে। মনের মত কাজ পেয়ে ডিয়েগো খুশির ঠেলায় রোজ দশবার করে ফোন করে আমাদের।'

'ভাল হয়েছে। গাড়ির জগতে যুগান্তকারী কিছু করে বসলেও অবাক হব না। মেধা আছে।...তো, কিছু খাবে? আইসক্রীম...'

'না না, আপনার তাড়া আছে বললেন,' তাড়াতাড়ি হাত তুলল কিশোর। 'আরেকদিন। আজ যাই।'

'ঠিক আছে, এসো। গুড বাই,' ইন্টারকমের সুইচ টিপলেন তিনি, সেক্রেটারিকে জরুরী নির্দেশ দেয়ার জন্যে।

দরজার কাজে চলে এসেছে তিন গোয়েন্দা, পেছন থেকে ডাকলেন পরিচালক, 'কিশোর?'

ফিরে তাকাল তিনজনেই।

'এনথনি শোঁপাই ফ্রান্সের আধুনিক রবিন হুড,' বললেন তিনি। 'মহাপুরুষ হওয়ার মত অনেক গুণ আছে তাঁর। তাঁর উপদেশ মনে রেখো।'

'রাখব, স্যার,' একই সঙ্গে মাথা কাত করল তিন গোয়েন্দা।

****

প্রথম প্রকাশ ঃ এপ্রিল, ১৯৮৮

বড় ম্যাপটা ভাঁজ করে পকেটে রাখতে রাখতে বলল কিশোর পাশা, 'হ্যাঁ, যা চাই সবই আছে। বিশাল প্রান্তর, জলাভূমি, পাহাড়, জঙ্গল, মাঝে মাঝে ছোট খামার, বাড়ি-ঘর। কয়েকটা সরাইখানাও আছে। কাঁচা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাব আমরা। রাফিয়ানের খুব মজা হবে।'

'ওর তো পোয়াবারো,' বলল পাশে বসা মুসা আমান। 'শুনেছি, অনেক খরগোশ আছে ওদিকে। হরিণও।'

খোলা জানালা দিয়ে হু-হু করে বাতাস আসছে, কোঁকড়া লম্বা চুল উড়ছে কিশোরের। বার বার এসে পড়ছে কপালে, চোখেমুখে, সরাতে হচ্ছে। মুসার সে ঝামেলা নেই, খাটো করে ছাঁটা চুল, খুলি কামড়ে রয়েছে যেন।

গাঁয়ের দিকে ছুটে চলেছে বাস।

'স্কুল পালিয়েছ বুঝি?' টিকিট বাড়িয়ে দিয়ে হাসল কণ্ডাকটার।

'হ্যাঁ, তা বলতে পারেন,' মাথা কাত করল মুসা। 'শহরের গ্যাঞ্জাম আর ভাল্লাগছিল না, স্কুলও ছুটি। পালিয়ে এসেছি।'

শেষ স্টপেজে থামল বাস। আর সামনে যাবে না। বাস বদলাতে হবে।

সামনের দরজা দিয়ে নামল কিশোর আর মুসা। পেছনের দরজা দিয়ে রবিন, জিনা আর রাফিয়ান।

বদলানো বাসের যাত্রাও শেষ হলো। কিশোরকে বলল কণ্ডাকটার, 'শেষ। এবার ফিরে যাব।...তা কোথায় যাবে তোমরা? টিংকার ভিলেজ?'

নামল পাঁচ অভিযাত্রী।

ছড়ানো সবুজ মাঠ, ছোট্ট পুকুরে হাঁস, মেঘের ছায়া।

আনন্দে পাগল হয়ে উঠল রাফিয়ান। চার বন্ধুকে ঘিরে নাচানাচি করছে, ছুটে গিয়ে এক দৌড়ে ফিরে আসছে আবার। লাফাচ্ছে। ঘেউ ঘেউ করছে হাঁসের দিকে চেয়ে। ঘ্যাঁত ঘ্যাঁত করে তাকে ধমক দিল মস্ত এক রাজহাঁস।

'খাবার-টাবার কিছু কিনে নেয়া দরকার,' বলল কিশোর।

একটা দোকান দেখিয়ে জিনা বলল, 'চলো না, গিয়ে দেখি, কি পাওয়া যায়।'

'আরে, আরে!' ভেতরের আরেকটা ঘর থেকে দরজায় বেরিয়ে এসেছেন এক মহিলা, দোকানের মালিক, 'কুত্তাটাকে ঢুকিয়েছ কেন? আরে কেমন লাফাচ্ছে। পাগলা নাকি? বের করো, বের করো।'

'না না, পাগল না,' হেসে বলল জিনা। 'বেশি খুশি। খাওয়ার গন্ধ পেয়েছে তো।'

'অ। তাই বলো। তা কিছু মনে কোরো না। খাবারের দোকান, পরিষ্কার

রাখি। ওটাকে বাইরে রেখে এসো, প্লীজ।'

'এই রাফি, আয়,' কুকুরটার গলার বেল্ট ধরে টেনে নিয়ে চলল কিশোর। 'তুই বাইরেই থাক। আমরাই আনতে পারব সব।'

কাউন্টারের পেছনে একটা তাক দেখিয়ে বলল মুসা, 'বাহ্, দারুণ তো দেখতে। টেস্টও খুব ভাল হবে মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, ভাল,' বললেন মহিলা। 'আমি বানিয়েছি। আমার ছেলে স্যাণ্ডউইচ খুব পছন্দ করে। এই তো, আসার সময় হয়ে এল তার। গ্রীন ফার্মে কাজ করে।'

'আমাদের কয়েকটা বানিয়ে দিতে পারবেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'চিনি না জানি না, কোথায় আবার কোন গাঁয়ে গিয়ে খুঁজব। লাঞ্চের ব্যবস্থা সঙ্গেই নিয়ে যেতে চাই।'

'হ্যাঁ, তা পারব। কি কি নেবে? পনির, ডিম, শুয়োর, গরু?'

'শুয়োর বাদে আর সবই দিন। চারটে কোক দেবেন?'

'নাও না, নিয়ে খাও,' বললেন মহিলা। 'ওই যে গেলাস।'

'আচ্ছা। আর হ্যাঁ, ভাল পাঁউরুটিও দেবেন।'

'খারাপ জিনিস আমি বানাই না। তোমরা কোক খাও। কেউ এলে ডেকো।' ভেতরের ঘরে চলে গেলেন আবার মহিলা।

'ভালই হলো,' বন্ধুদের দিকে ফিরে বলল কিশোর। 'খাওয়ার ভাবনা না থাকলে নিশ্চিন্তে ঘুরতে পারব। আজ একদিনেই অনেক জায়গা দেখা হয়ে যাবে।'

'কতগুলো লাগবে?' হঠাৎ দরজায় দেখা দিলেন মহিলা। 'আমার ছেলে এক বেলায়ই ছটা স্যাণ্ডউইচ খেয়ে ফেলে। বারো টুকরো রুটি লাগে বানাতে।

'অ্যাঁ...আমাদের একেকজনের জন্যে আটটা করে বানান,' মহিলার চোখ বড় বড় করে দিল কিশোর। 'পাঁচ-আটে চল্লিশটা। সারা দিন চলে যাবে আমাদের।'

মাথা ঝাঁকিয়ে আবার অদৃশ্য হয়ে গেলেন মহিলা।

'ভারি কাজ দিয়ে ফেলেছি,' সহানুভূতির সুরে বলল রবিন। মাকে বেশি খাটতে দেখলে কষ্ট লাগে তার, নিজেও গিয়ে সাহায্য করে। 'আটটা স্যাণ্ডউইচ তারমানে ষোলোটা করে রুটির টুকরো, পাঁচ-ষোলো আশি...নাহ্, ভাবতেই খারাপ লাগছে,' রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকতে ইচ্ছে হলো তার। কিন্তু মহিলা আবার কিছু মনে করে বসেন ভেবে গেল না।

'আরে অত ভেব না,' প্রথমে এক চুমুকে আধ গেলাস কোকাকোলা খালি করেছে মুসা, আরেক চুমুকে বাকিটা শেষ করে ঠকাস করে গেলাস নামিয়ে রাখল টেবিলে। 'দেখো, কে আসছে।'

দরজার বাইরে সাইকেল থেকে নামল লম্বা এক লোক, হ্যাণ্ডেল ধরে রেখেই ডাকল, 'মা?'

কে লোকটা, চিনিয়ে দিতে হলো না। ওরা বুঝল, মহিলার ছেলে, যে গ্রীন ফার্মে কাজ করে। খেতে এসেছে।

'আপনার মা ভেতরে,' বলল মুসা। 'ডাকব?'

'থাক।' সাইকেল রেখে ভেতরে ঢুকল লোকটা, তাক থেকে স্যাণ্ডউইচগুলো

একটা প্যাকেটে নিয়ে আবার রওনা দিল। দরজার কাছে গিয়ে চেয়ে বলল, 'মাকে বোলো, আমি নিয়ে গেছি। তাড়াহুড়ো আছে। ফিরতেও দেরি হবে। কিছু জিনিস নিয়ে যেতে হবে জেলে।'

জোরে জোরে প্যাডাল ঘুরিয়ে চলে গেল লোকটা।

হঠাৎ দরজায় উদয় হলেন আবার মহিলা, হাতে ইয়া বড় এক রুটি কাটার ছুরি। আরেক হাতে রুটি। 'ডিকের গলা শুনলাম···ও-মা, স্যাণ্ডউইচও নিয়ে গেছে। ডাকোনি কেন?'

'তাড়াহুড়ো আছে বলল,' জানাল কিশোর। 'ফিরতেও নাকি দেরি হবে আজ। কি নাকি নিয়ে যেতে হবে জেলে।'

'আমার আরেক ছেলে আছে জেলখানায়।'

মহিলার কথায় এক সঙ্গে তার দিকে ঘুরে গেল চার জোড়া চোখ। জেলখানায়? কয়েদী? কোন্ জেলে?

ওদের মনের কথা বুঝে হাসলেন মহিলা। 'না না, রিক কয়েদী নয়। ওয়ারডার। খুব ভাল ছেলে আমার। ওর চাকরিটা আমার মোটেই ভাল্লাগে না। চোর-ডাকাতের সঙ্গে বাস, কখন কি হয়!'

'হ্যাঁ, ম্যাপে দেখলাম,' বলল কিশোর। 'বড় একটা জেলখানা আছে এদিকে। আমরা ওটার ধারে-কাছেও যাব না।'

'না, যেয়ো না,' মহিলাও হুঁশিয়ার করলেন, ঢুকে গেলেন ভেতরে।

দাঁড়িয়ে আছে ছেলেরা। অনেকক্ষণ। মাত্র একজন খরিদ্দারের দেখা পেল। বিষণ্ণ চেহারার এক বৃদ্ধ, পাইপ টানতে টানতে ঢুকল। দোকানের চারদিকে তাকিয়ে মহিলাকে খুঁজল। তারপর এক প্যাকেট পাউডার নিয়ে পকেটে ঢোকাল। কিশোর লক্ষ করল, পাউডারটা পাঁচড়ার ওষুধ।

পকেট থেকে পয়সা বের করে কাউন্টারে ফেলল লোকটা। পাইপ দাঁতে কামড়ে ধরে রেখেই বলল, 'মহিলাকে বোলো, নিয়ে গেলাম,' বেরিয়ে গেল সে।

লোকটার গায়ে-কাপড়ে দুর্গন্ধ, কদিন গোসল করে না, কাপড় ধোয় না কে জানে। বুড়োর ভাবভঙ্গি আর গন্ধ কোনটাই পছন্দ হলো না রাফিয়ানের, চাপা গোঁ গোঁ করে উঠল।

অবশেষে স্যাণ্ডউইচ তৈরি শেষ হলো। বেরিয়ে এলেন মহিলা। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। সুন্দর করে প্যাকেট করে দিলেন সব খাবার, প্রতিটি প্যাকেটের ওপর পেনসিল দিয়ে লিখে দিলেন কোনটাতে কি আছে। পড়ে, অন্যদের দিকে চেয়ে চোখ টিপল মুসা, ঝকঝকে সাদা দাঁত আর একটাও লুকিয়ে নেই, বেরিয়ে পড়েছে হাসিতে। 'খাইছে! আল্লাহরে, নিশ্চয় কোন পুণ্য করে ফেলেছিলাম। এত খাবার?··· আরে, ওটাতে কি?'

'ফ্রুট কেক,' হেসে বললেন মহিলা। 'বেশি নেই, চার টুকরো ছিল। দিয়ে দিলাম। ফাউ। পয়সা লাগবে না। খেয়ে ভাল লাগলে ফেরার পথে জানিয়ে যেয়ো।'

অনেক চাপাচাপি করেও কেকগুলোর জন্যে পয়সা দিতে পারল না কিশোর। কাউন্টারের দিকে চোখ পড়তেই বললেন, 'পয়সা এল কোত্থেকে?'

বলল কিশোর।

'ও, রিকেট বুড়ো,' মাথা দোলালেন মহিলা। 'ঠিক আছে, তোমাদের যাত্রা শুভ হোক। ফেরার পথে দেখা করে যেয়ো। আর, খাবারের দরকার পড়লেই চলে এসো এখানে।'

'ঘাউ!' মহিলার কথা বুঝেই যেন সায় জানিয়ে মাথা ঝাঁকাল রাফিয়ান, দরজার বাইরে থেকে।

'ও, তুই। ভুলেই গিয়েছিলাম।' রান্নাঘর থেকে বেশ বড় এক টুকরো হাড় এনে ছুঁড়ে দিলেন কুকুরটার দিকে।

মাটিতে আর পড়তে পারল না। শূন্যেই লুফে নিল রাফিয়ান।

মহিলাকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এল ওরা।

দুই

আহ, ছুটির কি আনন্দ! অনেক পেছনে ফেলে এসেছে স্কুল। অক্টোবরের রোদে উষ্ণ আমেজ। শরতের রঙে রঙিন হয়ে উঠেছে প্রকৃতি, গাছে গাছে হলুদ, লাল, সোনালি রঙের সমারোহ। রোদে যেন জ্বলছে। জোরে বাতাস লাগলে বোঁটা থেকে খসে যাচ্ছে মরা পাতা, ঢেউয়ে নৌকা যেমন দোলে, তেমনি দুলতে দুলতে নামছে মাটিতে।

ছোট্ট যে গাঁয়ে বাস থেকে নেমেছিল ওরা, সেটা পেছনে ফেলে এল। খুব ভাল লাগছে হাঁটতে। আঁকাবাঁকা সরু পথে নেমেছে এখন। দু-ধারে পাতাবাহারের ঝাড় এত ঘন হয়ে জন্মেছে, আর এত উঁচু, ওপর দিয়ে দেখা যায় না ওপাশে কি আছে। মাথার ওপরে ডালপাতা দু-পাশ থেকে এসে গায়ে গায়ে লেগে চাঁদোয়া তৈরি করে দিয়েছে, তার ফাঁক-ফোকর দিয়ে চুঁইয়ে আসছে যেন আলো।

'এ-তো দেখি একেবারে সুড়ঙ্গ,' বলল মুসা। 'নাম কি জায়গাটার?'

'এটার নাম কি ঠিক বলতে পারছি না,' বলল কিশোর। 'তবে এটা হরিণ পাহাড়ে চলে গেছে।'

'হরিণ পাহাড়?' ভুরু কোঁচকাল রবিন।

'ডিয়ার হিল। বাংলা করলে হরিণ পাহাড়ই দাঁড়ায়, নাকি?'

'হ্যাঁ, তা হয়,' তার বাংলা শব্দের সীমিত ভাণ্ডার খুঁজল রবিন। 'শুনতেও ভাল লাগছে।'

'এখানের নামগুলোই সুন্দর। অন্ধ উপত্যকা, হরিণ পাহাড়, কুয়াশা হ্রদ, হলুদ দীঘি, ঘুঘুমারি...'

'ওফ্, দারুণ তো!' বলে উঠল জিনা। 'অরিজিনাল নামগুলো কি?'

'ব্লাইণ্ড ভ্যালি, ডিয়ার হিল, মিসটি লেক, ইয়েলো পণ্ড, ডাভ ডেথ...'

'অপূর্ব!' বলল রবিন। 'বাংলা ইংরেজি দুটোই।'

'বাংলাটাই থাক না তাহলে?' দ্বিধা করছে কিশোর, যার যার মাতৃভাষা তার কাছে প্রিয়, বন্ধুরা আবার কি মনে করে। 'বাইরের কারও সঙ্গে বলার সময়

ইংরেজিই বলতে হবে, আমরা নিজেরা নিজেরা…'

'আমি রাজি। আমার কাছে বাংলাই ভাল লাগছে,' সঙ্গে সঙ্গে বলল মুসা। 'নিজের ভাষা কিছু কিছু জানি, কিন্তু সেটা না জানারই শামিল, বাংলার চেয়েও কম জানি। সেই কবে কোন কালে আফ্রিকা ছেড়ে চলে এসেছিল আমার দাদার দাদা…ভুল বললাম, চলে আসেনি, জোর করে ধরে আনা হয়েছিল, গোলাম করে রাখার জন্যে…শ্বেতাঙ্গরা…'

আড়চোখে জিনার দিকে চেয়ে তাড়াতাড়ি হাত তুলল কিশোর, 'থাক থাক, পুরানো ইতিহাস ঘাঁটাঘাঁটির দরকার নেই, ঝগড়া লেগে যাবে এখন। ছুটির আনন্দই মাটি হবে। হ্যাঁ, যা বলছিলাম…'

কথা বলতে বলতে এগোচ্ছে ওরা।

হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল রাফিয়ান। খরগোশের গন্ধ পেয়েছে।

'আরিব্বাপরে!' জিন অবাক। 'এত্তো খরগোশ! এই দিনের বেলায়? আমার গোবেল দ্বীপেও তো এত নেই।'

হরিণ পাহাড়ে এসে উঠল ওরা। বসল, খরগোশ দেখার জন্যে। রাফিয়ানকে নিয়ে হয়েছে মুশকিল, কিছুতেই আটকে রাখা যাচ্ছে না। খরগোশের গন্ধে পাগল হয়ে গেছে যেন সে। এক ঝাড়া দিয়ে জিনার হাত থেকে বেল্ট ছুটিয়ে নিয়েই দিল দৌড়।

'রাফি! রাফি !' চেঁচিয়ে উঠল জিনা।

কিন্তু কে শোনে কার কথা? রাফিয়ানের কানেই ঢুকল না যেন ডাক, তার এক চিন্তা, খরগোশ ধরবে।

এত বোকা নয় খরগোশেরা যে চুপচাপ বসে থেকে কুকুরের খপ্পরে পড়বে। সুড়ুৎ করে ঢুকে গেল গর্তে। ভোজবাজির মত, এই ছিল এই নেই।

অনেক চেষ্টা করেও একটা খরগোশ ধরতে পারল না রাফিয়ান। তার কাণ্ড দেখে হেসে গড়াগড়ি খেতে লাগল মুসা আর জিনা।

অবশেষে হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল ব্যর্থ রাফিয়ান, জিভ আধহাত বেরিয়ে পড়েছে।

'ভুল নাম রেখেছে,' বলল রবিন। 'নাম রাখা উচিত ছিল আসলে খরগোশ পাহাড়। চলো, উঠি।'

চূড়া পেরিয়ে পাহাড়ের উল্টোদিকের ঢাল ধরে নামতে শুরু করল ওরা। এদিকে খরগোশ যেন আরও বেশি। রাফিয়ান বোধহয় ভাবল, অন্যপাশের চেয়ে এপাশের ওরা বোকা, তাই আবার তাড়া করল।

সেই একই কাণ্ড। সুড়ুৎ।

রেগে গেল রাফিয়ান। গর্তে ঢোকা? দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা। বড় একটা খরগোশকে বাইরে দেখে তাড়া করল। খরগোশটাও সেয়ানা। এঁকেবেঁকে এপাশে ওপাশে লাফিয়ে লাফিয়ে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল বড় একটা গর্তের ভেতর।

কোন রকম ভাবনাচিন্তা না করেই মাথা ঢুকিয়ে দিল রাফিয়ান, ঢুকে গেল গর্তে। তারপরই পড়ল বিপদে। আটকে গেল শরীর। না পারছে ঢুকতে, না বেরোতে।

অসহায় ভাবে পেছনের পা ছুঁড়তে লাগল শুধু।

'আরে!' দৌড় দিল জিনা। 'এই রাফি, রাফি, বেরিয়ে আয়। আয় জলদি।'

বেরোতে পারলে তো বাঁচে এখন রাফিয়ান, জিনার ডাকের কি আর অপেক্ষা করে? কিন্তু পারছে তো না। পেছনের পায়ের নখ দিয়ে আঁচড়ে ধুলোর ঝড় তুলেছে, বেরোনোর চেষ্টায়।

পুরো বিশ মিনিট লাগল রাফিয়ানকে বের করে আনতে। প্রথমেই গর্তে ঢোকার চেষ্টা করল মুসা। তার বিরাট শরীর ঢুকল না। কিশোর আর জিনাও ঢুকতে পারল না। রোগা-পটকা ক্ষীণ দেহ একমাত্র রবিনের, তাকেই মাথা ঢোকাতে হলো অবশেষে।

রাফিয়ানের পেছনের পা ধরে টানতে লাগল রবিন, তার অর্ধেক শরীর গুহার বাইরে, অর্ধেক ভেতরে। কুকুরটার কাঁধের পেছন দিক আটকে গেছে একটা মোটা শেকড়ে, টেনেও বের করা যাচ্ছে না। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল।

'আহ্, এত জোরে টেনো না,' চেঁচিয়ে উঠল জিনা। 'ব্যথা পাচ্ছে তো।'

'জোরে টেনেও তো বের করতে পারছি না,' গর্তের ভেতর থেকে চেঁচিয়ে জবাব দিল রবিন। 'জোর পাচ্ছি না। আমার পা ধরে টানো।

অনেক টানা-হেঁচড়ার পর বের করা গেল অবশেষে। বিধ্বস্ত চেহারা, কুঁইকুঁই করে গিয়ে জিনার পায়ের কাছে গড়িয়ে পড়ল রাফিয়ান। খুব ভয় পেয়েছে বেচারা।

'সাংঘাতিক ব্যথা পেয়েছে কোথাও,' কুকুরটার সারা গা টিপেটুপে দেখতে শুরু করল জিনা। চারটে পা-ই টেনে টেনে দেখল। ভাঙেনি। জখমও দেখা যাচ্ছে না। 'ব্যথা পেয়েছেই। নইলে এমন কোঁ কোঁ করত না। কিন্তু লাগল কোথায়?'

'ভয়ে অমন করছে,' কিশোর বলল। 'জখম থাকলে তো দেখতামই। পা-ও ভাঙেনি।'

কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারল না জিনা। 'পশু ডাক্তারকে দেখালে হয় না?'

'এখানে পশু ডাক্তার পাবে কোথায়? খামোকা ভাবছ। রাফিয়ান ঠিকই আছে। চলো, হাঁটি।'

ঘুঘুমারিও পেরিয়ে এল ওরা। আলাপ-আলোচনা আর হাসিঠাট্টা তেমন জমছে না। গুম হয়ে আছে জিনা। বার বার তাকাচ্ছে পাশে রাফিয়ানের দিকে। কোন অসুবিধে হচ্ছে কিনা বোঝার চেষ্টা করছে।

ব্যথা পেয়েছে, এমন কোন ভাব দেখাচ্ছে না রাফিয়ান, ঠিকমতই হাঁটছে, মাঝে মাঝে গুঙিয়ে উঠছে শুধু।

'এখানেই লাঞ্চ সারা যাক, কি বলো?' আরেকটা পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'হ্যাঁ, তা যায়,' মাথা কাত করল মুসা। 'নাম কি এটার?'

'ম্যাপে কোন নাম নেই। তবে আমি রাখতে পারি···ঢালু পাহাড়? খুব মানাবে। দেখেছ, কেমন ঢালু হয়ে নেমে গেছে অনেক দূর···' স্বপ্নিল হয়ে উঠেছে কিশোরের অপূর্ব সুন্দর দুই চোখ।

ভাল লাগার মতই দৃশ্য। মাইলের পর মাইল একটানা ছড়িয়ে রয়েছে বিশাল

নিঃসঙ্গ প্রান্তর, ঘন সবুজ ঘাস চকচক করছে রোদে। তাতে চরছে লাজুক হরিণ আর উদ্দাম ছোট ছোট বুনো ঘোড়া। যেন পটে আঁকা ছবি।

বসে পড়ল ওরা ঘাসের গুচ্ছের নরম কার্পেটে।

'অবারিত মাঠ গগন ললাট চুমে তব পদধূলি, ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলি,' দিগন্তের দিকে চেয়ে বিড়বিড় করল কিশোর, মন চলে গেছে তার হাজার হাজার মাইল দূরের আরেক স্বপ্নরাজ্যে, তার স্বপ্নের বাংলাদেশে। সেই দেশটাও কি এত সুন্দর, ভাবল সে, কবিতা পড়ে তো মনে হয় এর চেয়েও সুন্দ ।

'দেশটা সত্যি ভারি সুন্দর,' কিশোরের মতই দূরে তাকিয়ে রয়েছে রবিন। এই সবুজ একদিন ঢেকে যাবে ধবধবে সাদা বরফে, তুষার ঝরবে পেঁজা তুলোর মত, আকাশের মুখ অন্ধকার, মেরু থেকে ধেয়ে আসবে হাড় কাঁপানো কনকনে ঠাণ্ডা...'

'ওদিকে স্যাণ্ডউইচগুলো তো কাঁদতে শুরু করেছে, খাচ্ছি না বলে,' বেরসিকের মত বাধা দিল মুসা। 'কাব্যচর্চা রেখে আগে পেটচর্চা সেরে নাও। আরে এই জিনা, এত গম্ভীর হয়ে আছো কেন? তোমার মুখ কালো দেখলে তো আমার বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে...'

অন্য সময় হলে কথার-করাত চালাত জিনা, এখন শুধু মাথা নাড়ল। 'রাফি...'

'দূর, তুমি খামোকা ভাবছ। কিচ্ছু হয়নি। দেখো, একটু পরেই ঠিক হয়ে যাবে। পেটে বোধহয় খিদে...দেখছ না আমার কেমন খারাপ লাগছে? ওরও বোধহয় তেমনি...'

মুসার কথায় হেসে ফেলল জিনা। অন্যদের মুখেও হাসি ফুটল।

'হুঁ,' সমঝদারের ভঙ্গিতে মাথা দোলাল মুসা, 'দারুণ হয়েছে। ডিকের মায়ের হাতে যাদু আছে। নে, রাফি, এই কাবাবটা চেখে দেখ।'

কাবাব চিবাতে চিবাতে আস্তে মাথা নাড়ল রাফিয়ান, গোঁ করে উঠল। ব্যথায়, না কেন, সে-ই জানে। কিন্তু এটাকেই সম্মতি ধরে নিয়ে মুসা হাসল, 'কি, বলেছি না ভাল?'

সবার চেয়ে অনেক বেশিই খেলো রাফিয়ান, তবে চুপচাপ রয়েছে। এই ব্যাপারটাই ভাল লাগছে না জিনার।

একেক জনের ভাগে তিনটে করে স্যাণ্ডউইচ বাঁচল। আর অর্ধেক টুকরো করে কেক। বাকি সব সাবাড় করে ফেলেছে।

'ডিকের চেয়ে কম কি আমরা?' ভুরু নাচাল মুসা। 'ও ছ-টা খায়, আমরা পাঁচটা...'

'তুমি সাতটা খেয়েছ,' শুধরে দিল রবিন। 'নিজেদেরগুলো সেরেও আমাদের ভাগ থেকে মেরেছ তুমি আর রাফি...'

'ঘউ,' করে স্বীকার করল যেন রাফিয়ান। কেকের টুকরোর দিকে চেয়ে লেজ নাড়ছে। জিভে লালা। তাকে কেক দেয়া হয়নি।

'বলেছিলাম না, খেলেই ভাল হয়ে যাবে রাক্ষসটা,' হেসে বলল মুসা। 'নে খা, তুই আমার কাছ থেকেই নে...' খানিকটা কেক ভেঙে কুকুরটার মুখের কাছে

ফেলল।

এক চিবান দিয়েই কোঁত করে গিলে ফেলল রাফিয়ান। করুণ চোখে তাকাল মুসার হাতের বাকি কেকটুকুর দিকে।

তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিল মুসা। 'না বাবা, আর দিচ্ছি না। রাতে খেতে হবে আমার। তুমি বাপু যত পাও ততই চাও...'

হাসল সবাই। কেটে গেল নিরানন্দ ভাবটা।

'চলো, ওঠা যাক,' বলল কিশোর। 'পাঁচটার আগেই ফার্মটায় পৌঁছতে হবে। এখানে আবার তাড়াতাড়ি রাত নামে।'

'কোন ফার্ম?' জানতে চাইল রবিন।

'হলুদ দীঘি।'

'যদি থাকার জায়গা না থাকে?'

'জিনাকে একটা ঘর দিতে পারলেই হলো। আমরা গোলাঘরে খড়ের গাদায়ই ঘুমোতে পারব।'

'কেন, আমি পারব না কেন?' গলা লম্বা করে ঝাঁকি দিল জিনা।

'কারণ, তুমি মেয়ে। ছেলের পোশাক পরে আছো বটে, কিন্তু মেয়ে তো।'

'দেখো, মেয়ে মেয়ে করবে না। মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে কম কিসে?'

'তাহলে ছেলে সেজে থাকো কেন?' ফস করে বলে বসল মুসা।

'থাকি, থাকি, আমার খুশি,' রেগে উঠল জিনা। 'তোমার কি?'

'এই তো রেগে গেল,' বিরক্ত হয়ে উঠল কিশোর। 'তোমাদের জ্বালায় বাপু শান্তিতে পরামর্শ করারও জো নেই। জিনা, খামাকো জেদ করছ। তুমি মেয়ে, কিছু অসুবিধে তোমার আছে, ছেলেদের যা নেই। এটা কি অস্বীকার করতে পারবে?'

চুপ করে রইল জিনা। মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে। তবে আর তর্ক করল না। আরেক দিকে মুখ ফিরিয়ে রাখল।

মালপত্রের বোঝা পিঠে তুলে নিয়ে আবার রওনা হলো ওরা। রাফিয়ান শান্ত। লাফঝাঁপ সব যেন ভুলে গেছে, জোরে হাঁটার চেষ্টাও করছে না। পা ফেলছে অতি সাবধানে, মেপে মেপে।

ব্যাপারটা জিনার চোখ এড়াল না। 'কি হয়েছে রাফি? খারাপ লাগছে?'

জবাবে শুধু কাঁউ করল কুকুটা।

আরও খানিক দূর যাওয়ার পর খোঁড়াতে শুরু করল রাফিয়ান। পেছনের বাঁ পা ঠিকমত ফেলতে পারছে না।

থামল সবাই।

বসে পড়ে পা-টা ভালমত দেখল জিনা। 'মনে হয় মচকেছে,' রাফিয়ানের পিঠে হাত বোলাল সে।

মৃদু গাঁউক করে উঠল রাফিয়ান।

যেখানে হাত লাগলে ব্যথা পায় কুকুরটা, সে জায়গার রোম সরিয়ে দেখল জিনা। 'আরে, যখম! রক্ত জমেছে, ফুলেছেও। ওইটানাটানির সময়ই লেগেছিল।'

'দেখি তো,' বসে পড়ে কিশোরও দেখল। 'না, বেশি না। সামান্য। রাতে

ঘুমোলেই সেরে যাবে।'

'কিন্তু শিওর হওয়া দরকার,' খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে জিনাকে। 'কিশোর, গ্রাম আর কদ্দুর?'

'এই সামনেই। র‍্যাংকিন ভিলেজ। গাঁয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করব, পশু ডাক্তার কোথায় পাওয়া যাবে।'

'জলদি চলো। ইস্, কেন যে এত বড় হলো কুকুরটা, নইলে কোলে করেই নিতে পারতাম। হাঁটতেই পারছে না বেচারা।'

'যা পারে হাঁটুক এখন,' বলল মুসা। 'একেবারে না পারলে তো বয়ে নিতেই হবে। সে তখন দেখা যাবে।'

খুব আস্তে আস্তে হাঁটছে রাফিয়ান। বেশি খোঁড়াচ্ছে। শেষে আর পা-ই ফেলতে পারল না। মচকানো পা-টা তুলে তিন পায়ে লাফিয়ে এগোল।

'ইস্, কি কষ্ট বেচারার···' কেঁদে ফেলবে যেন জিনা।

র‍্যাংকিন ভিলেজে এসে ঢুকল বিষণ্ণ দলটা। গাঁয়ের ঠিক মাঝখানে একটা সরাইখানা, নাম র‍্যাংকিন রেস্ট।

ঝাড়ন দিয়ে জানালার কাচের ধুলো ঝাড়ছে এক মহিলা।

কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'ম্যাডাম। কাছাকাছি পশু ডাক্তার কোথায় আছে?'

রাফিয়ানের দিকে তাকাল মহিলা। 'কাছাকাছি বলতে তো ছ-মাইল দূরে, ডারবিনে।'

শুকিয়ে, এতটুকু হয়ে গেল জিনার মুখ। ছয় মাইল! কিছুতেই হেঁটে যেতে পারবে না রাফিয়ান।

'বাস-টাস কিছু আছে?' জিজ্ঞেস করল জিনা।

'না,' বলল মহিলা। 'তবে মিস্টার নরিসকে বলে দেখতে পারো। তার ঘোড়ার গাড়ি আছে। কুকুরটার পা বেশি খারাপ?'

'হ্যাঁ। ম্যাডাম, তাঁর বাড়ি কত দূর?'

'এই আধ মাইল। ওই যে পাহাড়টা, ওখান থেকে ডানে চাইলেই বাড়িটা দেখতে পাবে। বড় বাড়ি। দেখলেই চিনবে। চারপাশে আস্তাবল, ঘোড়া পালে মিস্টার নরিস। খুব ভাল মানুষ। যদি বাড়িতে না পাও, বোসো কিছুক্ষণ। রাতে বাইরে থাকে না, যেখানেই যাক ফিরে আসবে।'

দ্রুত পরামর্শ করে নিল চারজনে। কিশোর বলল, 'মিস্টার নরিসের কাছেই যেতে হবে বোঝা যাচ্ছে। তবে সবার যাওয়ার দরকার নেই। মুসা, রবিনকে নিয়ে তুমি হলুদ দীঘিতে চলে যাও। রাতে থাকার ব্যবস্থা করে রাখোগে। আমি জিনার সঙ্গে যাচ্ছি। ফিরতে কত রাত হয় কে জানে।'

'ঠিক আছে,' বলল মুসা। 'টর্চ আছে তো তোমার কাছে? গাঁয়ে তো রাস্তায় বাতি নেই, রাতে খুব অন্ধকার হবে।'

'আছে,' জানাল কিশোর।

'চলো, কিশোর,' তাড়া দিল জিনা। রবিন আর মুসার দিকে চেয়ে হাত নেড়ে

বলল, 'রাতে দেখা হবে।'

জিনা আর কিশোর পাহাড়ের দিকে রওনা হলো। পাশে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছে রাফিয়ান।

সেদিকে চেয়ে আনমনে বলল মুসা, 'ভাল হয়ে গেলেই বাঁচি। নইলে ছুটিটাই মাটি হবে।'

ঘুরে আরেক দিকে রওনা হলো সে আর রবিন।

নির্জন পথ।

এক জায়গায় একটা লোকের সঙ্গে দেখা হলো। টমটম চালিয়ে আসছে। বিষণ্ন চেহারা, মাথাটা অনেকটা বুলেটের মত।

ডাকল মুসা।

ঘোড়ার রাশ টেনে থামাল লোকটা।

'এ-রাস্তা কি ইয়েলো পণ্ডে গেছে?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'আ,' মাথা নুইয়ে বলল লোকটা।

'সোজা? নাকি ডানে বাঁয়ে আর কোন গলি আছে?'

'আ,' আবার মাথা নোয়াল লোকটা।

'এটাই পথ তো? মানে ওদিকে যেতে হবে?' গলা চড়িয়ে হাত নেড়ে দেখাল মুসা।

'আ,' বলে চাবুক তুলে পেছন দিক দেখাল লোকটা, তারপর পশ্চিমে দেখাল।

'ডানে ঘুরতে হবে?'

'আ,' মাথা নোয়াল লোকটা। হঠাৎ খোঁচা মারল ঘোড়ার পেটে। লাফিয়ে সামনে বাড়ল ঘোড়া, আরেকটু হলেই দিয়েছিল মুসার পা মাড়িয়ে।

'খালি তো আ আ করল,' মুসার মতই রবিনও অবাক হয়েছে লোকটার অদ্ভুত ব্যবহারে। 'কি বোঝাল সে-ই জানে।'

তিন

হঠাৎ করেই নামল রাত। সূর্য ডোবার পর অন্ধকার আর সময়ই দেয়নি সাঁঝকে। কাল মেঘ জমেছে আকাশে।

'কি কাণ্ড দেখো,' গম্ভীর হয়ে বলল মুসা। 'দিনটা কি ভাল গেল। বোঝাই যায়নি বৃষ্টি আসবে।'

'তাড়াতাড়ি চলো,' বলল রবিন। 'ভিজে চুপচুপে হয়ে যাব। মাথা বাঁচানোরও জায়গা নেই।'

মোড় নিয়ে কয়েক কদম এগিয়েই থমকে গেল দুজনে। খুব সরু পথ, পাতাবাহারের ঝোপের সুড়ঙ্গ। সকালে এমন একটা পথে হেঁটে এসেছে। দিনের বেলায়ই আবছা অন্ধকার ছিল ওটাতে। এটাতে এখন গাঢ় অন্ধকার।

'ঠিক পথেই যাচ্ছি তো?' মুসার কণ্ঠে সন্দেহ।

'কি জানি।' রবিনও বুঝতে পারছে না।

'যা থাকে কপালে, ভেবে রবিনের হাত ধরে হাঁটতে শুরু করল মুসা। কয়বার মোড় নিয়েছে পথ, কতখানি এঁকেবেঁকে গেছে, কিছুই বোঝা গেল না। অন্ধের মত এগিয়ে চলেছে দুজনে। জুতোর তলায় ছপছপ করছে কাদা-পানি।

'নর্দমায় নামলাম না তো?' মুসা বলল। 'জুতোর ভেতর পানি ঢুকছে।'

'আমারও সুবিধে লাগছে না, মুসা। যতই এগোচ্ছি, পানি কিন্তু বাড়ছে। শেষে গিয়ে কুয়া-টুয়ায় না পড়ে মরি।'

'টর্চটা কোথায় রাখলাম?' ব্যাগের ভেতরে খুঁজছে মুসা। 'ফেলে এলাম, না কি? রবিন, তোমারটা বের করো তো।'

টর্চ বের করে দিল রবিন।

জ্বালল মুসা। আলোর চারপাশ ঘিরে যেন আরও ঘন হলো অন্ধকার। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল সে। সামনে একটু দূরে, এক জায়গায় কাঠের বেড়া শুরু হয়েছে রাস্তার এক পাশ থেকে, ওখানে খানিকটা জায়গায় পাতাবাহার নেই, কেটে সাফ করা হয়েছে বোধহয়। পথটা সরু খালের মত, দু-ধারে উঁচু পাড়।

'বেড়াটা নিশ্চয় কোন ফার্মে গিয়ে শেষ হয়েছে,' বলল মুসা। 'আস্তাবল কিংবা গরুর খোঁয়াড় পেলেও মাথা বাঁচাতে পারি, ভিজতে হবে না। চলো, দেখি।'

পাড়ে উঠে বেড়া ধরে ধরে এগোল ওরা। ফসলের খেতের মাঝখান দিয়ে সরু পথ।

'মনে হচ্ছে এটা শর্টকাট,' আন্দাজ করল মুসা। 'ফার্ম হাউসটা বোধহয় আর বেশি দূরে না।'

একটা দুটো করে ফোঁটা পড়তে শুরু করল, যে কোন মুহূর্তে ঝুপঝুপ করে নামবে বৃষ্টি।

মুসার কথায় আশ্বস্ত হতে পারল না রবিন। সত্যিই পাবে তো ফার্মটা?'

জোরে নামল বৃষ্টি। বর্ষাতি বের করা দরকার। দ্রুত এদিক ওদিক তাকাল ওরা। কোথায় ঢুকে বের করা যায়? ব্যাগের মধ্যে পানি ঢুকলে সব ভিজে যাবে, দুর্ভোগ পোহাতে হবে তখন।

মাঠের মধ্যেই দুটো আলের মিলনস্থলে ঘন একটা পাতাবাহারের ঝোপ চোখে পড়ল। দৌড়ে এসে তার ভেতরে ঢুকল দুজনে। ব্যাগ খুলে বর্ষাতি বের করল।

বৃষ্টি নামায় আরও ঘন হলো অন্ধকার। টর্চের আলো বেশি দূর যাচ্ছে না।

'আলো তো দেখছি না,' বলল রবিন। 'কই ফার্মটা?'

'কি জানি। বুঝতে পারছি না। ফিরে গিয়ে আবার সুড়ঙ্গে নামব? নাহ্, তা-ও বোধহয় ঠিক হবে না।'

'পথ যখন রয়েছে, নিশ্চয় কোথাও গিয়ে শেষ হয়েছে। কিন্তু কোথায়?'

না বুঝে আর এগোনোর কোন মানে হয় না। দাঁড়িয়ে ভিজতে ভিজতে ভাবছে ওরা, কোন দিকে যাবে? কিছু একটা বলার জন্যে মুখ খুলতে গিয়েও থেমে গেল রবিন।

হঠাৎ করে এমনভাবে শুরু হলো শব্দটা, চমকে উঠল দুজনে। একে অন্যের হাত চেপে ধরল। নির্জন মাঠে, অন্ধকার রাতে এই দুর্যোগের মাঝে অদ্ভুত

শোনাচ্ছে।

ঘণ্টার শব্দ।

বেজেই চলেছে। প্রলয়ের সঙ্কেত যেন। অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে দিল দুই কিশোরের।

'কোথায় বাজছে? এভাবে?' ফিসফিস করল রবিন, জোরে বলার সাহস নেই।

কোথায় বাজছে মুসা জানবে কি করে? সে-ও রবিনের মতই চমকে গেছে। কাছাকাছি নয়, দূরে কোথাও বাজছে। কখনও জোরে, কখনও আস্তে। এলোমেলো বাতাস বইছে, একবার এদিক থেকে, একবার ওদিক। বাতাস সরে গেলে শব্দও কমে যাচ্ছে, যে-ই বাড়ছে, অমনি যেন তাদেরকে ঘিরে ধরছে বিচিত্র ঘণ্টা-ধ্বনি।

'ইস্, থামে না কেন?' দুরুদুরু করছে মুসার বুক। 'গির্জার ঘণ্টা নয়।'

'না, তা-তো নয়ই,' কেঁপে উঠল রবিনের গলা। 'কোন ধরনের সঙ্কেত হতে পারে···আমি শিওর না।' অস্বস্তিতে হাত নাড়ল সে। বিড়বিড় করল, 'যুদ্ধ?···বীকন কই?'

'কি বিড়বিড় করছ?'

'অ্যাঁ?···বীকন। পুরানো আমলে যুদ্ধ লাগলে ওভাবে ঘণ্টা বাজিয়ে হুঁশিয়ার করা হত গাঁয়ের লোককে। সেই সঙ্গে আলোর সঙ্কেত—বীকন বলা হত।'

'এখন তো পুরানো আমল নয়···' চমকে থেমে গেল মুসা।

রবিনের কথার মানে বুঝে ফেলেছে। 'কি বলতে চাইছ?'

'বুঝেছ তুমিও। এখন পুরানো আমল নয়, তাহলে অন্ধকারে ঝড়-বৃষ্টির মাঝে ওই ঘণ্টা···'

'চুপ চুপ! আর বোলো না,' ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকাল মুসা। অন্ধকারে কিছুই চোখে পড়ল না। টর্চের রশ্মির সামনে শুধু অগুনতি বৃষ্টির ফোঁটা।

যেমন শুরু হয়েছিল তেমনি হঠাৎ করেই থেমে গেল শব্দ।

এরপরও কান পেতে রইল দুজনে। কিন্তু আর শোনা গেল না।

'চলো, হাঁটি,' বলল মুসা। 'ফার্মটা খুঁজে বের করা দরকার। আবার কখন শুরু হয়ে যায়···'

বেড়ার ধার ধরে আবার এগিয়ে চলল ওরা।

কতক্ষণ পর বলতে পারবে না, আঙুল তুলে চেঁচিয়ে উঠল রবিন, 'ওই যে।'

মুসাও দেখল। আলো। না, বীকন নয়, জ্বলছে-নিভছে না। একভাবে জ্বলছে টিমটিম করে।

'পাওয়া গেল বাড়িটা,' জোরে নিঃশ্বাস ফেলল মুসা।

কাঠের বেড়া শেষ। একটা পাথরের দেয়ালের কাছে চলে এল ওরা। ওটার পাশ দিয়ে এল ভাঙাচোরা একটা গেটের কাছে।

ভেতরে পা রেখেই লাফিয়ে সরে এল রবিন।

'কি হলো?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'আলো ফেলো তো। ডোবায় না পড়ি।'

দেখা গেল, ডোবায় পা ডোবেনি রবিনের, বৃষ্টির পানি জমেছে ছোট একটা

গর্তে। গর্তটার পাশ কাটিয়ে এল দুজনে।

কাদা প্যাচপ্যাচ করছে সরু পথে। পথের শেষ মাথায় বাড়ির সাদা দেয়াল, ছোট একটা দরজা। পেছনের দরজা হবে, ভাবল মুসা। পাশের জানালা দিয়ে আলো আসছে।

জানালার কাছে এসে ভেতরে উঁকি দিল ওরা। মাথা নিচু করে সেলাই করছে এক বৃদ্ধা।

দরজার পাশে ঘণ্টার দড়ি-টড়ি কিছু দেখতে পেল না মুসা। জোরে ধাক্কা দিল। সাড়া নেই। বন্ধ রইল দরজা। উঁকি দিল আবার জানালা দিয়ে। তেমনি ভাবে সেলাই করছে মহিলা, নড়েওনি।

'কানে শোনে না নাকি?' বলতে বলতেই দরজায় কিল মারল মুসা। সাড়া মিলল না এবারও। খবরই নেই যেন মহিলার।

'এভাবে কিলাকিলি করে কিছু হবে না,' দরজার নব ধরে মোচড় দিল মুসা।

ঘুরে গেল নব। ঠেলা দিতেই পাল্লাও খুলল।

পা মোছার জন্যে ছেঁড়া একটা মাদুর বিছানো রয়েছে পাল্লার ওপাশে। তারপরে সরু প্যাসেজ। প্যাসেজের মাথায় পাথরের সিঁড়ি। সদর দরজার কাছেই ডানে আরেকটা দরজা, পাল্লা সামান্য ফাঁক। হারিকেনের ম্লান আলো আসছে।

ঠেলে পাল্লা পুরো খুলে ভেতরে পা রাখল মুসা। তার পেছনে রবিন।

তবু তাকাল না মহিলা। সেলাই করেই চলেছে।

একেবারে তার সামনে এসে দাঁড়াল মুসা।

এইবার দেখতে পেল বৃদ্ধা। চমকে এত জোরে লাফিয়ে উঠল, ঠেলা লেগে উল্টে পড়ে গেল তার চেয়ার।

'সরি,' এভাবে চমকে যাবে বৃদ্ধা, ভাবেনি মুসা। 'দরজায় ধাক্কা দিয়েছিলাম। শোনেননি।'

বুকে হাত চেপে ধরে আছে মহিলা। 'ইস্, কি ভয়ই না দেখালে!...কে তোমরা? এই অন্ধকারে কোত্থেকে?'

চেয়ারটা তুলে আবার জায়গামত সোজা করে রাখল মুসা। হাঁপাচ্ছে অল্প অল্প। 'এটা কি ইয়েলো পশু ফার্ম? এর খোঁজেই এসেছি আমরা। রাতটা কাটানো যাবে? আরও দুজন আসছে।'

তর্জনীর মাথা দিয়ে বার দুই কানে টোকা দিল মহিলা, মাথা নাড়ল। 'শুনি না। ইশারায় বলো। পথ হারিয়েছ?'

মাথা ঝাঁকাল মুসা।

'এখানে তো থাকতে পারবে না, আমার ছেলে পছন্দ করে না এসব। ও এল বলে। সাংঘাতিক বদরাগী। চলে যাও।'

'মাথা নাড়ল মুসা। জানালা দিয়ে বাইরের বৃষ্টিভেজা রাত দেখাল। তার আর রবিনের ভেজা জুতো আর কাপড় দেখাল।

'হুঁ,' পথ হারিয়েছ তোমরা। ভিজেছ। ক্লান্ত। যেতে চাও না, এই তো? আমার ছেলেকে নিয়ে যে বিপদ। অচেনা কাউকে সহ্য করতে পারে না।'

রবিনকে দেখাল মুসা, তারপর হাত তুলে কোণের একটা সোফা দেখাল। নিজের বুকে হাত রেখে সরিয়ে এনে নির্দেশ করল দরজার দিকে।

বুঝল মহিলা। 'তোমার বন্ধু সোফায় থাকবে বলছ। তুমি বাইরে কোন ছাউনি কিংবা গোলাঘরে কাটিয়ে দিতে পারবে।'

আবার মাথা ঝাঁকাল মুসা।

'কিন্তু সেই একই ব্যাপার, আমার ছেলে পছন্দ করে না…' রবিন আর মুসার ভেজা মুখের দিকে চেয়ে অবশেষে বোধহয় করুণা হলো মহিলার। হতাশ ভঙ্গিতে হাত নেড়ে এগোল একটা দেয়াল-আলমারির দিকে।

দরজা খুলল। আলমারি মনে করেছে দুই গোয়েন্দা, আসলে ওটা ঘরের আরেকটা দরজা। ওপাশ থেকে খুব সরু কাঠের সিঁড়ি উঠে গেছে।

রবিনকে বলল মহিলা, 'তুমি ওপরে চলে যাও। কাল সকালে আমি না ডাকলে আর নামবে না। আহ্, যাও দেরি কোরো না।'

মুসার দিকে চেয়ে দ্বিধা করছে রবিন। 'তুমি?'

'তুমি যাও তো,' রবিনের হাত ধরে ঠেলে দিল মুসা। 'আমি গোলাঘরে গিয়ে থাকি। গিয়ে দেখো জানালা-টানালা আছে কিনা। রাতে বেকায়দা দেখলে ডেকো। নিচেই থাকতে হবে আমাকে।'

'ঠিক আছে,' গলা কাঁপছে রবিনের, অনিচ্ছাসত্ত্বেও পা বাড়াল সিঁড়ির দিকে।

নোংরা পুরানো সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল খুদে একটা চিলেকোঠায়। একটা মাদুর আছে, পরিষ্কারই, আর একটা চেয়ার। একটা কম্বল ভাঁজ করা রয়েছে চেয়ারের হেলানে, বসার জায়গায় এক জগ পানি।

ছোট জানালাও আছে একটা। ওটা দিয়ে গলা বাড়িয়ে ডাকল রবিন, 'মুসা? মুসা?'

'হ্যাঁ, শুনছি,' নিচ থেকে সাড়া দিল মুসা। 'চুপচাপ শুয়ে থাকো। অসুবিধে না হলে আর ডেকো না।'

চার

সঙ্গে খাবার যা আছে খেয়ে নিল রবিন। ঢকঢক করে আধ জগ পানি খেয়ে মাদুরের ওপর কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। জিনা আর কিশোরের সাড়ার আশায় কান খাড়া। কিন্তু বেশিক্ষণ চোখ খোলা রাখতে পারল না। সারা দিন অনেক পরিশ্রম গেছে। ঘুমিয়ে পড়ল সে।

বাইরে বেশি হাঁটাহাঁটি করার সাহস হলো না মুসার। বৃদ্ধার ছেলের সামনে যদি পড়ে যায়? সহজেই খুঁজে পেল গোলাঘরটা। টর্চের আলো সাবধানে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল।

ঘরের এক কোণে খড়ের গাদা। শোয়ার জায়গা পাওয়া গেল। ভাঙা একটা বাক্স দেখে সেটা তুলে এনে দরজার পাশে রেখে বসল। ভাঙা গেটটা দেখা যায়। কিশোর আর জিনা আসবে তো এই বৃষ্টির মাঝে? এলে কি ওই গেট দিয়েই ঢুকবে?

পেটের ভেতর ছুঁচো নাচছে। খাবার বের করে খেতে শুরু করল মুসা, একই সঙ্গে চোখ রাখল গেটের দিকে। বৃদ্ধার ছেলে এলে দেখতে পাবে।

ঘুমে জড়িয়ে আসছে চোখ। ঘন ঘন হাই তুলছে। তবু জোর করে চোখ খোলা রেখে বসে রইল।

কেউ এল না। দরজা দিয়ে মুখ বাড়ালেই চোখে পড়ে বাড়ির জানালা। বৃদ্ধাকে দেখা যায়, সেলাই করছে।

দু-ঘন্টা পেরোল। আটটা বাজে। জিনা আর কিশোরের জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে মুসা।

ঝুড়িতে সেলাইয়ের সরঞ্জাম গুছিয়ে রাখল বৃদ্ধা। মুসার দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল, ফিরে এল না। হারিকেনটা আগের জায়গায়ই জ্বলছে, ছেলের জন্যেই জ্বেলে রেখে গেছে বোধহয় বৃদ্ধা, মুসা ভাবল।

বৃষ্টি থেমেছে। আকাশ মোটামুটি পরিষ্কার। তারা ফুটেছে। ছুটে চলা মেঘের ফাঁকে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে চাঁদ। সুযোগ পেলেই বেরিয়ে আসবে।

প্রকৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভয় অনেকখানি কেটে গেল মুসার। গোলাঘর থেকে বেরিয়ে পা টিপে টিপে এগোল জানালার দিকে। মনে কৌতূহল। কি করছে বৃদ্ধা?

কোণের নড়বড়ে সোফাটায় শুয়ে পড়েছে মহিলা। গলা পর্যন্ত তুলে দিয়েছে কম্বল। বোধহয় ঘুমিয়ে গেছে।

আগের জায়গায় ফিরে এল মুসা। জিনা আর কিশোরের জন্যে বসে থেকে আর লাভ আছে?—ভাবল সে। রাতে ওরা ফিরবে বলে মনে হয় না। রাফিয়ানকে ডাক্তার দেখিয়ে র‍্যাংকিন ভিলেজে ফিরে সরাইখানায় রাত কাটানোটাই স্বাভাবিক। বৃষ্টি না হলে অবশ্য অন্য কথা ছিল।

বড় করে হাই তুলল সে। 'যাই, শুয়ে পড়িগে,' মনে মনে বলল। 'যদি আসেই ওরা, সাড়া পাব।'

দরজা বন্ধ করল মুসা। খিল-টিল কিছু নেই। দুটো করে আঙটা লাগানো আছে ভেতরে-বাইরে। ভেতরের আঙটা দুটোয় দুটো লাঠি ঢুকিয়ে আটকে দিল সে। খিলের বিকল্প। কেন এই সাবধানতা, নিজেই জানে না। হয়তো অবচেতন মনে রেখাপাত করেছে বৃদ্ধার ছেলের বদমেজাজের কথাটা।

খড়ের গাদায় শুতে না শুতেই ঘুমে অচেতন হয়ে গেল মুসা।

বাইরে আরও পরিষ্কার হয়েছে আকাশ। বেরিয়ে এসেছে চাঁদ, পূর্ণতা পায়নি এখনও, তবে যথেষ্ট বড় হয়েছে। পাথরের পুরানো বাড়িটাকে কেমন রহস্যময় করে তুলেছে ঘোলাটে জ্যোৎস্না।

ঘুমাচ্ছে মুসা। স্বপ্নে দেখছে রাফিয়ানকে, জিনা, কিশোর আর ভাঙা বাড়িটাকে, কানে আসছে যেন ঘন্টাধ্বনি।

হঠাৎ ভেঙে গেল ঘুম। প্রথমে বুঝতে পারল না কোথায় রয়েছে। আরি, খোঁচা লাগছে কেন? বিছানায় কাঁটা ছড়িয়ে দিল নাকি কেউ? তারপর মনে পড়ল, খোঁচা তো লাগবেই। শুয়ে আছে খড়ের গাদায়। কাত হয়ে শুলো, কুঁজো হয়ে।

একটা মৃদু শব্দ কানে এল। গোলাঘরের কাঠের বেড়ায় আঁচড়ের মত। উঠে বসল মুসা। ইঁদুর?

কান পেতে আছে সে। শব্দ ঘরের ভেতর নয়, বাইরে থেকে আসছে। থেমে, একটা নির্দিষ্ট সময় বিরতি দিয়ে আবার শুরু হলো। তারপর, মুসার ঠিক মাথার ওপরে ভাঙা একটা জানালায় আলতো টোকা দিল কেউ।

চুপ করে আছে মুসা। ইঁদুরে আঁচড়াতে পারে, কিন্তু টোকা দিতে পারে না। তাহলে কে? দম বন্ধ করে পড়ে রইল সে।

'রবিন! রবিন?' ফিসফিসিয়ে ডাকল কেউ।

সাড়া দিতে গিয়েও দিল না মুসা। গলাটা অচেনা, কিশোরের মত লাগছে না। কিন্তু রবিনের নাম জানল কি ভাবে? কেউ যে শুয়ে আছে ঘরে, এটাই বা কি করে জানল?'

আবার টোকার শব্দ হলো। গলা আরেকটু চড়িয়ে ডাকল লোকটা, 'রবিন। রবিন?'

না, কিশোর নয়। জিনা তো নয়ই।

'ওঠো,' বলল লোকটা। 'অনেক দূর যেতে হবে আমাকে। ওই মেসেজটা নিয়ে এসেছি।'

জানালার কাছে যাওয়া উচিত হবে না, ভাবল মুসা। কিন্তু এ-ও চায় না, কোন সাড়া না পেয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ুক লোকটা। জানালার চৌকাঠের কাছে মাথা তুলল সে, কিন্তু মুখ বের করল না। মুখের ওপর হাত চাপা দিয়ে কণ্ঠস্বর বিকৃত করে ফিসফিস করে জবাব দিল, 'আছি, বলো।'

'এত ঘুম?' বিরক্ত হয়ে বলল লোকটা। 'কখন থেকে ডাকছি। শোনো, জেরি মেসেজ দিয়েছে। টু-ট্রীজ। ব্ল্যাক ওয়াটার। ওয়াটার মেয়ার। আরও বলেছে, টিকসি নোজ। তোমাকে এটা দিতে বলেছে, টিকসির কাছে আছে আরেকটা। নাও,' জানালা দিয়ে এক টুকরো কাগজ ছেড়ে দিল সে ভেতরে।

বেড়ার ছোট একটা ছিদ্র দিয়ে দেখছে মুসা। বিষণ্ন মুখ, কুতকুতে চোখ, মাথাটা দেখতে অনেকটা বুলেটের মত।

'রবিন?' আবার বলল লোকটা। 'সব মনে রাখতে পারবে তো? টু ট্রীজ। ব্ল্যাক ওয়াটার। ওয়াটার মেয়ার। টিকসি নোজ।...যাই তাহলে।'

চলে গেল লোকটা।

কাগজের টুকরোটা হাতে নিয়ে অবাক হয়ে ভাবছে মুসা। কে লোকটা? রবিনের নাম জানল কিভাবে? আর তাকেই বা রবিন মনে করার কারণ কি? রবিনের নাম যখন জানে, তার নাম কি জানে না? রাত দুপুরে ঘুম থেকে ডেকে তুলে কি এক অদ্ভুত মেসেজ দিয়ে গেল, মাথামুণ্ড কিছুই বোঝা যায় না।

ঘুম আর আসবে না সহজে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল মুসা। কিচ্ছু নেই, শুধু রহস্যময় বাড়িটার নির্জনতা, আর খোলা আকাশ।

খড়ের গাদায় বসে পড়ল সে। টর্চ জেলে দেখল কাগজের টুকরোটা। ময়লা, এক পাতার ছেঁড়া অর্ধেক। পেনসিলে কিছু আঁকিবুঁকি রয়েছে, যার কোনই মানে

বোঝা যায় না। কিছু শব্দ রয়েছে এখানে ওখানে, যেগুলো আরও দুর্বোধ্য।

'আমার মাথায় কুলোবে না,' আনমনে বলতে বলতে কাগজটা পকেটে রেখে দিল সে। শুয়ে পড়ল আবার।

জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা আসছে। কুকুর-কুণ্ডলী হয়ে গেল মুসা, গায়ের ওপর কিছু খড় টেনে দিল। ঠাণ্ডা কম লাগবে।

শুয়ে শুয়ে ভাবছে। তন্দ্রা লাগল একসময়।

কিন্তু পুরোপুরি ঘুম আসার আগেই টুটে গেল আবার। বাইরে সতর্ক পায়ের শব্দ। ফিরে এল লোকটা ?

দরজার বাইরে এসে থামল পদশব্দ। ঠেলা দিল পাল্লায়। খুলল না দেখে জোরে ধাক্কা দিল। সে বোধহয়, ভাবছে, কোন কিছুর সঙ্গে আটকে গেছে পাল্লা। ঠেলাঠেলিতে আঙটা থেকে খসে পড়ল লাঠি, ভেতরে ঢুকল লোকটা। আবার ভেজিয়ে দিল দরজা।

দরজার কাছে পলকের জন্যে লোকটার চেহারা দেখেছে মুসা। না, বুলেট-মাথা নয়। এর মাথায় ঘন কালো ঝাঁকড়া চুল। ধড়াস ধড়াস করছে বুকের ভেতর। খড়ের গাদায় শুতে আসবে না তো লোকটা?

না, এল না। একটা চটের বস্তার ওপর বসে নিজে নিজেই কথা শুরু করল। 'হলো কি? আর কতক্ষণ বসে থাকতে হবে?' বিড়বিড় করে আরও কিছু বলল, বুঝতে পারল না মুসা।

'দূর কি হলো?' বলে উঠল লোকটা। মাথার ওপর দু-হাত তুলে গা মোড়ামুড়ি করল। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল আবার দরজার কাছে। বাইরে উঁকি দিয়ে কি দেখল, ফিরে এসে বসল আবার আগের জায়গায়।

বিড়বিড় করছে না আর, একেবারে চুপ। হাই তুলছে।

সত্যিই দেখছে তো, অবাক হয়ে ভাবল মুসা, নাকি স্বপ্ন?

চুপ করে পড়ে রইল সে। স্বপ্ন দেখতে শুরু করল এক সময়, একটা বনের ভেতর দিয়ে চলেছে। যেদিকেই তাকায়, শুধু জোড়ায় জোড়ায় গাছ। বিচিত্র ঘণ্টার শব্দ কানে বাজছে একটানা।

দ্বিতীয়বার ঘুম ভাঙল মুসার। সকাল হয়ে গেছে। প্রথমেই চোখ গেল বস্তাটার দিকে। কেউ নেই। গোলাঘরে খড়ের গাদার ভেতরে শরীর ডুবিয়ে রয়েছে সে একা।

পাঁচ

উঠে আড়মোড়া ভাঙল মুসা। সারা গায়ে ধুলো-মাটি, নোংরা। খিদেও পেয়েছে। আচ্ছা, পয়সা পেলে রুটি, পনির আর এক গেলাস দুধ দেবে তো বৃদ্ধা? রবিনেরও নিশ্চয় খিদে পেয়েছে। কি অবস্থায় আছে কে জানে।

সাবধানে বাইরে বেরোল মুসা। চিলেকোঠার জানালার নিচে এসে দাঁড়াল। রবিনের উদ্বিগ্ন মুখ দেখা যাচ্ছে।

'কেমন?' হাত নেড়ে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল মুসা।

'ভাল,' হাসল রবিন। 'কিন্তু নিচে তো নামতে পারছি না। মহিলার ছেলে সাংঘাতিক বদমেজাজী। কয়বার যে গালাগাল করেছে বেচারী বুড়িটাকে। কানে শোনে না, এটা যেন তার দোষ।'

'তাহলে ও বেরিয়ে যাক,' চট করে ফিরে তাকাল মুসা, কে জানি আসছে। তাড়াতাড়ি ফিরে এসে ঢুকল আবার গোলাঘরে।

বেড়ার ছিদ্র দিয়ে দেখল, বেঁটে এক লোক, চওড়া কাঁধ, সোজা হয়ে দাঁড়ালে সামান্য কুঁজো মনে হয়, মাথায় এলোমেলো চুলের বোঝা। গতরাতে দ্বিতীয় বার একেই ঢুকতে দেখেছে মুসা।

আরে, এদিকেই তো আসছে।

কিন্তু না, গোলাঘরে ঢুকল না লোকটা। পাশ দিয়ে চলে গেল। গেট খোলা আর বন্ধ হওয়ার শব্দ কানে এল মুসার।

'চলে গেছে,' ভাবল মুসা। 'যাই এবার।'

আবার বেরোল গোলাঘর থেকে।

দিনের আলোয় বড় বেশি বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে ছোট্ট সাদা বাড়িটাকে। নিঃসঙ্গ, নির্জন।

ঘরে ঢুকল মুসা। রান্নাঘরে পাওয়া গেল বৃদ্ধাকে। সিংকে বাসন-পেয়ালা ধুচ্ছে। মুসাকে দেখে অস্বস্তি ফুটল চোখে। 'ও, তুমি। ভুলেই গিয়েছিলাম তোমাদের কথা। জলদি তোমার বন্ধুকে নিয়ে চলে যাও। আমার ছেলে দেখলে...'

'কিছু রুটি আর পনির দিতে পারবেন?' চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা। বুঝল, লাভ হবে না। গলা ফাটিয়ে চেঁচালেও শুনতে পাবে না মহিলা, একেবারেই কালা। হাত তুলে টেবিলে রাখা রুটি দেখাল সে।

'না না!' আঁতকে উঠল বৃদ্ধা। 'জলদি চলে যাও। আমার ছেলে এসে পড়বে।'

ঠিক এই সময় পায়ের শব্দ হলো। মুসা কিছু করার আগেই ঘরে ঢুকল লোকটা, যাকে খানিক আগে বেরিয়ে যেতে দেখেছে।

হাতের ছোট ঝুড়িতে কয়েকটা ডিম।

চোখ গরম করে তাকাল লোকটা। 'এই ছেলে, এখানে কি? কি চাই?'

'না, কিছু না...মানে, এই...আমাদের কাছে কিছু রুটি বেচবে কি না...'

'আমাদের? তুমি একা নও?'

নিজেকে জুতোপেটা করতে ইচ্ছে হলো মুসার, মুখ ফসকে 'আমাদের' বলে ফেলেছে। কিন্তু ফেলেছে তো ফেলেছেই, কথা ফিরিয়ে নেয়া আর যাবে না। চুপ করে রইল।

'কি হলো? রা নেই কেন?' গর্জে উঠল লোকটা। 'এতক্ষণে বুঝলাম, ডিম যায় কোথায়? তোমরাই চুরি করো রোজ...দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা...'

আর কি দাঁড়ায় মুসা? ঝেড়ে দিল দৌড়। গেট পেরিয়ে ছুটল। দুপদুপ করছে বুক, পেছনে তাকানোর সাহস নেই।

পায়ের আওয়াজ নেই শুনে ফিরে তাকাল মুসা। আসেনি লোকটা। ঘর

থেকেই বোধহয় বেরোয়নি।

পায়ে পায়ে আবার গেটের কাছে ফিরে এল মুসা। উঁকি দিয়ে দেখল, একটা বড় কাঠের পাত্র হাতে নিয়ে উল্টো দিকে চলে যাচ্ছে লোকটা, সাদা বাড়ির পেছনে। বোধহয় মুরগীর খাবার দিতে যাচ্ছে।

এই-ই সুযোগ। ঢুকে পড়ল মুসা। চিলেকোঠার জানালায় দেখা যাচ্ছে রবিনের মুখ। ইশারায় নেমে আসতে বলল তাকে মুসা।

রবিন নেমে আসতেই আর দাঁড়াল না। বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এল দুজনে। তাড়াতাড়ি পা চালাল।

আশপাশের অঞ্চল রাতে লেগেছিল এক রকম, এখন লাগছে আরেক রকম।

অনেকখানি আসার পর প্রথম কথা বলল রবিন, 'আরিব্বাপরে! সাংঘাতিক হারামী লোক। আর ওটা একটা ফার্ম হলো নাকি? গরু-শুয়োর কিচ্ছু নেই। একটা কুত্তাও না।'

'মনে হয় না ওটা ফার্ম,' বেড়ার ধার দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলল মুসা, ফিরে তাকাল একবার বাড়ির ভাঙা গেটের দিকে। 'শিওর, পথ হারিয়েছিলাম কাল রাতে। ভুল জায়গায় উঠেছি। ইয়েলো পণ্ড ফার্ম হতেই পারে না।'

'কাজটা খারাপ হয়ে গেল তাহলে,' জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করল রবিন। 'কিশোর আর জিনা নিশ্চয় ফার্মে উঠেছে। আমাদের জন্যে খুব ভাববে।'

'হ্যাঁ,' ছোট একটা পুকুর দেখে ঘুরল মুসা। 'চলো, হাত-মুখ ধুয়ে নিই। চেহারার যা অবস্থা হয়েছে একেকজনের। লোকে দেখলে পাগল ভাববে।'

হাত-মুখ ধুয়ে কাপড় বদলে নিল দুজনে। ময়লা কাপড় ভরে রাখল ব্যাগে, পরে সময়-সুযোগমত ধুয়ে নেবে।

পাড়ের ওপর উঠতেই একটা ছেলেকে দেখতে পেল, শিস দিতে দিতে আসছে। 'হাল্লো,' বলল হাসিখুশি ছেলেটা। 'ছুটি কাটাতে বেরিয়েছ বুঝি?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'আচ্ছা ভাই, ইয়েলো পণ্ড ফার্মটা কোথায়? ওই ওটা?' বৃদ্ধার বাড়িটা দেখাল।

'আরে দূর, ওটা ফার্ম নাকি? ও-তো মিসেস হ্যাগার্ডের বাড়ি। নোংরা।' নাক কুঁচকাল ছেলেটা। 'ওটার ধারে-কাছে যেয়ো না। বুড়ির ছেলে একটা ইবলিস, গাঁয়ের লোকে ওর নাম রেখেছে ডারটি রবিন।...ইয়েলো পণ্ড ওই ওদিকে। র‍্যাংকিন রেস্ট ছাড়িয়ে গিয়ে, বাঁয়ে।'

'থ্যাংকু,' বলল মুসা।

মাঠের পথ ধরে হেঁটে চলেছে রবিন আর মুসা। পেটে খিদে । মনে ভাবনা। কিশোর আর জিনা নিশ্চয় খুব দুশ্চিন্তা করছে।

সরু পথটার কাছে এসে থামল, সেই যে সেই পথটা, যেটার দু-ধারে পাতাবাহারের জঙ্গল পথকে সুড়ঙ্গ বানিয়ে দিয়েছে।

হাত তুলে দেখাল রবিন, 'ওই যে দেখো, কোথায় নেমে যাচ্ছিলাম। নালা।'

'নালায়েকের বাচ্চা,' বিড়বিড় করে টমটমওয়ালাকে গাল দিল মুসা।

র‍্যাংকিন রেস্টের কাছে আসতেই কিশোর আর জিনার দেখা পাওয়া গেল।

মুসা আর রবিনকে আগেই দেখেছে ওরা, নাম ধরে ডাকতে ডাকতে ছুটে আসছে। তাদের সঙ্গে লাফাতে লাফাতে আসছে রাফিয়ান।

নাস্তা কেউই খায়নি। র‍্যাংকিন রেস্টে ঢুকল ওরা।

এগিয়ে এল সেই মহিলা, গতদিন ডাস্টার দিয়ে যে জানালা পরিষ্কার করছিল। 'কি চাই?'

'নাস্তা খাইনি এখনও,' বলল কিশোর। 'কিছু আছে?'

'পরিজ আর মাখন,' জানাল মহিলা। 'আর আমাদের নিজেদের কাটা গরু, নিজেদের মুরগীর ডিম। নিজেদের হাতে চাক ভেঙে মধু এনেছি আমরা, আর পাঁউরুটি আমি নিজে বানিয়েছি। চলবে? কফিও আছে।'

'ইস্, আন্টি, জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে আপনাকে,' দাঁত আর একটাও ভেতরে রাখতে পারছে না মুসা। 'জলদি করুন। এক বচ্ছর কিছু খাইনি।'

হেসে চলে গেল মহিলা।

ছোট গোছানো ডাইনিং রুমে আরাম করে বসল অভিযাত্রীরা। খানিক পরেই রান্নাঘর থেকে ভেসে এল ভাজা মাংস আর কড়া কফির জিভে পানি আসা গন্ধ। লম্বা জিভ বের করে ঠোঁট চাটল রাফিয়ান।

কুকুরটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল মুসা, 'ও তো দেখছি ভাল হয়ে গেছে। মিস্টার নরিসের ওখানে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ,' বলল কিশোর। 'গিয়ে দেখলাম বাড়ি নেই। তাঁর স্ত্রী বললেন, এসে পড়বেন শিগগিরই। খুব ভাল মহিলা। বসতে দিলেন। বসলাম।'

'কিন্তু শিগগির আসেননি ভদ্রলোক,' জিনা যোগ করল। 'কাজে আটকে গিয়েছিলেন। সাড়ে সাতটার পর এলেন। খুব খারাপ লাগছিল, তাঁদের খাওয়ার সময় তখন।'

'তবে মিস্টার নরিসও ভাল,' বলল কিশোর। 'রাফির পা দেখল, চেপে ধরে কি জানি কি করল···এমন জোরে কাঁউ করে উঠল রাফি, যেন ছাত ফুঁড়ে বেরিয়ে যাবে···জিনা গিয়ে লাফ দিয়ে পড়ল মিস্টার নরিসের ওপর···হাহ্ হাহ···ভদ্রলোক তো হেসেই বাঁচেন না···'

'যাব না,' চোখমুখ ঘুরিয়ে বলল জিনা। 'যা ব্যথা দিয়েছে···'

'ডাক্তার যা করেন, বুঝেশুনেই করেন···'

'হ্যাঁ, তাই তো দেখছি,' আবার রাফিয়ানের মাথায় হাত বোলাল মুসা। 'একেবারে ভাল হয়ে গেছে। তারপর কি করলে?'

'খাওয়ার জন্যে চাপাচাপি শুরু করলেন মিসেস নরিস,' বলল কিশোর। 'কিছুতেই এড়াতে পারলাম না। খাওয়ার পর বেরোতেও দিতে চাইলেন না। বললেন, বৃষ্টিবাদলার মধ্যে গিয়ে কি করবে, শুয়ে থাকো এখানেই। তোমরা ভাববে বললাম। শেষে, ন-টা বাজার পর আকাশ পরিষ্কার হলে ছাড়লেন। ইয়েলো পঙে গিয়ে তোমাদের পেলাম না। ভাবলাম, বৃষ্টিতে আটকে গেছ, অন্য কোথাও রাত কাটাতে উঠেছ। কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারলাম না। এতক্ষণে না পেলে পুলিশকে জানাতাম।'

'ফার্মটা কিন্তু দারুণ,' মাথা কাত করল জিনা। 'ছোট একটা ঘরে থাকতে দিল আমাদের। বিছানা বেশ নরম। আমার বিছানার পাশে নিচে রাফি শুয়েছিল।'

'আর কি কপাল,' কপাল চাপড়াল মুসা, 'আমি কাটিয়েছি খড়ের গাদায়...'

মস্ত ট্রে-তে খাবার বোঝাই করে নিয়ে ঘরে ঢুকল মহিলা। পরিজ থেকে ধোঁয়া উঠছে। সাদা বিরাট বাটিতে সোনালি মধু। ইয়া বড় এক ডিশ ভরতি মাংস-ভাজা আর ডিম সেদ্ধ। আরেকটা বাসনে ভাজা ব্যাঙের-ছাতাও রয়েছে।

'খাইছে!' হাততালি দিয়ে উঠল মুসা। ঢোক গিলল।

টেবিলে ট্রে নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল মহিলা, 'এগুলো খাও। টোস্ট, ডিম ভাজা আর মাখন নিয়ে আসছি। দুধ-কফি পরে আনব। নাকি এখনি?'

'না না,' তাড়াতাড়ি হাত নাড়ল মুসা, 'পরেই আনুন।' একটা ডিম তুলে নিয়ে আস্ত মুখে পুরল। সেটা অর্ধেক চিবিয়েই এক টুকরো মাংস নিয়ে কামড় বসাল। প্লেটে খাবার তুলে নেয়ার তর সইল না।

হেসে যার যার প্লেট টেনে নিল অন্যেরা। খাবার তুলে নিল প্লেটে। বাকি খাবার সহ ট্রে-টা মুসার দিকে ঠেলে দিয়ে বলল জিনা, 'নাও, রাফিয়ানকেও কিছু দিয়ো।'

'কি আর বলব রে ভাই,' ব্যাঙের ছাতার শেষ টুকরোটা মুখে পুরল মুসা। 'অন্ধকারে গিয়ে উঠেছিলাম এক বান্দরের বাড়িতে। রবিন, তুমি বলো।' দরজায় দেখা দিয়েছে মহিলা, হাতে আরেক ট্রে, লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সেদিকে গোয়েন্দা সহকারী।

সংক্ষেপে জানাল রবিন, পথ হারিয়ে কিভাবে গিয়ে উঠেছিল বাড়িটাতে।

বাধা না দিয়ে চুপচাপ শুনল কিশোর, তারপর বলল, 'ঘণ্টা শুনে ভয় পেয়েছে, নিশ্চয় মুসা ভূতের ভয় ঢুকিয়েছে তোমার মনে?'

জোরে জোরে দু-হাত নাড়ল মুসা, কি বোঝাতে চাইল সে-ই জানে। মুখ ভর্তি খাবার, কথা বলতে পারছে না।

'অ, তোমরা তাহলে শোনোনি কিসের ঘণ্টা,' বলল কিশোর। 'পাগলা-ঘন্টি, মিসেস নরিস বলেছেন। জেল থেকে কয়েদী পালালে নাকি ওরকম বাজিয়ে হুঁশিয়ার করে দেয়া হয় গ্রামবাসীকে।'

'আর আমরা এদিকে কি ভয়ই না পেয়েছিলাম,' মলিন হেসে মাথা নাড়ল রবিন।

নাস্তা শেষ হলো। এক টুকরো খাবারও পড়ে রইল না। উচ্ছিষ্টও না। যা ছিল, সাবাড় করে দিয়েছে রাফিয়ান।

'কিছু স্যাণ্ডউইচ কিনে নেয়া দরকার,' বলল কিশোর। 'দুপুরে খাওয়ার জন্যে।'

'হ্যাঁ, নাও,' সঙ্গে সঙ্গে বলল মুসা।

বাইরে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে কিশোর বলল, 'মুসা, রবিনের কথা তো বললে। তুমি গোলাঘরে কিভাবে রাত কাটালে বললে না তো।'

এতক্ষণে মনে পড়ল মুসার, রবিনকেও বলা হয়নি রাতের কথা। বলার অবকাশও পায়নি অবশ্য। দুজনে তখন ইয়েলো পণ্ড খোঁজায় এত ব্যস্ত, পেটে খিদে,

আলাপ করার মানসিকতাই ছিল না।

'এক কাণ্ড হয়েছে কাল রাতে,' বলল মুসা। 'ওটা সত্যি ভূতের বাড়ি।'

'তোমার কাছে তো সবই ভূত,' হাত নাড়ল কিশোর। 'চলো, কোথাও বসে শুনি। মনে হচ্ছে, অনেক কিছু বলার আছে তোমার।'

নির্জন একটা জায়গা দেখে ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসল ওরা।

সব খুলে বলল মুসা। চুপ করে শুনল সবাই।

পকেট থেকে কাগজটা বের করে দিল মুসা। ওটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল অন্যেরা। এমন কি রাফিয়ানও ফাঁক দিয়ে মাথা ঢুকিয়ে দিল, যেন মহা-পণ্ডিত।

'আগামাথা কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। 'তবে নকশা-টকশা কিছু হবে। কিসের কে জানে।'

'ব্যাটা বলল,' জানাল মুসা, 'টিকসির কাছে নাকি বাকি অর্ধেক আছে।'

'এই টিকসিটা কে?' বলল জিনা।

'আল্লাহ্ মালুম।'

'রবিনের নামই বা জানল কিভাবে? এই কিশোর, কি ভাবছ?' কনুই দিয়ে কিশোরের পাঁজরে গুঁতো দিল জিনা।

'বুঝতে পারছি না,' মাথা নাড়ল কিশোর।

'আমি পারছি,' দু-আঙুলে চুটকি বাজাল হঠাৎ রবিন।

জিজ্ঞাসু চোখে তার দিকে তাকাল কিশোর।

'মুসা, ছেলেটা কি বলেছিল?' বলল রবিন। 'বলেছিল বুড়ির ছেলের নাম ডারটি রবিন রেখেছে লোকে। গতরাতে আমাকে নয়, ওকেই ডেকেছিল বুলেট-মাথা। বুড়ির ছেলে গোলাঘরে তার জন্যেই অপেক্ষা করেছে। জানে না, আগেই এসে তোমাকে ডারটি ভেবে মেসেজ দিয়ে চলে গেছে লোকটা।'

'ঠিক বলেছ,' একমত হলো মুসা।

আনমনে বলল শুধু কিশোর, 'হুঁ।'

'জেল পালানো কয়েদীর সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই তো?' প্রশ্ন রাখল জিনা।

'অসম্ভব না,' বলল কিশোর। 'হতেও পারে। মেসেজটা সে-ই দিয়ে গেছে হয়তো। কিন্তু কার কাছ থেকে আনল?'

'জেরি?' মুসা বলল।

'জেরি, না? হতে পারে। হয়তো সে এখন জেলে আছে, তার বন্ধু বুলেট-মাথা, পালিয়েছে। বন্ধুর কাছেই মেসেজটা দিয়েছে সে। তাহলে ডারটি রবিন ওদেরই দলের কেউ। কোন বদ-মতলব আছে ব্যাটাদের।'

'কি মতলব?'

'তা জানি না। তবে হতে পারে, পাগলাঘন্টি শুনেই ডারটি বুঝেছে, যে তার বন্ধু পালিয়েছে। মেসেজ নিয়ে আসবে তার কাছে। তাই গোলাঘরে এসে বসেছিল মেসেজের আশায়।'

'হ্যাঁ, তাই হবে,' মাথা দোলাল মুসা।

'অথচ ভুলে মেসেজটা পড়ল এসে তোমার হাতে,' রবিন বলল। 'মুসা, ভূতই

মনে হয় গতরাতে আমাদেরকে পথ ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলেছিল ওখানে, কোন একটা উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে…'

'ধ্যাত, সব বাজে কথা,' হাত নেড়ে মাছি তাড়াল যেন জিনা। 'চলো, গিয়ে পুলিশকে জানাই। কয়েদী ধরতে সুবিধে হবে তাদের।'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'ছুটিতে এসেছি আনন্দ করতে, ডাকাত-টাকাতের খপ্পরে পড়তে চাই না।' ম্যাপ বের করে নীরবে দেখল মিনিটখানেক। 'এই থানা-টানা থাকলে এখানেই থাকবে।'

উঠল ওরা। খুশি হলো রাফিয়ান। নাস্তার পর পরই এত সময় ধরে বসে থাকাটা মোটেই পছন্দ হচ্ছিল না তার। লাফাতে লাফাতে আগে আগে চলল সে।

'পা তো একেবারে ভাল,' ছুটিটা মাঠে মারা যায়নি বলে রবিনও খুশি। 'ভালই হয়েছে, শিক্ষা হয়েছে একটা। বোকার মত আর খরগোশের গর্তে ঢুকবে না।'

হ্যাঁ, সত্যই শিক্ষা হয়েছে রাফিয়ানের। আর গর্তে ঢুকল না। তবে পরের আধ ঘণ্টায় অন্তত ডজনখানেক বার মুখ ঢোকাল খরগোশের গর্তে। ধরা তো দূরের কথা, ছুঁতেও পারল না কোনটাকে। ওর চেয়ে খরগোশের পাল অনেক বেশি ত্যাঁদড়।

খোলা মাঠে বুনো ঘোড়া চরছে।

একবার একটা পাহাড়ী পথে মোড় নিতেই মুখোমুখি হয়ে গেল একপাল বুনো ঘোড়ার। অবাক চোখ মেলে অভিযাত্রীদের দেখল। তারপর একই সঙ্গে ঘুরে খুরের খটাখট তুলে দ্রুত হারিয়ে গেল পাহাড়ের ঢালের বনে। পিছু নেয়ার জন্যে পাগল হয়ে উঠল রাফিয়ান, জোর করে তার গলার বেল্ট টেনে ধরে রাখল জিনা।

'খুব সুন্দর, না?' বলল সে। 'আদর করতে ইচ্ছে করে।'

গতদিনের মতই সকালটা সুন্দর, রোদে উজ্জ্বল। পায়ের তলায় সবুজ ঘাস। একটা ঝর্নার পাড় দিয়ে হাঁটছে এখন। মৃদু ঝিরঝির করে বইছে টলটলে পানি, যেন গান গেয়ে নেচে নেচে ছুটে চলেছে মাতোয়ারা হয়ে।

দুপুরের দিকে জুতো খুলে ঝর্নায় পা ডুবিয়ে বসল ওরা। পায়ে হালকা পালকের মত পরশ বোলাচ্ছে পানি।

স্যাণ্ডউইচ দিয়ে দুপুরের খাওয়া সেরে পেট পুরে খেলো ঝর্নার পানি।

পানিতে পা রেখেই নরম ঘাসে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল জিনা। খোলা নীল আকাশের দিকে তামাটে চোখ। হলুদ রোদে যেন জ্বলছে তামাটে চুল। খুব সুন্দর লাগছে তাকে।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আবার শুরু হলো চলা।

ডিয়াটোতে কখন পৌঁছবে জানে না। তবে তাড়াও নেই। সাঁঝের আগে কোন ফার্মহাউস খুঁজে পেলেই হলো। রাতে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

'থানা থাকলে সেটা খুঁজে বের করতে হবে আগে,' বলল কিশোর। 'তারপর ফার্ম…'

ছয়

ডিয়াটোতে থানা আছে। ছোট্ট থানা, একজন মাত্র গ্রামরক্ষী। আশপাশের চারটে গাঁয়ের দায়িত্বে রয়েছে সে, ফলে নিজেকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট না ভাবলেও বেশ দামী লোক মনে করে। শেরিফ হলে কি করত কে জানে।

গ্রামরক্ষী সাহেবের বাড়িটাই থানা। আরামে বসে ডিনার খাচ্ছে, এই সময় এসে হানা দিল অভিযাত্রীরা। লোভনীয় সসেজ আর তাজা কাটা পেঁয়াজগুলোর দিকে তাকিয়ে উঠে এল বিরক্ত হয়ে।

'কি চাই?' কম-বয়েসীদের দু-চোখে দেখতে পারে না লোকটা। তার মতে, সব ছেলেমেয়েই বিচ্ছু, গোলমাল পাকানোর ওস্তাদ। কিশোর-বয়েসীগুলো বেশি ইবলিস।

'অদ্ভুত কতগুলো ঘটনা ঘটেছে, স্যার,' ভদ্রভাবে বলল কিশোর। 'ভাবলাম, শেরিফকে জানানো দরকার। আপনি কি শেরিফ?'

'অ্যাঁ?...হ্যাঁ...না না, কি বলবে বলো জলদি।'

'গতরাতে একজন কয়েদী পালিয়েছিল।'

'মরেছে,' বলে উঠল লোকটা, 'তুমিও দেখেছ বলতে এসেছ। কতজন যে এল, সবাই নাকি দেখেছে। একজন লোক একসঙ্গে এতগুলো জায়গায় যায় কি করে, ঈশ্বরই জানে।'

'আমি না,' শান্ত রইল কিশোর, 'আমার এই বন্ধু। গতরাতে সত্যি দেখেছে। একটা মেসেজ নিয়ে এসেছিল লোকটা।'

'তাই নাকি?' তরল কণ্ঠে বলল গ্রামরক্ষী। 'তোমার বন্ধু তাহলে আরেক কাটি বাড়া। শুধু দেখেইনি, মেসেজও পেয়েছে। তা মেসেজটা কি? স্বর্গে যাওয়ার ঠিকানা?'

অনেক কষ্টে কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রেখে বলল মুসা, 'টু-ট্রীজ, ব্ল্যাক ওয়াটার, ওয়াটার মেয়ার, টিকসি নোজ।'

'বাহ্, বেশ ভাল ছন্দ তো,' ব্যঙ্গ করল গ্রামরক্ষী। 'টিকসিও জানে। তাহলে টিকসিকে গিয়ে বলো, কি কি জানে এসে বলে যেতে আমাকে। তোমাদের আরেক বন্ধু বুঝি?'

'না, তাকে চিনি না,' অপমানিত বোধ করছে মুসা। কড়া জবাব এসে যাচ্ছিল মুখে, কোনমতে সামলাল। 'আমার জানারও কথা নয়, যদি না লোকটা এসে বলত। ভাবলাম, বুঝতে পারে এমন কাউকে জানিয়ে যাই। এই যে, এই কাগজটা দিয়েছিল।'

ছেঁড়া পাতাটা হাতে নিয়ে দুর্বোধ্য আঁকিবুকির দিকে চেয়ে বাঁকা হাসল গ্রামরক্ষী। 'আরে, আবার কাগজও দিয়েছে। কি লেখা?'

'আমি কি জানি?' হাত ওল্টালো মুসা। আর সহ্য করতে পারছে না। 'সে-জন্যেই তো আপনার কাছে নিয়ে এসেছি। কয়েদী ধরতে সুবিধে হবে ভেবে।'

'কয়েদী ধরব?' কুটিল হাসি ফুটল লোকটার মুখে। 'এত কিছু জানো, আর আসল কথাটা জানো না? কয়েদী ব্যাটা ধরা পড়েছে ঘন্টাচারেক আগে। ঘোড়ার গাড়ি চুরি করে নিয়ে পালাচ্ছিল। এতক্ষণে জেলে ঢোকানো হয়েছে আবার।' কণ্ঠস্বর পাল্টে গেল, হাসি হাসি ভাবটা উধাও হয়েছে চেহারা থেকে। 'আর শোনো, ছেলেছোকরাদের ডেঁপোমি আমি সইতে পারি না। আর কক্ষণো...'

'ডেঁপোমি করছি না, স্যার,' কালো হয়ে গেছে কিশোরের মুখ। 'সত্যি-মিথ্যে বোঝার ক্ষমতা নেই, চোর ধরেন কি করে?'

রাগে গোলাপী হয়ে গেল গ্রামরক্ষীর গাল। কয়েক মুহূর্ত কথা বলতে পারল না। তার মুখের ওপর এভাবে আর কখনও বলেনি কেউ। 'দেখো খোকা...'

'আমি খোকা নই। বয়েস আরেকটু বেশি।'

চড়ই মেরে বসবে যেন গ্রামরক্ষী, এত রেগে গেল।

পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে লোকটার প্রায় নাকের নিচে ঠেলে দিল কিশোর, 'নিন, এটা পড়লেই অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

নিচের সই আর সীল দেখেই চেহারা অন্যরকম হয়ে গেল গ্রামরক্ষীর, সামলে নিল নিজেকে। কাগজটা নিয়ে পড়ল। লেখা আছে ঃ

এই কার্ডের বাহক ভলানটিয়ার জুনিয়র, রকি বীচ পুলিশকে সহায়তা করছে। একে সাহায্য করা মানে পক্ষান্তরে পুলিশকেই সাহায্য করা।

—ইয়ান ফ্লেচার
চীফ অভ পুলিশ
লস অ্যাঞ্জেলেস।

মুখ কালো করে কার্ডটা ফিরিয়ে দিয়ে বলল গ্রামরক্ষী, 'তা এখন কি করতে হবে আমাকে? রিপোর্ট লিখে নিতে হবে?'

'সেটা আপনার ইচ্ছে,' ঝাল ঝাড়ল কিশোর।

'ঠিক আছে, লিখে নিচ্ছি,' পকেট থেকে নোটবই বের করল গ্রামরক্ষী, নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও। 'তবে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি, এটা তোমাদের রকি বীচ নয়। এখানকার চোর-ছ্যাঁচোড়রা অন্যরকম। গলাকাটা ডাকাত। ওদের সঙ্গে গোলমাল করতে গেলে বিপদে পড়বে।'

'সে-ভয়েই বুঝি কেঁচো হয়ে থাকো, ব্যাটা,' বলার খুব ইচ্ছে হলো কিশোরের। বলল, 'সেটা দেখা যাবে। দিন, আমাদের কাগজটা দিন।'

কয়েকজন কিশোরের কাছে হেরে গিয়ে মেজাজ খিঁচড়ে গেছে গ্রামরক্ষীর, কি ভাবল কে জানে, দুই টানে ফড়াত ফড়াত করে চার টুকরো করে ফেলল মেসেজটা, ফেলে দিল মাটিতে। বলল, 'রিপোর্ট লেখা দরকার, লিখে নিয়েছি। কিন্তু বাজে কাগজ ছেঁড়ার জন্যে কচুটাও করতে পারবে না কেউ আমার,' বলে নাক দিয়ে বিচিত্র শব্দ করে, গটমট করে চলে গেল ঘরের দিকে।

'আস্ত ইতর!' লোকটা শুনল কিনা, কেয়ারই করল না জিনা। 'এমন করল কেন?'

'লোকটাকেও দোষ দিতে পারি না,' কাগজের টুকরোগুলো কুড়িয়ে নিচ্ছে মুসা, সেদিকে চেয়ে বলল কিশোর। 'যা একখান গল্প এসে বলেছি, বিশ্বাস করবে কি? ওর জায়গায় আমি হলেও করতে চাইতাম না। এদিকের গাঁয়ের লোক এমনিতেই বানিয়ে কথা বলার ওস্তাদ।'

'তবে একটা সুখবর দিয়েছে,' রবিন বলল। 'কয়েদী ধরা পড়েছে। ডাকাতটা ছাড়া থাকলে বনেবাদাড়ে ঘুরে শান্তি পেতাম না, মন খচখচ করতই।'

'ভাবতে হবে,' কিশোর বলল। 'তবে আগে খাবার ব্যবস্থা করা দরকার। এখানে অনেক ফার্মহাউস আছে, দেখা যায়।'

গ্রামরক্ষীর বাড়ির কাছ থেকে সরে এল ওরা। ছোট একটা মেয়েকে দেখে জিজ্ঞেস করল, এমন কোন ফার্মহাউস আছে কিনা, যেখানে খাবার কেনা যায়।

'ওই তো, পাহাড়ের মাথায় একটা,' হাত তুলে দেখাল মেয়েটা। 'আমার দাদুর বাড়ি। দাদী খুব ভাল, গিয়ে চাইলেই পাবে।'

'থ্যাংকস,' বলল কিশোর।

ঘুরে ঘুরে পাহাড়ের ওপর উঠে গেছে পথ। বাড়ির কাছাকাছি হতেই কুকুরের ঘেউ ঘেউ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে পিঠের রোম খাড়া হয়ে গেল রাফিয়ানের, চাপা গোঁ গোঁ করে উঠল।

'চুপ, রাফি,' মাথায় আলতো চাপড় দিল জিনা। 'খাবারের জন্যে এসেছি এখানে। ওদের সঙ্গে গোলমাল করবি না।'

বুঝল রাফিয়ান। রোম স্বাভাবিক হয়ে গেল আবার, গোঁ গোঁ বন্ধ। রেগে ওঠা কুকুরদুটোর দিকে বন্ধু সুলভ চাহনি দিয়ে তার ফোলা লেজটা ঢুকিয়ে নিল দুই পায়ের ফাঁকে।

'এই, কি চাও?' ডেকে জিজ্ঞেস করল একজন লোক।

'খাবার,' চেঁচিয়ে জবাব দিল কিশোর। 'ছোট একটা মেয়েকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সে বলল এখানে পাওয়া যাবে।'

'দাঁড়াও, মাকে জিজ্ঞেস করি,' বলে বাড়ির দিকে চেয়ে ডাকল লোকটা, 'মা? মা?'

সাংঘাতিক মোটা এক মহিলা বেরিয়ে এলেন, চঞ্চল চোখ, আপেলের মত টুকটুকে গাল।

'খাবার চায়,' ছেলেদের দেখিয়ে বলল লোকটা।

'এসো,' ডাকলেন মহিলা। 'এই চুপ, চুপ,' নিজেদের কুকুরগুলোকে ধমক দিলেন।

দেখতে দেখতে কুকুরদুটোর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ফেলল রাফিয়ান। ছোটাছুটি খেলা শুরু করল।

বেশ ভাল খাবার। পেট ভরে খেলো অভিযাত্রীরা। রাফিয়ান তো এত বেশি গিলেছে, নড়তে পারছে না, খালি হাঁসফাঁস করছে।

ওরা খাবার টেবিলে থাকতেই সেই ছোট মেয়েটা এসে ঢুকল। 'হাই,' হাসল সে। 'বলেছিলাম না, আমার দাদী খুব ভাল। আমি নিনা। তোমরা?'

একে একে নাম বলল কিশোর। তারপর বলল, 'ছুটিতে ঘুরতে এসেছি। খুব চমৎকার কিন্তু তোমাদের অঞ্চলটা। কয়েক জায়গায় তো ঘুরলাম, বেশ ভাল লাগল। আচ্ছা, টু-ট্রীজটা কোথায় বলতে পারো?'

মাথা নাড়ল মেয়েটা। 'আমি জানি না। দাঁড়াও, দাদীকে জিজ্ঞেস করি। দাদী? ও দাদী?'

দরজায় উঁকি দিলেন মহিলা। 'কি?'

'টু-ট্রীজ? খুব সুন্দর জায়গা। এখন অবশ্য নষ্ট হয়ে গেছে। একটা হ্রদের ধারে, জংলা জায়গা। হ্রদটার নাম যে কি...কি...'

'ব্ল্যাক ওয়াটার?' কিশোর বলল।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্ল্যাক ওয়াটার। ওখানে যাচ্ছে নাকি? খুব সাবধান। আশেপাশে জঙ্গল, জলা...তো, আর কিছু লাগবে-টাগবে ?'

'আরিব্বাপরে। আরও? না, না,' হাসল কিশোর, 'পেট নিয়ে নড়তে পারছি না। খুব ভাল রেঁধেছেন। বিলটা যদি দেন। আমাদের এখন যেতে হবে।'

বিল আনতে চলে গেলেন মহিলা।

নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল মুসা, 'কোথায় যেতে হবে? ব্ল্যাক ওয়াটার?'

হ্যাঁ-না কিছুই বলল না কিশোর, নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে আনমনে বলল শুধু, 'কালোপানি।'

সাত

ফার্মহাউস থেকে বেরিয়ে বলল কিশোর, 'টু-ট্রীজ কতদূরে, সেটা আগে জানা দরকার। সম্ভব হলে আজই যাব, নইলে কাল। বেলা এখনও আছে।'

'কতদূরে সেটা, কি করে জানছি?' বলল মুসা। 'ম্যাপ দেখে বোঝা যাবে?'

'যদি ম্যাপে থাকে। থাকার তো কথা, হ্রদ যখন।'

উপত্যকায় নেমে এল আবার ওরা। রাস্তা থেকে দূরে নির্জন একটা জায়গা দেখে এসে বসল।

ম্যাপ বের করে বিছাল কিশোর।

চারজনেই ঝুঁকে এল ওটার ওপর।

সবার আগে রবিনের চোখে পড়ল। ম্যাপের এক জায়গায় আঙুলের খোঁচা মেরে বলল, 'এই যে, ব্ল্যাক ওয়াটার।...কিন্তু টু-ট্রীজ তো দেখছি না।'

'ধ্বংস হয়ে গেলে সেটা আর ম্যাপে দেখানো হয় না, যদি কোন বিশেষ জায়গা না হয়। যাক, ব্ল্যাক ওয়াটার তো পাওয়া গেল। তো, কি বলো, যাব আজ? কত দূরে, বুঝতে পারছি না।'

'এক কাজ করলে পারি,' জিনা প্রস্তাব দিল। 'পোস্ট অফিসে খোঁজ নিলে পারি, ডাকপিয়নের কাছে। সব জায়গায়ই চিঠি বিলি করে, কোথায় কি আছে, সে-ই

সবচেয়ে ভাল বলতে পারবে।'

সবাই একমত হলো।

সহজেই খুঁজে বের করা গেল পোস্ট অফিস। গাঁয়ের একটা দোকানের এক অংশে অফিস, দোকানদারই একাধারে পোস্ট-মাস্টার থেকে পোস্টম্যান। বৃদ্ধ এক লোক, নাকের চশমার ওপর দিয়ে তাকালেন ছেলেদের দিকে।

'ব্ল্যাক ওয়াটার?' বললেন তিনি। 'ওখানে যেতে চাও কেন? সুন্দর জায়গা ছিল এককালে, কিন্তু এখন তো নষ্ট হয়ে গেছে।'

'কি হয়েছিল?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'পুড়ে গেছে। মালিক তখন ওখানে ছিল না, শুধু দুজন চাকর ছিল। এক রাতে হঠাৎ জ্বলে উঠল বাড়িটা, কেন, কেউ বলতে পারে না। পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। দমকল যেতে পারেনি, পথ নেই। কোনমতে ঘোড়ার ছোট গাড়ি-টাড়ি যায়।'

'আর ঠিক করা হয়নি, না?'

'না,' মাথা নাড়লেন বৃদ্ধ। 'বাকি যা ছিল, ওভাবেই পড়ে থাকল। এখন ওটা দাঁড়কাক, পেঁচা আর বুনো জানোয়ারের আড্ডা। অদ্ভুত জায়গা, ভূতের আগুন নাকি দেখা যায়। গিয়েছিলাম একদিন দেখতে। আগুন দেখিনি, তবে হ্রদের কালো পানি দেখেছি। যে রেখেছে, একেবারে ঠিক নাম রেখেছে।'

'কদ্দূর? যেতে কতক্ষণ লাগবে?' জিজ্ঞেস করল জিনা।

'ওরকম একটা জায়গায় কেন যেতে চাও? হ্রদের পানিতে গোসল করতে? পারবে না, পারবে না, নামলে জমে যাবে। ভীষণ ঠাণ্ডা।'

'নাম আর বর্ণনা শুনে খুব কৌতূহল হচ্ছে,' বুঝিয়ে বলল কিশোর। 'কোনদিক দিয়ে যেতে হয়?'

'এভাবে তো বলা যাবে না। ম্যাপ-ট্যাপ থাকলে দেখে হয়তো···আছে তোমাদের কাছে?'

ম্যাপ ছড়িয়ে বিছাল কিশোর।

কলম দিয়ে এক জায়গায় দাগ দিলেন বৃদ্ধ, একটা লাইন আঁকলেন, 'এখান থেকে শুরু করবে, এখানে,' একটা ক্রস দিলেন, 'জায়গাটা। হুঁশিয়ার, ভয়ানক জলা। এক পা এদিক ওদিক ফেলেছ, হঠাৎ দেখবে হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গেছে পাঁকে। তবে হ্যাঁ, প্রকৃতি দেখতে পারবে, এত সুন্দর! হরিণও আছে। ভাল লাগবে তোমাদের।'

'থ্যাংক ইউ, স্যার,' ম্যাপটা রোল করে নিতে নিতে বলল কিশোর। 'যেতে কত সময় লাগবে?'

'এই ঘণ্টা দুয়েক। আজ আর চেষ্টা কোরো না, বোধহয় সময় পাবে না। অন্ধকারে ওপথে যাওয়া?···মরবে!'

হ্যাঁ-না কিছু বলল না কিশোর। আবার ধন্যবাদ দিয়ে বলল, 'আপনার দোকানে ক্যামপিঙের জিনিসপত্র পাওয়া যাবে? দিনটা তো ভারি সুন্দর গেল, রাতটাও বোধহয় ভালই যাবে। গোটা দুই শতরঞ্জি আর কয়েকটা কম্বলও ভাড়া নিতে চাই।'

অবাক হয়ে গেছে অন্য তিনজন। কিশোর কি করতে চাইছে, বুঝতে পারছে না। হঠাৎ বাইরে রাত কাটানোর মতলব কেন?

উঠে গিয়ে তাক থেকে রবারের বড় দুটো শতরঞ্জি নামিয়ে দিলেন বৃদ্ধ। আর চারটে পুরানো কম্বল। 'নাও। কিন্তু এই অক্টোবরে ক্যামপিং করবে? ঠাণ্ডায় না মরো।'

'মরব না,' বৃদ্ধকে কথা দিল কিশোর।

চারজনে মিলে জিনিসগুলো গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে এল দোকান থেকে।

বাইরে বেরিয়েই জিজ্ঞেস করল মুসা, 'কিশোর, কি করবে?'

'এই একটু খোঁজাখুজি করব আরকি,' বলল কিশোর। 'একটা রহস্য যখন পাওয়া গেছে…'

'কিন্তু আমরা এসেছি ছুটি কাটাতে।'

'তাই তো কাটাচ্ছি। রহস্যটা পেয়ে যাওয়ায় সময় আরও ভাল কাটবে।'

কিশোর পাশার এহেন যুক্তির পর আর কিছু বলে লাভ নেই, বুঝে চুপ হয়ে গেল মুসা। অন্য দুজন কিছু বললই না। তর্ক করা স্বভাব নয় রবিনের, আর অ্যাডভেঞ্চার জমে ওঠায় মজাই পাচ্ছে জিনা। সে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কি মনে হয়? টু-ট্রীজে কিছু ঘটতে যাচ্ছে?'

'এখনি বলা যাচ্ছে না। গিয়ে দেখি আগে। খাবার কিনে নিয়ে যাব। এখন রওনা দিলে পৌঁছে যাব অন্ধকারের আগেই। ওখানে কোথাও না কোথাও ক্যাম্প করার জায়গা নিশ্চয় মিলবে। সকালে দেখব কোথায় কি আছে।'

'শুনতে তো ভালই লাগছে,' কুকুরটার দিকে ফিরল জিনা। 'কি বলিস, রাফি?'

'হউ,' সমঝদারের ভঙ্গিতে লেজ নেড়ে সায় দিল রাফিয়ান।

'যাচ্ছি তো,' বলল মুসা, 'কিন্তু ধরো, গিয়ে কিছু পেলাম না। তাহলে? এই রহস্য-টহস্যের কথা…'

'আমার ধারণা, পাবই। যদি না পাই, ক্ষতি কি? ঘুরতেই তো বেরিয়েছি আমরা, নাকি? পিকনিকের জন্যে ব্ল্যাক ওয়াটারের মত জায়গা এখানে আর কটা আছে?'

রুটি, মাখন, টিনে ভরা মাংস ও বিশাল একটা ফ্রুট কেক কিনে নিল কিশোর। কিছু চকলেট আর বিস্কুটও নিল।

মালপত্রের বোঝার জন্যে দ্রুত হাঁটা যাচ্ছে না, তবে অতটা তাড়াহুড়াও নেই ওদের। আঁধার নামার আগে গিয়ে পৌঁছতে পারলেই হলো। দেখতে দেখতে চলেছে।

পাহাড়ের চড়াই-উৎড়াই, সমতল তৃণভূমি, হালকা জঙ্গল, সব কিছু মিলিয়ে এক অপরূপ দৃশ্য। দূরে একদল বুনো ঘোড়া চড়ছে। কয়েকটা চিতল হরিণের মুখোমুখি হলো অভিযাত্রীরা। ক্ষণিকের জন্যে থমকে গেল হরিণগুলো, পরক্ষণেই ঘুরে দে ছুট।

আগে আগে চলেছে কিশোর, খুব সতর্ক, বৃদ্ধ পোস্টম্যানের হুঁশিয়ারিকে গুরুত্ব দিয়ে চলেছে সারাক্ষণ। বার বার ম্যাপ দেখে শিওর হয়ে নিচ্ছে, ঠিক পথেই রয়েছে কিনা।

পাটে বসছে টকটকে লাল সূর্য। ডুবে গেলেই ধড়াস করে নামবে অন্ধকার, এখানকার নিয়মই এই। তবে ভরসা, আকাশ পরিষ্কার, আর শরতের আকাশে

তারাও হয় খুব উজ্জ্বল, তারার আলোয় পথ দেখে চলা যাবে। তবু তাড়াহুড়ো করল ওরা, দিনের আলো থাকতে থাকতেই পৌঁছে যেতে পারলে ভাল, দুর্গম পথে অযথা ঝুঁকি নেয়ার কোন মানে হয় না।

ছোট একটা সমভূমি পেরিয়ে সামনে দেখাল কিশোর, 'জঙ্গল। বোধহয় ওটাই।'

'হ্রদ কোথায়?' বলল রবিন। 'ও হ্যাঁ হ্যাঁ, আছে। কালো।'

কি করে যেন বুঝে গেছে রাফিয়ান, গন্তব্য এসে গেছে। লেজ তুলে সোজা সেদিকে দিল দৌড়। ডেকেও ফেরানো গেল না। তার কাণ্ড দেখে সবাই হেসে অস্থির।

আঁকাবাঁকা পথটা গিয়ে মিশেছে আরেকটা সরু পথের সঙ্গে, তাতে ঘোড়ার গাড়ির চাকার গভীর খাঁজ। দু-ধারের ঘন আগাছা পথের ওপরও তাদের রাজ্য বিস্তৃত করে নিয়েছে।

জঙ্গলে ঢুকল ওরা। বন কেটে এককালে করা হয়েছিল পথটা, মানুষের অযত্ন অবহেলায় বন আবার তার পুরানো স্বত্ব দখল করে নিচ্ছে।

'আমি আসছি,' ঘোষণা দিয়ে দিয়েছে অন্ধকার।

ঠিক এই সময় হঠাৎ করেই টু-ট্রীজের ধ্বংসাবশেষের ওপর এসে যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল অভিযাত্রীরা।

কালো, নির্জন, নিঃসঙ্গ, পোড়া ধ্বংসস্তূপ। ভাঙা দু-একটা ঘর এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে, জানালার পাল্লা আছে, কাচ নেই, ছাতের কিছু কড়িবর্গা আছে, কিন্তু ছাত নেই। মানুষের সাড়া পেয়ে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উড়ে গেল দুটো দোয়েল।

বাড়িটা কালো হ্রদের ঠিক পাড়েই। নিথর, নিস্তব্ধ পানি, সামান্যতম ঢেউ নেই। যেন কালো জমাট বরফ···না না, কালো বিশাল এক আয়না।

'মোটেই ভাল্লাগছে না আমার,' নাকমুখ কোঁচকাল মুসা। 'কেন যে এলাম মরতে।'

আট

কারোই পছন্দ হলো না জায়গাটা। নীরবে হাত তুলে দেখাল কিশোর। মূল বাড়িটা যেখানে ছিল তার দু-ধারে বিশাল দুটো গাছের পোড়া কাণ্ড।

'ওই গাছগুলোর জন্যেই নিশ্চয় নাম রেখেছে টু-ট্রীজ,' বলল সে। 'এতটা নির্জন হবে, ভাবিনি।'

'নির্জন কি বলছ?' বলে উঠল মুসা। 'রীতিমত ভূতুড়ে। গা ছমছম করে।'

সূর্য ডোবার অপেক্ষায়ই যেন ছিল কনকনে ঠাণ্ডা। ফিসফিসিয়ে কানাকানি করে গেল এক ঝলক বাতাস, হাড় কাঁপিয়ে দিয়ে গেল অভিযাত্রীদের।

'এসো,' জরুরী কণ্ঠে বলল কিশোর, 'রাত কাটানোর জায়গা খোঁজা দরকার।'

বিষণ্ন বাড়িটায় নীরবে ঢুকল ওরা। দোতলার কিছুই অবশিষ্ট নেই। নিচতলার অবস্থাও শোচনীয়। তবে এক কোণে শোয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কালো

ছাইতে মাখামাখি আধপোড়া একটা কার্পেট এখনও বিছানো রয়েছে মেঝেতে, বিরাট একটা টেবিলও আছে।

'বৃষ্টি এলে ওটাতে উঠে বসতে পারব,' টেবিলটা দেখিয়ে বলল কিশোর। 'তবে দরকার হবে বলে মনে হয় না।'

'একেবারেই বাজে জায়গা,' রবিনও মুখ বাঁকাল। 'গন্ধ! থাকা যাবে না এখানে।'

'অন্য জায়গা খোঁজা দরকার,' কিশোর বলল। 'অন্ধকারও হয়ে এসেছে। আগে লাকড়ি নিয়ে আসি, আগুনের ব্যবস্থা করে, তারপর...'

জিনাকে রেখে লাকড়ি আনতে বেরোল অন্য তিনজন। শুকনো ডালের অভাব নেই। তিন আঁটি লাকড়ি নিয়ে ফিরে এল ওরা।

জিনা বসে থাকেনি। থাকার জন্যে আরেকটা জায়গা খুঁজে বের করে ফেলেছে, প্রথমটার চেয়ে ভাল।

ছেলেদের দেখাতে নিয়ে চলল সে। রান্নাঘরের এক ধারে মেঝেতে একটা দরজা, পাল্লা তুলে রেখেছে জিনা, নিচে ধাপে ধাপে পাথরের সিঁড়ি নেমে গেছে।

'ভাঁড়ারে গিয়েছে,' সিঁড়ি দেখিয়ে বলল জিনা।

'ঢুকেছিলে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'না, অনুমান। নিচে নিশ্চয় আগুন ঢুকতে পারেনি, ছাই থাকবে না। ওপরের ঘরের চেয়ে ওখানে ভাল হবে। থাকতে পারব।'

টর্চ জ্বেলে নামতে শুরু করল কিশোর, পেছনে অন্যেরা। রাফিয়ান চলেছে তার পাশে পাশে।

কয়েক সিঁড়ি বাকি থাকতেই এক লাফে গিয়ে মেঝেতে নামল কুকুরটা। ওপরেরটার চেয়ে অনেক ভাল ঘর। বিদ্যুতের তার, বোর্ড, সকেট, সুইচ সবই লাগানো আছে। জেনারেটর ছিল, বোঝাই যায়।

ছোট ঘর। মেঝেতে পোকায় খাওয়া কার্পেট। ঘুণে ধরা আসবাবপত্রে ধুলোর পুরু আস্তরণ। ভাঁড়ার-কাম-বসার ঘর ছিল এটা। সারাঘরে মাকড়সার জাল, গালে লাগতেই থাবা দিয়ে সরাল জিনা।

তাকে কিছু মোমবাতি পাওয়া গেল। ভালই হলো। অন্ধকারে থাকতে হবে না।

লাকড়ি এনে ঘরের কোণে জড়ো করে রাখা হলো।

আসবাবগুলো কোন কাজের নয়। ঘুণে খেয়ে একেবারে নষ্ট করে ফেলেছে। একটা চেয়ারে গিয়ে বসেছিল মুসা, মড়মড় করে ভেঙে পড়ল ওটা। হাত-পা ছড়িয়ে মেঝেতে চিতপটাং হলো গোয়েন্দা-সহকারী। হেসে উঠল সবাই।

তবে টেবিলটা মোটামুটি ঠিকই আছে। ধুলো পরিষ্কার করে ওটার ওপর রাখা হলো খাবারের প্যাকেট।

বাইরে অন্ধকার। চাঁদ ওঠেনি। শরতের শুকনো পাতায় মর্মর তুলে ঘুরেফিরে বইছে বাতাস, কিন্তু কালো হ্রদটা আগের মতই নিথর। ছলছলাৎ করে তীরে আছড়ে পড়ছে না ঢেউ।

ভাঁড়ারে আলমারিও আছে একটা। খুলে দেখল কিশোর। 'আরও মোমবাতি, বাহ্, চমৎকার। প্লেট…কাপ…এই, কুয়া-টুয়া চোখে পড়েছে কারও?খাবার পানি লাগবে।'

না, কুয়া দেখেনি কেউ। তবে রবিন একটা জিনিস দেখেছে, ওপরে রান্নাঘরের এক কোণে, সিংকের কাছে। 'বোধহয় পাম্প,' বলল সে। 'চলো দেখি, ঠিক আছে কিনা।'

মোমবাতি জ্বেলে ওপরে উঠে এল সবাই। ঠিকই বলেছে রবিন। পাম্প-ই। ট্যাংকে পানি তোলা হত হয়তো। বড় সিংকের ওপরে কলও আছে, ট্যাংক থেকেই পানি আসত।

হাতল ধরে ঠেলে জোরে জোরে পাম্প করল রবিন। কলের মুখ দিয়ে তোড়ে বেরিয়ে এল পানি, ভিজিয়ে দিল বহুদিনের শুকনো সিংক।

রবিনকে সরিয়ে হাতল ধরল মুসা। পাম্প করে চলল। অনেক বছর পর আবার পানি উঠছে ট্যাংকে। ধুলো-ময়লা আর মরচে মিশে কালচে-লাল হয়ে কলের মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে পানি। ধুয়ে পরিষ্কার হতে সময় লাগবে।

একনাগাড়ে পাম্প করে চলেছে মুসা। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। আস্তে আস্তে পরিষ্কার হচ্ছে পানি।

একটা কাপ ধুয়ে পানি নিল তাতে কিশোর। বরফের মত ঠাণ্ডা পানি, লালচে রঙ রয়েছে সামান্য, তবে সেটা কেটে গেলে স্ফটিকের মত হয়ে যাবে। চুমুক দিয়ে দেখল। 'আহ্, দারুণ। এক্কেবারে যেন ফ্রিজের পানি।'

থাকার চমৎকার জায়গা পাওয়া গেছে, খাবার পানি মিলেছে, আর খাবার তো সঙ্গে করে নিয়েই এসেছে। মোমবাতি আর লাকড়ি আছে প্রচুর। আর কি চাই? বিছানা পেতে আরাম করে জাঁকিয়ে বসল ওরা।

'খিদে পেয়েছে কারও?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'এই মুসা, খাবে?'

'আমারই পেয়েছে, আর ওর পাবে না?' হেসে বলল জিনা।

কিছু রুটি, মাখন আর এক টিন গোশত খুলে নিয়ে বসল ওরা। খেতে খেতেই আলাপ-আলোচনা চলল, আগামীদিন কি কি করবে।

'কি খুঁজছি আসলে আমরা?' জানতে চাইল রবিন। 'কিছু লুকানো-টুকানো আছে ভাবছ?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল কিশোর। 'কি আছে, তা-ও বোধহয় আন্দাজ করতে পারছি।'

'কী?' একই সঙ্গে প্রশ্ন করল তিনজন।

'ধরি, দলের নেতা জেরি। সে রয়েছে জেলে। তার যে বন্ধু পালিয়েছিল, তার কাছে একটা মেসেজ দিয়েছে অন্য দুই বন্ধু বা সহকারীকে দেয়ার জন্যে। সেই দুজনের একজন হলো ডারটি রবিন, অন্যজন টিকসি।'

'ধরা যাক, বেশ বড় ধরনের একটা ডাকাতি করেছে জেরি,' একে একে তিনজনের মুখের দিকে তাকাল কিশোর, আগ্রহে সামনে ঝুঁকে এসেছে ওরা। রাফিয়ানও যেন গভীর আগ্রহে শুনছে, এমনি ভাবসাব, জিনার গা ঘেঁষে রয়েছে। 'কি

ডাকাতি করেছে, জানি না, তবে সম্ভবত গহনা। টাকাও হতে পারে। সেগুলো লুকিয়ে রেখেছে কোথাও। পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হয়ে এলে তারপর বের করবে। যে কারণেই হোক, ডাকাতির পর পরই ধরা পড়ে কয়েক বছরের জন্যে জেলে গেছে সে। ডাকাতির মাল কোথায় রেখেছে, কিছুতেই বলেনি পুলিশকে। কিন্তু পুলিশ ছাড়বে কেন? যেভাবেই হোক, কয়েদীর মুখ থেকে কথা আদায় করবেই। সেটা বুঝতে পেরেছে জেরি। কি করবে সে-ক্ষেত্রে?'

'জেল-পালানো বন্ধুর কাছে মেসেজ দিয়ে দেবে,' বলল রবিন, 'অন্য দুই সহকারীকে জানানোর জন্যে, চোরাই মাল কোথায় আছে। পুলিশ আসার আগেই ওগুলো বের করে নিয়ে চম্পট দেবে ওরা।'

'ঠিক তাই,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

'তাহলে ডাকাতদের আগে আমরা খুঁজে বের করব মালগুলো,' জ্বলজ্বল করছে জিনার চোখ। 'কাল ভোরে উঠেই খোঁজা শুরু করব।'

'হুঁ, তাহলে মেসেজের কোড বুঝতে হবে আগে,' বলল মুসা। 'টু-ট্রীজ আর ব্ল্যাক ওয়াটার তো বুঝলাম। কিন্তু ওয়াটার মেয়ার?'

'জলঘোটকী,' বাংলায় বিড়বিড় করল কিশোর।

'কি বললে?'

'অ্যাঁ…জলঘোটকী, মানে পানির ঘোড়া। বোট…এই কোন নৌকা বা লঞ্চ।'

'ঠিক বলেছ,' তর্জনী দিয়ে জোরে বাতাস কোপাল জিনা। 'যে জন্যে হ্রদ, সে জন্যে নৌকা। গোসলই যদি না করল, সাঁতার না কাটল আর নৌকা নিয়ে মাছ ধরতে না গেল, তাহলে এতবড় হ্রদের ধারে কেন বাড়ি করতে যাবে লোকে? নিশ্চয় একটা বোট আছে কোথাও, তাতে চোরাই মাল লুকিয়েছে ব্যাটারা।'

'কিন্তু অতি সহজে রহস্য ভেদ হয়ে গেল না?' সন্দেহ যাচ্ছে না রবিনের। 'একটা বোটে চোরাই মাল লুকাবে…যে কেউ দেখে ফেলতে পারে বোটটা… তাছাড়া, মেসেজ লেখা কাগজটায় আঁকিবুঁকিগুলো কিসের?'

'মুসা,' হাত বাড়াল কিশোর, 'নকশাটা দেখি?'

পকেট থেকে চার টুকরো ছেঁড়া কাগজ বের করে দিল মুসা।

হাসি মুখে ব্যাগ খুলে এক রোল টেপ বের করে দিল জিনা। 'নাও, কাজে লেগেই গেল। মনে হয়েছিল লাগতে পারে, তাই নিয়েছিলাম।'

'কাজের কাজ করেছ একটা,' কিশোরও হাসল।

টেপ দিয়ে জুড়ে চার টুকরো কাগজ আবার এক করে ফেলা হলো।

'এই যে দেখো,' নকশায় আঙুল রাখল কিশোর,' এখানে চারটে লাইন মিশেছে। প্রত্যেকটা লাইনের শেষ মাথায় লেখা…এত অস্পষ্ট করে লিখেছে…' নুয়ে ভালমত দেখে একটা পড়ল সে, 'টক হিল।…এটা, স্টীপল…'

'আর এটা চিমনী,' রবিন পড়ল তৃতীয় শব্দটা।

'আর এটা হলো টল স্টোন,' চতুর্থটা পড়ল জিনা।

'দিল মাথা গরম করে,' হাত ওল্টাল মুসা। 'বলি, মানে কি এগুলোর?'

'কিছু তো একটা নিশ্চয়,' বলল কিশোর। 'শব্দগুলো মাথায় নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি।

সকাল নাগাদ পরিষ্কার হয়ে যেতে পারে।'

নয়

নকশাটা সাবধানে ভাঁজ করে নিজের কাছে রেখে দিল কিশোর।

'আরেকটা অংশ কিন্তু আছে টিকসির কাছে,' মনে করিয়ে দিল মুসা। 'সেটা ছাড়া সমাধান হবে?'

'হতেও পারে,' বলল কিশোর। 'হয়তো তার কাছেও এটারই আরেক কপি পাঠানো হয়েছে।'

'তাহলে তো সে-ও খুঁজতে আসবে এখানে,' বলল জিনা।

'এলে আসবে,' মুসা বলল। 'লুকিয়ে থাকব।'

'তারও দরকার নেই,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'আমাদের কাছে নকশা আছে জানছে কি করে? দেখে ফেললে বলব, ছুটিতে বেড়াতে এসেছি।'

'তারপর চোখ রাখব তার ওপর,' হাসল রবিন। 'বেটি অস্বস্তি বোধ করবে না?'

'করলে করুক, আমাদের কি…' কথা শেষ না করেই চুপ হয়ে গেল মুসা, কিশোরের মুখের দিকে তাকিয়ে।

গম্ভীর হয়ে গেছে গোয়েন্দাপ্রধান। চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল, 'টিকসি একা আসবে বলে মনে হয় না। হয়তো ডারটিকে নিয়েই আসবে। ডারটির কাছে মেসেজ নেই তো কি হয়েছে? টিকসির কাছে আছে। একই মেসেজ হলে ওই একটাতেই চলবে। ডারটি যদি ওদের সহকারী হয়, কিছুতেই তাকে ফেলে আসবে না টিকসি।'

'হ্যাঁ, তাই তো,' মাথা দোলাল রবিন। 'আর ডারটি মেসেজ পায়নি শুনলে সন্দেহ জাগবে। হুঁশিয়ার হয়ে যাবে।'

'তার মানে যতটা সহজ মনে হয়েছিল,' হাই তুলতে তুলতে বলল রবিন, 'তত সহজ নয় ব্যাপারটা…এহ্, বড্ড ঘুম পেয়েছে। যাই, শুয়ে পড়ি।'

মুসাও হাই তুলল। 'আমিও যাই।'

যার যার বিছানায় শুয়ে পড়ল মুসা আর রবিন। ওদের কাছ থেকে দূরে ঘরের এক কোণে বিছানা পাতল জিনা। শুয়ে পড়ল। তার পায়ের কাছে রাফিয়ান।

একটা রেখে বাকি মোমগুলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল কিশোরও।

দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ল চারজনেই।

লম্বা হয়ে শুয়ে আছে রাফিয়ান, চোখ বন্ধ, কিন্তু কান খাড়া। সামান্যতম শব্দ হলেই নড়েচড়ে উঠছে।

একবার মৃদু একটা শব্দ হতেই ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। নাক উঁচু করে বাতাস শুঁকল, পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সিঁড়ির কাছে। একটা ফাটলে নাক নিয়ে গিয়ে শুঁকল, পরক্ষণেই শান্ত হয়ে ফিরে এল আগের জায়গায়। সাধারণ একটা ব্যাঙ।

মাঝরাতের দিকে আবার মাথা তুলল সে। ওপরে রান্নাঘরে খুটখাট শব্দ হচ্ছে। সিঁড়ি বেয়ে নিঃশব্দে উঠে এল ওপরে। চাঁদের আলোয় পান্নার মত জ্বলে উঠল তার

সবুজ চোখ।

দ্রুত চলে যাচ্ছে একটা জানোয়ার। রোমশ মোটা লেজ। শেয়াল। কুকুরের গন্ধ পেয়েই পালাচ্ছে।

সিঁড়ির মুখে অনেকক্ষণ বসে বসে পাহারা দিল রাফিয়ান। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল আবার।

গলে গলে শেষ হয়ে গেছে মোমটা। ঘর অন্ধকার। অঘোরে ঘুমোচ্ছে সবাই। জিনার পায়ের কাছে এসে আবার শুয়ে পড়ল সে।

সবার আগে ঘুম ভাঙল কিশোরের। শক্ত মেঝেতে শুয়ে পিঠ ব্যথা হয়ে গেছে। চোখ মেলে প্রথমে বুঝতে পারল না কোথায় আছে, আস্তে আস্তে সব মনে পড়ল। সবাইকে ডেকে তুলল সে।

তাড়াহুড়ো করে হাতমুখ ধুয়ে নাস্তা সেরে নিল সবাই। অনেক কাজ পড়ে আছে।

হ্রদের দিকে চলে গেছে একটা সরু পথ। দুই ধারে নিচু দেয়াল ছিল এক সময়, এখন ধসে পড়েছে। শেওলায় ঢেকে গেছে ইঁট। পথ ঢেকে দিয়েছে লতার জঙ্গল, মাঝে মাঝে ছোট ঝোপঝাড়ও আছে। পথের অতি সামান্যই চোখে পড়ে।

তেমনি নিথর হয়ে আছে কালো হ্রদটা। তবে তাতে প্রাণের সাড়া দেখা যাচ্ছে এখন। ওদের দেখে কঁক করে পানিতে ডুব দিল একটা জলমুরগী।

'বোটহাউসটা কোথায়?' আনমনে বলল মুসা। 'আছে না নেই, তাই বা কে জানে।'

হ্রদের ধারের পথ ধরে দ্রুত পা চালানোর চেষ্টা করছে ওরা, পারছে না। নানা রকম বাধা। লতা, ঝোপঝাড় যেন একেবারে পানির ভেতর থেকে গজিয়ে উঠে এসেছে ডাঙায়। বোটহাউস চোখে পড়ছে না।

এক জায়গায় হ্রদ থেকে একটা খাল বেরিয়ে ঢুকে গেছে জঙ্গলেন মধ্যে।

'মানুষের কাটা খাল,' বলল কিশোর। 'নিশ্চয় বোটহাউসে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

খালের পাড় ধরে এগোল ওরা। খানিক পরেই চেঁচিয়ে উঠল কিশোর, 'ওই যে! লাতাপাতায় এমন ঢেকে গেছে, বোঝাই যায় না।' হাত তুলে দেখাল সে।

দেখল সবাই। সরু হতে হতে এক জায়গায় গিয়ে শেষ হয়েছে খাল। ঠিক সেখানে খালের ওপর নেমে গেছে সরু লম্বা একটা বাড়ি। লতাপাতা ঝোপঝাড়ে এমন ঢেকে ফেলেছে, ভালমত না দেখলে ঠাহরই করা যায় না, ওখানে কোন বাড়িঘর আছে।

'মনে হয় ওটাই,' খুশি হয়ে উঠেছে মুসা। 'ওয়াটার মেয়ারকে পেলে হয় এখন।'

বৈঁচি আর এক জাতের কাঁটা-গাছই বেশি। ওগুলোর ভেতর দিয়ে পথ করে এগোতে গিয়ে কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে শরীর, কিন্তু উত্তেজনায় খেয়ালই করছে না ওরা।

বাড়ির সামনেটা পানির দিকে, ওটাই সদর। একটা চওড়া সিঁড়ি উঠে গেছে পানির ধার থেকে।

ওখান দিয়ে ওঠার চেষ্টা করল কিশোর। কিন্তু পা রাখতেই ভেঙে পড়ল পচা তক্তা। হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সে। না, হবে না এদিক দিয়ে। অন্য পথ খুঁজতে হবে।

অনেক খোঁজাখুঁজি করেও আর কোন পথ পাওয়া গেল না।

পুরো বাড়িটাই কাঠ দিয়ে তৈরি। শেওলা জমে রয়েছে সবখানে। এক জায়গায় দেয়ালের তক্তা পচে কালো হয়ে গেছে।

লাথি মারল মুসা। জুতোশুদ্ধ পা ঢুকে গেল পচা কাঠে।

চারজনে মিলে সহজেই দেয়ালের তক্তা ভেঙে বড় একটা ফোকর করে ফেলল। আগে ঢুকল কিশোর। অন্ধকার। বাতাসে কাঠ আর পচা লতাপাতার ভেজা দুর্গন্ধ।

চওড়া সিঁড়িটার মাথায় এসে দাঁড়াল সে। নিচে কালো অন্ধকার পানি, একটা ঢেউও নেই। ফিরে ডাকল, 'এসো, দেখে যাও।'

সিঁড়ির মাথায় এসে নিচে তাকাল সবাই। আবছা অন্ধকার। নৌকা রাখার ছাউনি এটা—বোটহাউস। পানির দিকে মুখ, কিন্তু এখন পুরোপুরি খোলা নেই। আগাছা আর লতা অনেকখানি ঢেকে দিয়েছে। ছাত থেকে ঝুলছে লতা, নিচের পানির ভেতর থেকে গজিয়ে উঠেছে জলজ আগাছা, এরই ফাঁক দিয়ে যতখানি আলো আসতে পারছে, আসছে। তবে অন্ধকার তাতে কাটছে না বিশেষ।

চোখে সয়ে এল আবছা অন্ধকার। দেখতে পাচ্ছে এখন।

'ওই যে নৌকা!' নিচের দিকে দেখিয়ে চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

'খুঁটিতে বাঁধা। ওই তো, আমাদের ঠিক নিচেই একটা।'

মোট তিনটে নৌকা। দুটো অর্ধেক ডুবে রয়েছে পানিতে, দুটোরই গলুই পানির নিচে।

'তলা ফুটো হয়ে গেছে বোধহয়,' ঝুঁকে নিচে চেয়ে আছে কিশোর। কোমরের বেল্ট থেকে টর্চ খুলে নিয়ে জ্বালল। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আলো ফেলে দেখল বোটহাউসের ভেতরে।

দেয়ালে ঝোলানো রয়েছে অনেকগুলো দাঁড়। কতগুলো কালচে থকথকে নরম জিনিস রয়েছে কয়েকটা তাকে, পাটাতনে ফেলে বসার গদি, পচে নষ্ট হয়ে গেছে। এক কোণে একটা নোঙর পড়ে আছে। দড়ির বাণ্ডিল সাজানো রয়েছে একটা তাকে। বিষণ্ণ পরিবেশ। কথা বললেই বিচ্ছিরি প্রতিধ্বনি উঠছে।

পরিত্যক্ত বোটহাউস ভূতের বাসা—মনে পড়ে গেল মুসার। ভয়ে ভয়ে তাকাল চারদিকে। সে-ও টর্চ খুলে নিল। আলো জ্বেলে ভূত তাড়ানোর ইচ্ছে। নিচু গলায় বলল, 'ওয়াটার মেয়ার কোনটা?'

'ওই যে,' একটা নৌকার গলুইয়ের কাছে আলো ফেলে বলল কিশোর, 'ওয়াটার কি যেন?' কয়েক ধাপ নামল সে। 'ও, ওয়াটার লিলি।'

আরেকটা নৌকার গলুইয়ের কাছে আলো ফেলল মুসা।

'অকটোপাস,' বলে উঠল রবিন।

'বাহ্, চমৎকার,' বলল মুসা। 'একটার নাম ওয়াটার লিলি, আরেকটা একেবারে অকটোপাস। মালিকের মাথায় দোষ ছিল।'

'আর ওই যে, ওটার কি নাম?' তৃতীয় নৌকাটা দেখাল জিনা। 'ওটাই ওয়াটার মেয়ার?'

দুটো টর্চের আলো এক সঙ্গে পড়ল নৌকাটার গলুইয়ের কাছে। শুধু 'এম' অক্ষরটা পড়া যাচ্ছে। সাবধানে আরও নিচে নামল কিশোর। তক্তা ভেঙে পানিতে পড়ার ভয় আছে। রুমাল ভিজিয়ে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করল নামের জায়গাটা।

'হুঁ,' বিড়বিড় করল কিশোর, 'অকটোপাস, লিটল মারমেইড, ওয়াটার লিলি···অকটোপাস, জলকুমারী, জলপদ্ম···শিওর, জলঘোটকীও এই পরিবারেরই মেয়ে···'

'অকটোপাসটা ছেলে, না?' বলল মুসা।

'কি জানি,' হাত ওল্টাল কিশোর। 'ওটার মালিকই জানে।'

'কিন্তু ওয়াটার মেয়ারটা কোথায়?' জিনার প্রশ্ন।

'পানিতে ওদিকে কোথাও ডুবে আছে?' বোটহাউসের মুখের দিকে দেখাল মুসা।

'মনে হয় না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'দেখছ না, পানি কম? ডুবে থাকলেও দেখা যেত। তলার বালি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট।'

তবু, আরও নিশ্চিত হওয়ার জন্যে আলো ফেলে দেখল পানির যতখানি চোখে পড়ে। আর কোন নৌকা নেই এখানে।

'গেল কোথায় জলঘোটকী,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে শুরু করল কিশোর। 'কখন? কিভাবে? কেন?'

বোটহাউসের ভেতরটা আরেকবার ভালমত দেখল ওরা। সিঁড়ির কাছে, বোটহাউসের এক পাশের দেয়ালে ঠেস দিয়ে খাড়া করে রাখা হয়েছে কাঠের বড় একটা জিনিস।

'কি ওটা?' জিনা বলল। 'ওহহো, ভেলা।'

কাছে গিয়ে ভেলাটা ভাল করে দেখল সবাই।

'বেশ ভাল অবস্থায়ই আছে,' ভেলার গায়ে হাত বোলাল কিশোর। 'ইচ্ছে করলে আমরা পাঁচজনেই চড়তে পারব এটাতে।'

'দারুণ মজা হবে,' আনন্দে হাত তালি দিয়ে লাফিয়ে উঠল জিনা। 'ভেলায় চড়তে যা ভাল্লাগে না আমার। নৌকার চেয়েও মজার।'

'নৌকাও একটা আছে অবশ্য,' কিছু ভাবছে কিশোর। 'ইচ্ছে করলে ওটাতেও চড়া যায়।'

'আচ্ছা, তিনটে নৌকাই খুঁজে দেখলে হয় না?' প্রস্তাব দিল মুসা। 'লুটের মাল আছে কিনা?'

'দরকার নেই,' বলল কিশোর। 'তাহলে জলঘোটকীর নাম থাকত না মেসেজে। তোমার সন্দেহ থাকলে গিয়ে খুঁজে দেখতে পারো।'

কিশোর পাশা যখন বলছে নেই, থাকবে না।

'এক কাজ করো,' আবার বলল কিশোর। 'সন্দেহ যখন হয়েছে, গিয়ে খুঁজে দেখো। এসব ব্যাপারে হেলাফেলা করা উচিত নয়। শিওর হয়েই যাই।'

'কিন্তু ওয়াটার মেয়ার গেল কোথায়?' বলল সে। 'পরিবারের সবাই এখানে হাজির, আরেকটা গিয়ে লুকাল কোথায়? হ্রদের তীরে কোথাও লুকানো হয়েছে?'

'হ্যাঁ, তা হতে পারে,' ভেলাটা ঠেলছে কিশোর, থেমে গেল। 'ডাঙায় না হোক, পাড়ের নিচে কোথাও কোন গলিঘুপচিতে লুকিয়ে রেখেছে হয়তো।'

'চলো না তাহলে, এখনি খুঁজে দেখি,' ভেলায় চড়ার লোভ আপাতত চাপা দিল জিনা।

দেয়ালের ভাঙা ফোকর দিয়ে আবার বাইরে বেরোল ওরা। বুক ভরে টেনে নিল তাজা বাতাস। বোটহাউসের দুর্গন্ধ থেকে দূরে আসতে পেরে হাঁপ ছেড়েছে। সব চেয়ে বেশি খুশি হয়েছে রাফিয়ান। অন্ধকার ওই ঘরটা মোটেও ভাল লাগছিল না তার। এই তো, কি চমৎকার উষ্ণ রোদ, কি আরামের বাতাস, লেজের রোম কি সুন্দর ফুলিয়ে দেয় ফুঁ দিয়ে।

'কোনদিক থেকে শুরু করব?' বলল রবিন। 'ডান, না বাম?'

নীরবে পানির ধারে এগিয়ে গেল কিশোর, পেছনে অন্যেরা। ডানেও তাকাল, বাঁয়েও। কিন্তু কোন দিকেই কোন পার্থক্য নেই, দু-দিকেই সমান ঘন ঝোপঝাড়।

'পানির কাছাকাছি থাকাই মুশকিল,' বলল কিশোর। 'দেখা যাক তবু। চলো, বাঁ দিক থেকেই শুরু করি।'

শুরুতে জঙ্গল তেমন ঘন নয়, পানির কাছাকাছি থাকা গেল। পানির ওপর ঝুঁকে রয়েছে লতানো ঝোপ, যে কোনটার তলায় লুকিয়ে রাখা যায় নৌকা। উঁকি দিয়ে, পাড়ের নিচে নেমে, যতভাবে সম্ভব, নৌকা আছে কিনা দেখার চেষ্টা করল ওরা।

সিকি মাইল পর থেকেই ঘন হতে শুরু করল জঙ্গল। এত ঘন যে পথ করে এগোনোই কঠিন, থাক তো পানির ধারে গিয়ে উঁকি দেয়া। পানির ধারে মাটি রসাল বলেই বোধহয়, জঙ্গল ওখানে আরও বেশি ঘন।

'নাহ্, এভাবে হবে না,' এক সময় হাল ছেড়ে দিয়ে বলল কিশোর। 'যা কাঁটা। শেষে চামড়া নিয়ে ফিরতে পারব না।'

'হ্যাঁ, কাঁটা বেশিই,' দুই হাতের তালু দেখছে মুসা, কেটে ছড়ে গেছে, কোন আঁচড়, এত গভীর, রক্ত বেরোচ্ছে। 'ঠিকই বলেছ, এভাবে হবে না।'

অন্য দুজনেরও একই অভিমত। আনন্দ পাচ্ছে শুধু রাফিয়ান। বার বার উৎসুক চোখে তাকাচ্ছে বনের দিকে। বুঝতে পারছে না যেন, এত সুন্দর কাঁটা আর ঝোপকে কেন পছন্দ করছে না বোকা ছেলে-মেয়েগুলো?

ছেলেরা যখন ফিরল, রীতিমত আহত বোধ করল রাফিয়ান। হতাশ ভঙ্গিতে হেঁটে চলল ওদের পেছনে।

'ডানে চেষ্টা করে দেখব নাকি?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'নাহ্ লাভ হবে না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'ওদিকে আরও বেশি জঙ্গল। খামোকা সময় নষ্ট। তার চেয়ে এক কাজ করি এসো?...ভেলায় চড়ে ঘুরি?'

'ঠিক বলেছ। দারুণ হবে,' সঙ্গে সঙ্গে বলল জিনা। 'কষ্টও হবে না, তাছাড়া পানির দিক থেকে দেখার সুবিধে অনেক। কোন ঘুপচিই চোখ এড়াবে না। সহজেই খুঁজতে পারব।'

'ইস্, আগে মনে পড়ল না কেন?' আফসোস করল মুসা। 'তাহলে তো এভাবে হাত-পাগুলো ছুলতে হত না।'

জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আবার বোটহাউসের দিকে রওনা হলো ওরা।

হঠাৎ থেমে গেল রাফিয়ান। চাপা গর্জন করে উঠল।

'কি হয়েছে, রাফি?' থেমে গিয়ে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল জিনা।

আবার গোঁ গোঁ করে উঠল রাফিয়ান।

সাবধানে পিছিয়ে গেল চারজনে। একটা ঝোপের ভেতর থেকে মাথা বের করে তাকাল বোটহাউসের দিকে। কই, কিছুই তো নেই? এমন করছে কেন তাহলে রাফিয়ান?

সবার আগে দেখল মুসা। কিশোরের পাঁজরে কনুই দিয়ে গুঁতো দিল।

এক তরুণী, আর একটা লোক। কথা বলছে।

'নিশ্চয় টিকসি,' ফিসফিস করে বলল কিশোর।

'আর ওই ব্যাটা ডারটি রবিন,' মুসা বলল, 'আমি শিওর।'

দশ

ওই দুজন আসবে, জানাই আছে ছেলেদের, তাই চমকাল না।

ডারটিকে চিনতে কোন অসুবিধে হয়নি মুসার। রাতে দেখেছে, সকালেও দেখেছে—চওড়া কাঁধ, সোজা হয়ে দাঁড়ালে সামান্য কুঁজো মনে হয়, মাথায় ঝাঁকড়া চুল। তবে, তার বাড়িতে তাকে যেমন লেগেছিল, এখন ঠিক ততটা ভীষণ মনে হচ্ছে না।

তবে মেয়েমানুষটাকে কেউই পছন্দ করতে পারছে না, একটুও না। পরনে ডোরাকাটা প্যান্ট, গায়ে রঙিন শার্টের ওপর আঁটসাঁট জ্যাকেট, চোখে বেমানান রকমের বড় সানগ্লাস, দাঁতের ফাঁকে চুরুট। ওর কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে, তীক্ষ্ণ স্বর।

'ও-বেটিই তাহলে টিকসি,' ভাবল কিশোর। 'জেরি ডাকাতকে দেখিনি, তবে ভালই সঙ্গিনী জুটিয়েছে ডাকাতটা।'

সঙ্গীদের দিকে ফিরল গোয়েন্দাপ্রধান। রাফিয়ানের গলার বেল্ট টেনে ধরে রেখেছে জিনা, বেরোতে দিচ্ছে না। 'শোনো,' কিশোর বলল, 'ওদেরকে না চেনার ভান করবে। কথা বলতে বলতে বেরোব আমরা, যেন জঙ্গল দেখতে ঢুকেছিলাম। যদি কিছু জিজ্ঞেস করে, বলবে বেড়াতে এসেছি। উল্টো-পাল্টা যা খুশি বলবে। বোঝাব, আমরা মাথামোটা একদল ছেলে-মেয়ে, স্রেফ ছুটি কাটাতে এসেছি। আর বেকায়দা কোন প্রশ্ন যদি করে, চুপ করে থাকবে, আমি জবাব দেব। ও-কে?'

মাথা ঝাঁকাল তিনজনেই।

ঝোপের ভেতর থেকে বেরোল কিশোর হুড়মুড় করে। ডাকল, 'মুসা, এসো।

ওই যে, বাড়িটা দেখা যাচ্ছে। মাই গড, সকালের চেয়েও খারাপ দেখাচ্ছে এখন।'

জিনা আর রাফিয়ান একসঙ্গে লাফিয়ে বেরোল, তাদের পেছনে এল রবিন।

থমকে দাঁড়িয়ে গেল দুই ডাকাত। দ্রুত কি যেন বলল একে অন্যকে। ভুরু কুঁচকে তাকাল লোকটা।

বকবক করতে করতে ওদের দিকে এগোল ছেলেরা।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল মেয়েমানুষটা, 'কে তোমরা? এখানে কি করছ?'

'বেড়াতে এসেছি,' জবাব দিল কিশোর। 'ঘোরাফেরা করছি। স্কুল ছুটি।'

'এখানে কেন এসেছ? এটা প্রাইভেট প্রপার্টি।'

'তাই নাকি?' বোকার অভিনয় শুরু করল কিশোর। 'পোড়া, ভাঙাচোরা বাড়ি, জঙ্গল···যার খুশি এখানে আসতে পারে। আসলে লেকটা দেখতে এসেছি। খুব নাম শুনেছি তো।'

পরস্পরের দিকে তাকাল দুই ডাকাত। ছেলেদের দেখে অবাক হয়েছে, বোঝা যায়।

'কিন্তু এ-হ্রদ দেখতে আসা উচিত হয়নি,' বলল মেয়েমানুষটা। 'খুব বাজে জায়গা, বিপদ হতে পারে। সাঁতার কাটা কিংবা নৌকা-চড়া এটাতে নিষেধ।'

'তা-তো বলেনি আমাদেরকে!' যেন খুব অবাক হয়েছে কিশোর। 'নিষিদ্ধ, তা-ও বলেনি। আপনারা ভুল খবর পেয়েছেন।'

'বাহ্, কি সুন্দর একটা ডাহুক গো!' হাত তালি দিয়ে নেচে উঠল রবিন। চোখ বড় বড় হয়ে গেছে হ্রদের দিকে চেয়ে। 'কি ভাল জায়গা। কত জানোয়ার আর পাখি যে আছে।'

'বুনো ঘোড়াও নাকি অনেক,' মুসা যোগ করল। 'গতকালই তো দেখলাম কয়েকটাকে। খুব সুন্দর ছিল, না?'

দ্বিধায় পড়ে গেল দুই ডাকাত।

কড়া গলায় ধমক দিল ডারটি, 'চুপ! যত্তোসব! এখানে আসা নিষেধ, শুনছ? ঘাড়ে হাত পড়ার আগে কাটো।'

'নিষেধ?' কণ্ঠস্বর হঠাৎ পাল্টে ফেলল কিশোর, কঠিন হয়ে উঠেছে চেহারা। 'তাহলে আপনারা এখানে কি করছেন? আর, ভদ্রভাবে কথা বলুন।'

'তবে রে আমার ভদ্রলোক!' চেঁচিয়ে উঠল ডারটি, গেছে মেজাজ খারাপ হয়ে। শার্টের হাতা গোটাতে গোটাতে আগে বাড়ল।

রাফিয়ানের বেল্ট ছেড়ে দিল জিনা।

সামনে এগোল কুকুরটা। ভয়ানক হয়ে উঠেছে চেহারা, ঘাড়ের রোম খাড়া। চাপা ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে গলার গভীরে।

চমকে গেল ডারটি। পিছিয়ে গেল আবার। 'ধরো, কুত্তাটাকে ধরো! হারামী জানোয়ার!'

'হারামী লোকের জন্যে হারামী জানোয়ারই দরকার,' শান্ত কণ্ঠে বলল জিনা। 'তুমি যেমন কুকুর, ও-ও তেমন মুগুর। তোমরা যতক্ষণ কাছে-পিঠে থাকছ, ওকে ছেড়ে রাখব।'

চাপা গর্জন করে আরও দুই কদম এগোল রাফিয়ান। চোখে আগুন।

চেঁচিয়ে উঠল মেয়েলোকটা, 'হয়েছে হয়েছে, রাখো। এই মেয়ে, তোমার কুত্তাটা ধরো। আমার এই বন্ধু না...ওর মেজাজ ভাল না।'

'আমার এই বন্ধুটিরও মেজাজ খারাপ,' রাফিয়ানকে দেখাল জিনা। 'তোমাদের সইতে পারছে না। ঘাড়ে কামড় দিতে চায়। কতক্ষণ আছ তোমরা?'

'সেটা তোমাকে বলব কেন?' গর্জে উঠল ডারটি।

তার গর্জনের জবাবে দ্বিগুণ জোরে গর্জে উঠল রাফিয়ান। আরেক পা পিছিয়ে গেল ডারটি।

'চলো, খিদে পেয়েছে,' সঙ্গীদের বলল কিশোর। 'এদের নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু নেই। আমরা যেমন অন্যের জায়গায় এসেছি, ওরাও এসেছে।'

সহজ ভঙ্গিতে হাঁটতে শুরু করল অভিযাত্রীরা। দুই পা এগিয়ে ফিরে চেয়ে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে আরেকবার শাসাল রাফিয়ান; তারপর চলল বন্ধুদের সঙ্গে।

দুই ডাকাতের চোখে তীব্র ঘৃণা, কিন্তু বিশাল কুকুরটার ভয়ে কিছু করতে পারল না, দৃষ্টির আগুনে ছেলেদের ভস্ম করার চেষ্টা চালাল শুধু।

ওদেরকে আরও রাগিয়ে দেয়ার জন্যে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল জিনা, 'রাফি, খেয়াল রাখবি। ব্যাটাটাকে ধরবি আগে।'

পোড়া বাড়িটায় পৌঁছল ওরা। বলতে হলো না, রান্না ঘরের দরজায় পাহারায় বসল রাফিয়ান। দুই ডাকাতের দিকে ফিরে মুখ ভেঙচাল একবার, বুঝিয়ে দিল, কাছে এলে ভাল হবে না।

ভাঁড়ারে ঢুকল অন্যেরা। যেটা যেমন রেখে গিয়েছিল, তেমনিই আছে, কেউ হাত দেয়নি।

'ঢোকেইনি হয়তো এখনও,' বলল কিশোর। 'দেখেনি। যতটা ভেবেছি, তার চেয়েও বাজে লোক ওই দুটো, টিকসি আর ডারটি।'

'হ্যাঁ,' একমত হলো মুসা, 'জঘন্য। মেয়েমানুষটা বেশি খারাপ। চেহারাটাও জানি কেমন রুক্ষ।'

'আমার কাছে ডারটিকেই বেশি খারাপ লেগেছে,' রবিন বলল। 'আস্ত একটা গরিলা। চুল কাটে না কেন?'

'কি জানি,' একটা রুটির মোড়ক খুলতে শুরু করল জিনা। 'হয়তো ভাবছে সিনেমায় চান্স-টান্স পাবে। টারজানের বিকৃত সংস্করণ।'

'রাফি না থাকলে কিন্তু বিপদে পড়তাম,' বলল রবিন। 'ও-ই ঠেকিয়েছে ব্যাটাদের।'

'কি করছে ব্যাটারা, দেখে আসা দরকার,' প্রায় অর্ধেকটা পাঁউরুটি আর এক খাবলা মাখন তুলে নিয়ে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল মুসা।

আধ মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল সে। রুটি আর মাখন শেষ। 'ব্যাটাকে দেখলাম বোটহাউসের দিকে যাচ্ছে। ওয়াটার মেয়ারকে খুঁজতে বোধহয়।'

'হুঁ,' খেতে খেতে বলল কিশোর। 'ব্যাপারটা নিয়ে আরও ভালমত ভাবতে হবে। কি করবে ওরা এখন? জানা আমাদের জন্যে খুব জরুরী। হয়তো মেসেজের

পাঠোদ্ধার করে ফেলেছে ওরা,' কঠিন শব্দ ব্যবহার শুরু করল সে। 'ওদের ওপর চোখ রাখতে হবে। দুর্বল মুহূর্তে কিছু ফাঁস করে দিতে পারে আমাদের কাছে।'

'মেসেজের সঙ্গে যে নকশাটা দিয়েছে জেরি, নিশ্চয় তার কোন মানে আছে,' আপনমনে বলে যাচ্ছে গোয়েন্দাপ্রধান। 'হয়তো সেটা বুঝতে পেরেছে ডারটি আর টিকসি।' রুটি চিবাতে চিবাতে ভাবনার অতলে তলিয়ে গেল সে। দীর্ঘ নীরবতার পর ভেসে উঠল আবার। 'আজ বিকেলেই কিছু একটা করতে হবে আমাদের। ভেলাটা ভাসিয়ে বেরিয়ে পড়ব হ্রদে। যে কোন ছেলেমেয়েই তা করতে পারে, এতে কিছু সন্দেহ করবে না দুই ডাকাত। নৌকাটা খুঁজব আমরা। আর যদি হ্রদে বেরোয় টিকসি আর ডারটি, একই সঙ্গে ওদের ওপরও চোখ রাখতে পারব।'

'চমৎকার বুদ্ধি,' আঙুলে চুটকি বাজাল জিনা। 'দারুণ সুন্দর বিকেল। হ্রদে ভেলা ভাসিয়ে দাঁড় টানা···আউফ! এখুনি বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে।'

'আমারও,' মাথা কাত করল মুসা। 'ভেলাটা আমাদের ভার সইতে পারলেই হয়···জিনা, আরেক টুকরো কেক দাও তো। বিস্কুট আছে?'

'অনেক,' জবাব দিল রবিন। 'চকলেটও আছে।'

'খুব ভাল,' এক কামড়ে এক স্লাইস কেকের অর্ধেকটা কেটে নিয়ে চিবাতে শুরু করল মুসা। 'এখানেই থাকতে হবে মনে হচ্ছে। খাবারে টান না পড়লেই বাঁচি।'

'যে হারে গেলা শুরু করেছ,' জিনা ফোড়ন কাটল, 'শেষ না হয়ে উপায় আছে? বিদেশ-বিভুঁই, খাবারের সমস্যা আছে, একটু কম করে খাও না বাবা···'

'জিনা,' হাত বাড়াল কিশোর, 'জগটা দাও তো, পানি নিয়ে আসি। আর রাফির জন্যে কি দেবে দাও।'

ধীরে সুস্থে পুরো আধ ঘণ্টা লাগিয়ে লাঞ্চ শেষ করল ওরা। এবার বোটহাউসে গিয়ে ভেলা নিয়ে বেরোনো যায়।

বোট হাউসের দিকে রওনা হলো ওরা।

হ্রদের দিকে চেয়ে হঠাৎ বলে উঠল কিশোর, 'দেখো দেখো, ওই যে। নৌকা নিয়ে বেরিয়েছে ব্যাটারা। নিশ্চয় জলকুমারী, ওটাই একমাত্র ডোবেনি। শিওর, জলঘোটকীকে খুঁজছে ওরা।'

দাঁড়িয়ে গেল সবাই। মুসার মুখ গোমড়া হয়ে গেল। এত কষ্ট কি শেষে মাঠে মারা যাবে? তাদের আগেই ওয়াটার মেয়ারকে পেয়ে যাবে ওই দুই ডাকাত? ওরা কি জানে, নৌকাটা কোথায় লুকানো।

দেয়ালের ফোকর দিয়ে বোটহাউসে ঢুকল ওরা। সোজা এগোল ভেলার দিকে। ঠিকই আন্দাজ করেছে কিশোর, লিটল মারমেইডকেই নিয়ে গেছে।

ভেলার কোণার চার ধারে দড়ির হাতল লাগানো রয়েছে, ধরে নামানোর জন্যে। চারজনে চারটে হাতল ধরে ভেলাটা তুলে নিয়ে চওড়া সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল। সতর্ক রয়েছে, ভারের চোটে না আবার ভেঙে পড়ে পুরানো সিঁড়ি।

ভাঙল না। পানির কিনারে চলে এল ওরা।

'এবার ছাড়ো,' বলল কিশোর। 'আস্তে।'

যতটা পারল আস্তেই ছাড়ল ওরা, কিন্তু ভারি ভেলা। ঝপাত করে পড়ল

পানিতে, পানি ছিটকে উঠে ভিজিয়ে দিল ওদের শরীর।

'দাঁড়গুলো খুলে নিয়ে এসো,' এক কোণার হাতল ধরে রেখেছে কিশোর, নইলে ভেসে যাবে ভেলা। 'জলদি।'

এগারো

ছোট-বড় বিভিন্ন আকারের দাঁড় ঝোলানো রয়েছে দেয়ালে। ভেলা বাওয়ার জন্যে বিশেষভাবে তৈরি চারটে ছোট দাঁড় রয়েছে ওগুলোর মধ্যে। খুলে নিয়ে আসা হলো ওগুলো।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখছে রাফিয়ান। কোন কাজে সহায়তা করতে পারছে না। খারাপ লাগছে তার, বুঝিয়ে দিচ্ছে ভাবেসাবে।

কোণের হাতল ধরেই রয়েছে কিশোর। দাঁড় হাতে আগে উঠল মুসা। বালিতে দাঁড়ের ঠেকা দিয়ে ভেলা আটকাল। এরপর উঠল জিনা। দুজনেই দাঁড় বাওয়ায় ওস্তাদ। রবিন উঠল। সব শেষে উঠল কিশোর···না না, ভুল হলো, রাফিয়ানের আগে উঠল সে।

'রাফি, আয়,' হাত নেড়ে ডাকল জিনা। 'এ-রকম নৌকায় চড়িসনি আগে, কিন্তু অসুবিধে হবে না। আয়।'

সিঁড়ি বেয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে পানির কিনারে নেমে এল রাফিয়ান। কালো পানি শুঁকল একবার, পছন্দ হচ্ছে না। তবে আর ডাকের অপেক্ষা করল না। মস্ত এক লাফ দিয়ে হঠাৎ করে এসে পড়ল ভেলায়।

জোরে ঝাঁকি দিয়ে এক পাশে কাত হয়ে গেল ভেলা।

দ্রুত আরেক পাশে একেবারে কিনারে চলে গেল রবিন, ভারসাম্য ঠিক করল। হেসে বলল, 'চুপ করে বোস। যা একখান বপু তোমার, নড়াচড়ারই আর জায়গা নেই। ডুবিয়ে মেরো না সব্বাইকে।'

রবিনের কথায় কিছু মনে করল না রাফিয়ান। চুপ করে বসল।

বালিতে দাঁড়ের মাথা ঠেকিয়ে লগি-ঠেলার মত করে ভেলাটাকে বোটহাউস থেকে বের করে আনতে শুরু করল মুসা। জিনাও হাত লাগাল। বোটহাউসের মুখের লতাপাতা অনেকখানি পরিষ্কার করে নিয়েছে দুই ডাকাত, নৌকা বের করার সময়। কাজেই ছেলেদের আর কিছু পরিষ্কার করতে হলো না। সহজেই খালে বেরিয়ে এল ওরা।

শান্ত পানি, ভেলাটাও শান্তই রইল। ঢেউ থাকলে অসুবিধে হত, বোঝা বেশি।

এক সঙ্গে দাঁড় বেয়ে চলল চারজনে।

রাফিয়ান দাঁড়িয়ে দেখছে। ভেলার পাশ দিয়ে সাঁ সাঁ করে সরে যাচ্ছে পানি, বেশ মজা পাচ্ছে সে। ভাবছে বোধহয়, এটাও কোন ধরনের নৌকা। সাবধানে সামনের এক পা বাড়িয়ে পানি ছুঁল সে, ঠাণ্ডা, সুড়সুড়ি দিল যেন পায়ে। কুকুরে-হাসি হেসে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল সে, ভোঁতা নাকটা পানি ছুঁই ছুঁই করছে।

'মজার কুকুর তুই, রাফি,' বলল রবিন। 'শুয়েছিস, ভাল। দেখিস, লাফিয়ে

উঠিস না হঠাৎ। ভেলা উল্টে যাবে।'
খালের মুখের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে ভেলা। নৌকাটা দেখা যাচ্ছে না।
'ওই যে,' ভেলা আরও খানিক দূর এগোনোর পর হাত তুলল কিশোর। হ্রদের মাঝেই আছে এখনও নৌকাটা। লিটল মারমেইড। 'পিছু নেব নাকি? দেখব কোথায় যায়?'
'অসুবিধে কি?' বলল মুসা।
জোরে জোরে দাঁড় বাইতে শুরু করল সবাই। দুলে উঠল ভেলা।
'আরে, ও কি করছ?' কিশোরকে বলল মুসা। 'উল্টোপাল্টা ফেলছ তো। ভেলা এগোবে না, ঘুরবে খালি। এভাবে ফেলো, এই এভাবে,' দেখিয়ে দিল সে।
যতই দেখিয়ে দেয়া হোক, বিশেষ সুবিধে করতে পারল না কিশোর আর রবিন। বিরক্ত হয়ে শেষে বলল মুসা, 'না পারলে চুপ করে বসে থাকো। আমি আর জিনাই পারব। খালি খালি অসুবিধে করবে আরও।'
সানন্দে হাত গুটিয়ে বসল কিশোর। দাঁড় বাওয়ার চেয়ে মাথা খাটানো অনেক বেশি পছন্দ তার। তা-ই করল।
জিনা আর মুসাও খুব খুশি, মনের মত কাজ পেয়ে গেছে। ঘেমে উঠছে শরীর। উষ্ণ কোমল রোদ, বাতাস নেই, শরতের নির্মল বিকেল।
'দাঁড় বাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে,' নৌকাটার দিকে ইশারা করে বলল জিনা। 'খুঁজছে। কিশোর, কি মনে হয়? আমাদেরটার মতই মেসেজ আছে ওদের কাছে? ইস্ যদি দেখতে পারতাম।'
কিশোরের নির্দেশে দাঁড় বাওয়া বন্ধ করল মুসা আর টিকসি। এতই ঝুঁকেছে, কপালে কপাল লেগে গেছে প্রায়।
'আস্তে দুই টান দাও তো,' বলল কিশোর। 'আরেকটু কাছে এগোই। দেখি, কি দেখছে ব্যাটারা।'
নৌকার একেবারে পাশে চলে এল ভেলা। ঘেউ ঘেউ করে উঠল রাফিয়ান। চমকে মুখ তুলে তাকাল দুই ডাকাত। ছেলেদের দেখে কালো হয়ে গেল মুখ।
'হাল্লো,' দাঁড় তুলে নাড়ল মুসা, হাসি হাসি মুখ। 'চলেই এলাম। খুব ভাল চলছে ভেলা। তোমাদের নৌকা কেমন?'
রাগে লাল হয়ে গেল টিকসির মুখ। চেঁচিয়ে বলল, 'কাকে বলে ভেলা বের করেছ? বিপদে পড়বে।'
'তাই তো জিজ্ঞেস করতে এলাম,' কিশোর বলল, 'তোমরা কাকে জিজ্ঞেস করে নৌকা বের করেছ। গিয়ে অনুমতি নিয়ে আসব তার কাছ থেকে।'
হেসে উঠল জিনা, গা জ্বালিয়ে দিল দুই ডাকাতের।
কোন জবাব খুঁজে না পেয়ে রাগে ফুলতে শুরু করল টিকসি। ডারটির ভাব দেখে মনে হলো, দাঁড়ই ছুড়ে মারবে কিশোরের মুখে। গর্জে উঠল, 'কাছে আসবি না বলে দিলাম। মেরে তক্তা করে দেব।'
'রাগ করছ কেন, ভাই?' মোলায়েম গলায় বলল মুনা। 'আমরা তো ঝগড়া মিটিয়ে ফেলতে এলাম। ভাব করে নেওয়া ভাল না?'

আবার হেসে উঠল জিনা, বিছুটি ডলে লাগাল যেন ডাকাতদের চামড়ায়।

পারলে ছেলেদের এখন টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে ওরা। কিন্তু সামলে নিল টিকসি। নিচু গলায় দ্রুত কিছু পরামর্শ করল ডারটির সঙ্গে। রাগে বার দুই মাথা ঝাঁকাল গরিলাটা, কিন্তু শেষে মেনে নিল টিকসির কথা। দাঁড় তুলে নিয়ে ঝপাং করে ফেলল পানিতে, দ্রুত বেয়ে চলল।

'চালাও,' বলল কিশোর। 'পিছু নাও,' সে-ও নিষ্ক্রিয় রইল না আর, অসুবিধে না করে যতটুকু সম্ভব সাহায্য করতে চায় দাঁড় বাওয়ায়।

পশ্চিম তীরের দিকে নৌকা নিয়ে যাচ্ছে ডারটি। ভেলাটাও পিছে লেগে রইল। মাঝপথেই সাঁই করে নৌকার মুখ ঘোরাল।

নৌকা হালকা, ভেলা ভারি, চলনও নৌকার চেয়ে ভারি। ফলে, চারজনে বেয়েও একজনের সঙ্গে তাল রাখতে হিমশিম খাচ্ছে। ঘনঘন ওঠানামা করছে বুক।

ডান তীরে নৌকা নিয়ে গেল ডারটি। ভেলাটা কাছাকাছি হওয়ার অপেক্ষায় রইল।

'ভাল এক্সারসাইজ, তাই না?' ডেকে বলল টিকসি। 'স্বাস্থ্যের জন্যে ভাল।'

আবার হ্রদের মাঝখানে রওনা দিল নৌকা।

'খাইছে!' হুঁসস করে মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল মুসা। 'হাত অবশ হয়ে যাচ্ছে আমার। কি করছে ব্যাটারা?'

'খামোকা খাটিয়ে নিচ্ছে,' দাঁড় তুলে ফেলেছে কিশোর। 'আমরা থাকলে জলঘোটকীকে আর খুঁজবে না। খেলাচ্ছে আমাদের।'

'তাহলে আর খেলতে যাচ্ছি না আমি,' বুড়ো আঙুল নাড়ল মুসা। দাঁড় তুলে রেখে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল, হাঁপাচ্ছে।

অন্যেরাও বিশ্রাম নিতে লাগল।

বন্ধুদের অবস্থা দেখে করুণা হলো যেন রাফিয়ানের, উঠে এসে এক এক করে গাল চেটে দিল চারজনেরই। তারপর ভুল করে বসে পড়ল জিনার পেটের ওপর।

'হেই রাফি! আরে, দম বন্ধ হয়ে গেল তো আমার।' কুকুরটাকে জোরে ঠেলে দিল জিনা। 'ভারিও বটে! বাপরে বাপ!'

খুব অন্যায় হয়ে গেছে, বুঝতে পারল রাফিয়ান। আরেকবার জিনার গাল চেটে দিতে গেল।

এত বেশি শ্রান্ত, এসব ভাল লাগছে না জিনার। থাপ্পড় দিয়ে সরিয়ে দিল কুকুরটার মুখ।

'নৌকাটা কই?' উঠে বসে দেখার শক্তিও নেই যেন রবিনের।

গোঙাতে গোঙাতে উঠে বসল কিশোর। 'ওফ্ফ্,' বিকৃত করে ফেলল মুখ, 'পিঠটা গেছে। ব্যথাআ! গেল কই হতচ্ছাড়া নৌকা···ও, ওই যে, খালের দিকে যাচ্ছে। আপাতত জলঘোটকী খোঁজা বাদ।'

'আমাদেরও বাদ দেয়া উচিত,' হাতের পেশী টিপতে টিপতে বলল রবিন। 'যা ব্যথা হয়েছে, কালও বেরোতে পারব কিনা···হেই রাফি, সর! আমার ঘাড়ে কি মধু? যা, চাটতে হবে না।'

'চলো, আমরাও ফিরে যাই,' বলল কিশোর। 'অনেক দেরি হয়ে গেছে। এখন আর নৌকা খোঁজার সময় নেই।'

'চলো,' জিনা বলল। 'দাঁড়াও আরেকটু জিরিয়ে নিই। আরি, আবার বসল দেখি পায়ের ওপর···এই রাফি, সর। লাথি মেরে ফেলে দেব কিন্তু পানিতে।'

কিন্তু লাথি আর মারতে হলো না। পানিতে পড়ার শব্দ হলো। লাফিয়ে উঠে বসল জিনা। ভেলায় নেই রাফিয়ান।

পানিতে সাঁতার কাটছে। খোশমেজাজেই আছে।

'কি আর করবে বেচারা?' হেসে বলল মুসা। 'সবাই খালি দূর দূর করছ। ভেলায় নেই জায়গা। বসবে কোথায় ও? মনের দুঃখে তাই আত্মহত্যা করে জ্বালা জুড়োতে চাইছে।'

'তুমি ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছ,' রেগে উঠল জিনা।

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল মুসা। 'খেয়েদেয়ে তো আর কাজ নেই আমার।'

'তাহলে পড়ে কি করে?'

'আমি কি জানি?'

'দেখো, আমার সঙ্গে ওভাবে কথা বলবে না···'

'তো কিভাবে···'

'আহ্, কি শুরু করলে?' ধমক দিল কিশোর। 'চুপ করো। রাফিকে টেনে তোলা দরকার। নিজে নিজে উঠতে পারবে না ও।'

টেনেহিঁচড়ে ভেলায় তোলা হলো রাফিয়ানকে। মুসাই সাহায্য করল বেশি। লজ্জিত হয়েছে জিনা। এখন আবার মুসার সঙ্গে ভাব জমানোর চেষ্টা করছে।

উঠেই জোরে গা ঝাড়া দিল রাফিয়ান। পানি ছিটিয়ে ভিজিয়ে দিল সবার চোখমুখ। 'এহ্‌হে,' পরিস্থিতি সহজ করার জন্যে হেসে উঠল রবিন, 'ব্যাটা নিজেও ভিজেছে, আমাদেরও ভেজাচ্ছে।'

দেখতে দেখতে আবার সহজ হয়ে এল ওরা। তখন এত বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, মেজাজ ঠিক রাখতে পারছিল না কেউই।

খুব সুন্দর বিকেল। স্বপ্নিল হয়ে উঠেছে কিশোরের চোখ। ধীরে ধীরে দাঁড় টানছে জিনা আর মুসা। হ্রদের কালচে নীল পানিতে ঢেউয়ের রিঙ তৈরি হচ্ছে, বড় হতে হতে ছড়িয়ে গিয়ে ভাঙছে সোনালি ঝিলিক তুলে। ভেলার দুপাশেও সোনালি ফেনা। পাশে সাঁতার কাটছে দুটো জলমোরগ, বিচিত্র ভঙ্গিতে মাথা ঘোরাচ্ছে আর কিঁক কিঁক করছে, আসছে ভেলার সঙ্গে সঙ্গে।

পানির কিনারে পাড়ের ওপর গড়িয়ে ওঠা বড় বড় গাছগুলোর মাথা ছাড়িয়ে চলে গেছে রবিনের নজর। সিঁদুর-লাল আকাশ। মাইলখানেক দূরের পাহাড়ী ঢালে বিশেষ একটা জিনিস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তার।

উঁচু একটা পাথর।

সেটার দিকে হাত তুলে বলল রবিন, 'কিশোর, দেখো? ওই যে পাথরটা। সীমানার চিহ্ন? অনেক বড় কিন্তু।'

'কই?' কিশোর বলল। 'ও, ওটা? কি জানি, বুঝতে পারছি না।'

'অনেক লম্বা···' বলতে গেল মুসা।

কথাটা ধরে ফেলল কিশোর। কি যেন মনে পড়ে গেছে। 'লম্বা! টল স্টোন! নকশায় লেখা রয়েছে না?'

'হ্যাঁ, তাই তো,' মাথা ঝাঁকাল মুসা। চেয়ে আছে দূরের পাথরটার দিকে।

চার জোড়া চোখই এখন ওটার দিকে। ভেলা চলছে। আস্তে আস্তে গাছপালার আড়ালে হারিয়ে গেল পাথরটা।

'টল স্টোন,' আবার বিড়বিড় করল কিশোর। 'ভুলেই গিয়েছিলাম।'

'তোমার কি মনে হয়,' জিনা বলল, 'ওটার তলায়ই লুকানো আছে লুটের মাল?'

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'হয়তো একটা দিক-নির্দেশ···এই, জলদি বাও। তাড়াতাড়ি ফেরা দরকার, রাতের আগে।'

বারো

বোটহাউসে ঢুকল ভেলা। খুঁটিতে আগের জায়গায় বাঁধা রয়েছে লিটল মারমেইড, ডারটি আর টিকসি নেই।

'গেল কোথায়?' টর্চ জ্বেলে দেখছে কিশোর। 'শোনো, ভেলাটা এখানে রাখা ঠিক না। চলো, কোন ঝোপের তলায় লুকিয়ে রাখি।'

ঠিকই বলেছে কিশোর। অন্যেরাও একমত হলো। হাত অবশ হয়ে গেছে। তবু কোনমতে ভেলাটা আবার বের করে এনে পানির ওপর এসে পড়া কিছু ডালপাতার তলার শেঁকড়ে শক্ত করে বাঁধল।

লতা আর শেঁকড় ধরে ধরে পাড়ে উঠে রওনা হলো আস্তানায়। চোখ চঞ্চল দুই ডাকাতকে খুঁজছে। ছায়াও দেখা যাচ্ছে না ওদের। পোড়া বাড়িতে ভাঁড়ারে ঢুকে বসে নেই তো?

আগে রাফিয়ানকে ঢুকতে বলল ওরা।

সিঁড়িমুখে মাথা ঢুকিয়ে দিল রাফিয়ান। শব্দ করল না। সিঁড়ি টপকে নেমে গেল নিচে।

নেমেই গোঁ গোঁ করে উঠল।

'কি ব্যাপার?' বলল কিশোর। 'বসে আছে নাকি নিচে?'

'মনে হয় না,' মাথা নাড়ল জিনা। 'অন্য কিছু।'

'কী?'

'চলো না, নেমেই দেখি,' সিঁড়িতে পা রাখল জিনা।

বিছানা যেভাবে করে রেখে গিয়েছিল, ঠিক তেমনি রয়েছে। ব্যাজ আর কাপড়-চোপড়ও রয়েছে জায়গামত। মোম জ্বেলে টর্চ নিভিয়ে দিল কিশোর।

'কি হয়েছে, রাফি?' জিজ্ঞেস করল জিনা। 'এমন করছিস কেন?'

গোঙানি থামছে না রাফিয়ানের।

'গন্ধ পেয়েছে নাকি?' চারপাশে তাকিয়ে বলল মুসা। 'ওরা এসেছিল এখানে?'

'আসতেও পারে,' রবিন বলল।
'মরুকগে,' হাত নাড়ল মুসা। 'খিদে পেয়েছে। কিছু খেলে কেমন হয়?'
'ভালই হয়, আমারও খিদে পেয়েছে,' বলতে বলতে আলমারির দিকে এগোল কিশোর। কিন্তু টান দিয়ে দরজা খুলেই স্থির হয়ে গেল।
নেই!
অথচ ওখানেই রেখে গিয়েছিল সব খাবার। থালা-বাসন, প্লেট-কাপ, সব সাজানোই রয়েছে আগের মত, নেই শুধু খাবারগুলো। রুটি নেই, বিস্কুট নেই, চকলেট নেই···কিচ্ছু নেই।
কিশোরের ভাব দেখেই বুঝল অন্যেরা, কিছু একটা অঘটন ঘটেছে। এগোল আলমারির দিকে।
'খাইছে!' আঁতকে উঠল মুসা। 'কিছুই তো নেই। একটা বিস্কুটও না। ইস্ আগেই ভাবা উচিত ছিল। আল্লাহ্‌রে, কি খেয়ে বাঁচি এখন।!'
'খুব চালাকি করেছে,' রবিন বলল। 'জানে, খাবার ছাড়া থাকতে পারব না এখানে। আমাদের তাড়ানোর এটাই সবচেয়ে ভাল কৌশল। রাতে খিদেয় মরব, সকালে উঠেই দৌড়াতে হবে গাঁয়ে, অনেক সময় পাবে ওরা।'
মাথায় হাত দিয়ে ধপ করে আলমারির কাছেই বসে পড়ল মুসা। 'গাঁয়ে যাওয়ারও সময় নেই এখন। যা পথ-ঘাট, অন্ধকার! উফ্, খিদেও পেয়েছে। নাহ্ রাতটা টিকব না।'
মন খারাপ হয়ে গেছে সবার। কতক্ষণ আর খিদে সওয়া যায়? ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে শরীর, ভেবেছিল খেয়েদেয়ে চাঙা হবে, তার আর উপায় নেই।
বিছানায় বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলল রবিন। 'একবার ভেবে ছিলাম, কয়েকটা চকলেট সরিয়ে রেখে যাই, রাখলাম না···রাফি, ওভাবে আলমারির দিকে চেয়ে লাভ নেই। কিচ্ছু নেই ওতে।'
আলমারি শুঁকছে, আর করুণ চোখে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে রাফিয়ান।
'হারামীগুলো কোথায়?' হঠাৎ রেগে গেল কিশোর। 'ব্যাটাদের একটা শিক্ষা দেয়া দরকার। বুঝিয়ে দেয়া দরকার লোকের খাবার চুরি করার ফল।'
'হুফ,' পুরোপুরি একমত হলো রাফিয়ান।
সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল কিশোর। দুই ডাতাক কোথায়? ভাঙা, শূন্য দরজার কাছে গিয়ে দূরে তাকাল।
বনের মাঝে এক জায়গায় দুটো তাঁবু খাটানো হয়েছে। তাহলে ওখানেই ঘুমানোর ব্যবস্থা করেছে, ভাবল সে। চোরগুলোকে গিয়ে গালাগাল করে আসবে নাকি? হ্যাঁ, তাই যাবে।
'আয়, রাফি,' বলে পা বাড়াল কিশোর।
কিন্তু তাঁবুতে কেউ নেই। কয়েকটা কম্বল, একটা প্রাইমাস স্টোভ, একটা কেটলি আর অন্যান্য কিছু দরকারী জিনিস অগোছাল হয়ে পড়ে আছে। একটা তাঁবুর কোণে গাদা করে রাখা আছে কি যেন, কাপড় দিয়ে ঢাকা।
টিকসি আর ডারটি গেল কোথায়?

খুঁজতে বেরোল কিশোর।

পাওয়া গেল হ্রদের ধারে গাছের তলায়, পায়চারি করছে। কথা বলছে। বাহ্, সান্ধ্য-ভ্রমণ, মুখ বাঁকাল সে। দাঁড়িয়ে পড়ল। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে, ভাবছে কিছু। যে কাজে এসেছিল, সেটা না করে ফিরে চলল আস্তানায়।

পেছনে রাফিয়ান, বাতাসে কি যেন শুঁকতে শুঁকতে চলেছে।

'তাঁবু খাটিয়েছে,' বন্ধুদের জানাল কিশোর। 'ব্যাটারা রয়েছে লেকের পাড়ে। লুটের মাল না নিয়ে যাবে না।'

'আরে রাফি কোথায়?' সিঁড়িমুখের দিকে চেয়ে আছে জিনা। 'কিশোর, কোথায় ফেলে এলে ওকে?'

'পেছনেই তো আসছিল···দেখি তো,' সিঁড়ির দিকে পা বাড়াতে গিয়ে থেমে গেল কিশোর। ওপরে মেঝেতে পরিচিত নখের শব্দ।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল রাফিয়ান।

'আরে, দেখো, মুখে করে কি জানি নিয়ে এসেছে।' বলে উঠল জিনা।

তার কোলের কাছে এনে জিনিসটা রাখল রাফিয়ান।

'বিস্কুটের টিন!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'পেল কই?'

নীরব হাসিতে ফেটে পড়ল কিশোর। বলল, 'আমি যা করব ভাবছিলাম, রাফিই সেটা করে ফেলল। তাঁবুতে কাপড়ে ঢাকা রয়েছে খাবার, অনেক খাবার। ফিরে এসেছি, সবাই মিলে গিয়ে লুট করে আনার জন্যে। আর দরকার হবে না।'

আবার সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাচ্ছে রাফিয়ান।

'ওরা যেমন করমচা, আমরা তেমনি বাঘা তেঁতুল,' হাসতে হাসতে বলল মুসা। 'কারও চেয়ে কেউ কম নই।···রাফিটা আবার গেল?'

'যাক,' বলল জিনা।

এক মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল রাফি। মুখে বাদামী কাগজে মোড়া মস্ত এক প্যাকেট।

বিশাল কেক।

হেসে গড়াগড়ি খেতে শুরু করল গোয়েন্দারা।

'রাফি, তুই একটা বাঘের বাচ্চা,' হাসি থামাতে পারছে না মুসা।

'আরে না, সিংহের,' শুধরে দিল জিনা।

'আমার তো মনে হয় ওর বাপ বাবুর্চি ছিল,' পেট চেপে ধরেছে রবিন, চোখের কোণে পানি। 'বেছে বেছে পছন্দসই খাবারগুলো আনছে।'

আবার চলে গেছে রাফিয়ান। ফিরে এল শক্ত মলাটের একটা বাক্স নিয়ে। গরুর মাংসের বড়া।

'তাজ্জব করে দিল দেখি।' বলল মুসা। 'কোথায় পেটে পাথর বাঁধার কথা ভাবছিলাম, আর হাজির হয়ে গেল একেবারে রাজকীয় ভোগ···'

'দারুণ হয়েছে,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'আমাদেরগুলো ব্যাটারা নিয়েছে, আমরা ওদেরগুলো নিয়ে এসেছি। রাফি, আবার যা।'

কিশোরের বলার আগেই রওনা দিয়েছে রাফিয়ান।

কি আনে, দেখার জন্যে উৎসুক হয়ে রইল চারজন।

নিয়ে এল আরেক বাক্স মাংসের কাবাব।

'তুই একটা সাংঘাতিক লোক, রাফি!' উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল মুসা, 'খুব ভাল মানুষ। এত সুগন্ধ, তা-ও ছুঁয়েও দেখছিস না। আমি হলে তো চাখার লোভ সামলাতে পারতাম না।'

খাবার চুরি করার নেশায় পেয়েছে রাফিয়ানকে। যাচ্ছে-আসছে, যাচ্ছে-আসছে, প্রতিবারেই মুখে করে নিয়ে আসছে একটা কিছু।

'এবার ওকে থামানো দরকার,' বলল কিশোর। 'যথেষ্ট হয়েছে। যা নিয়েছিল ব্যাটারা, তার তিনগুণ এসেছে।'

'থাক, শুধু আরেকবার,' হাত তুলল জিনা। 'দেখি, এবার কি আনে।'

টেনে-হিঁচড়ে ইয়া বড় এক বস্তা নিয়ে হাজির হলো রাফিয়ান।

আবার হাসাহাসি শুরু হলো। না ঠেকালে সব নিয়ে আসবে। কিছু রাখবে না, শূন্য করে দিয়ে আসবে।

'রাফি,' বেল্ট টেনে ধরল জিনা, 'আর না। শুয়ে পড়, জিরিয়ে নে। বাঁচালি আমাদের।'

প্রশংসায় খুব খুশি হলো রাফিয়ান। জিনার গালটা একবার চেটে দিয়ে গড়িয়ে পড়ল তার পায়ের কাছে। জিভ বের করে হাঁপাচ্ছে।

বস্তাটা খুলল মুসা। ঘরে বানানো পাঁউরুটি আর বনরুটি। 'হুররে...' আনন্দে নাচতে শুরু করল সে। 'রাফি, তো পায়ে হাত দিয়ে সালাম করতে ইচ্ছে করছে।'

কি বুঝল কুকুরটা কে জানে, একটা পা বাড়িয়ে দিল।

'নাও, করো এবার,' হা-হা করে হেসে উঠল কিশোর। সবাই যোগ দিল হাসিতে।

পেট পুরে খেলো ওরা। রাফিয়ানের পেট ফুলে ঢোল, নড়তে পারছে না ঠিকমত। হাস্যকর ভঙ্গিতে পেটটাকে দোলাতে দোলাতে উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে, পানি খাওয়ার জন্যে। কল ছেড়ে দিল জিনা। সামনের দুই পা সিংকে তুলে দিয়ে পানি খেলো রাফিয়ান।

সিংক থেকে থাবা নামিয়েই স্থির হয়ে গেল সে। ঘুরে বনের দিকে চেয়ে ঘেউ ঘেউ করে উঠল।

ছুটে এল সবাই। ঝোপঝাড়ের ওপর দিয়ে ডারটির মাথা দেখা যাচ্ছে। এদিকেই আসছে।

কাছে এসে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'আমাদের খাবার চুরি করেছ?'

'কে বলল?' চেঁচিয়ে জবাব দিল কিশোর, 'আমাদের খাবারই আমরা ফিরিয়ে এনেছি।'

'এত্তবড় সাহস, আমার তাঁবুতে হানা...' রাগে বাকরুদ্ধ হয়ে গেল ডারটির। ঝাঁকড়া চুল নাড়ল, সাঁঝের আবছা আলোয় অদ্ভুত দেখাচ্ছে তার চেহারা, চুলের জন্যে।

'না আমরা যাইনি,' সহজ কণ্ঠে বলল কিশোর, 'রাফি গিয়েছিল। আমরা বরং

ঠেকিয়েছি, নইলে রাতে তোমাদের খাওয়া জুটত না। আমাদের তো উপোস রাখতে চেয়েছিলে, আমরা তোমাদের মত অত ছোটলোক নই···না, না, আর কাছে এসো না, রাফি রেগে যাবে। আর হ্যাঁ, সারা রাত পাহারায় থাকবে ও। গায়ে ওর সিংহের জোর, মনে রেখো।'

'গররররর,' এত জোরে গর্জন করল রাফিয়ান, লাফিয়ে উঠল ডারটি। তার মনে হলো সিংহেরই গর্জন।

ভীষণ রাগে হাত নেড়ে ঝটকা দিয়ে ঘুরল সে। চলে গেল।

সিঁড়িমুখে রাফিয়ানকে মোতায়েন করে ভাঁড়ারে ফিরল চারজন।

'ব্যাটাদের বিশ্বাস নেই,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর।

'নিশ্চয় পিস্তল-টিস্তল কিছু আনেনি, নইলে এতক্ষণে গুলি করে মারত রাফিকে।'

'তাড়াতাড়ি করা দরকার আমাদের,' বলল রবিন। 'মালগুলো খুঁজে বের করে নিয়ে পালানো দরকার। ঠিকই বলেছ, ব্যাটাদের বিশ্বাস নেই। কখন যে কি করে···আচ্ছা, নকশা নিয়ে বসলে কেমন হয়? টল স্টোন তো দেখেছি।'

নকশা বের করে সমাধান করতে বসল ওরা।

'এই যে,' একটা রেখার মাথায় আঙুল রাখল কিশোর। 'তাহলে, এটার উল্টো দিকে টক হিল, এই যে,' আরেক মাথায় আঙুল রাখল।

'তুমি ভাবতে থাকো,' চিত হয়ে শুয়ে পড়ল মুসা। 'আমি একটু গড়িয়ে নিই। গতর খাটানোর দরকার পড়লে ডেকো।'

মোমের আলোয় গভীর মনোযোগে নকশাটা দেখছে কিশোর। ঘন ঘন চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে। বিড়বিড় করল, 'চারটে···টল স্টোন···টক হিল···চিমনি··· স্টীপ্‌ল্‌।' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'ইউরেকা! ইউরেকা!'

লাফিয়ে উঠে বসল মুসা। 'আমেরিকা আবিষ্কার করলে নাকি?'

'না, লুটের মাল।'

'কোথায়?' ঘরের চারদিকে তাকাল গোয়েন্দা-সহকারী। চোখে বিস্ময়।

'আরে ওখানে না, এখানে,' নকশাটায় হাত রাখল গোয়েন্দাপ্রধান। 'বুঝে গেছি।'

তেরো

'এক এক করে ধরা যাক,' উত্তেজনায় মৃদু কাঁপছে কিশোরের গলা। 'টু-ট্রীজ। এই যে, এখানে। ব্ল্যাক ওয়াটার। যেখানে লুটের মাল লুকানো রয়েছে। ওয়াটার মেয়ার। যার মধ্যে লুকানো রয়েছে। হ্রদের পানিতে কোথাও লুকিয়ে রেখেছে নৌকাটা।'

'বলে যাও,' জিনা আর রবিনকে ঠেলে সরিয়ে এগিয়ে বসল মুসা।

'টিকসি হয়তো জেরির পুরানো বান্ধবী,' বলল কিশোর, 'তাহলে জেরির কাজকর্মের সঙ্গে পরিচয় আছে তার। নকশার মানে বুঝে ফেলেছে। বুঝেছে, কোথায় লুকানো রয়েছে নৌকাটা।'

কাগজের এক জায়গায় তর্জনী দিয়ে খোঁচা মারল সে। 'এখন দেখি, আমরা কি বুঝেছি। টল স্টোন তো দেখেছি আমরা, নাকি? বেশ। লেকের এমন কোন জায়গা

আছে, যেখান থেকে শুধু টল স্টোন নয়, টক হিল, চিমনি, স্টীপল্ও দেখা যাবে। চারটে জিনিসই এক জায়গা থেকে দেখা যাবে। এবং ওই জায়গায়ই লুকানো রয়েছে লুটের মাল।'

অন্য তিনজন নীরব।

'আমি একটা গাধা,' সরল মনে স্বীকার করল মুসা। 'এই সহজ ব্যাপারটা বুঝলাম না। লুটের মাল রয়েছে, তারমানে ওয়াটার মেয়ারকেও ওখানেই পাওয়া যাবে। গিয়ে খালি তুলে নেয়া।'

'হ্যাঁ,' বলল কিশোর। 'তবে ডারটি আর টিকসির কথা ভুলো না। আমাদের আগে ওরাও গিয়ে হাজির হতে পারে, তুলে নিতে পারে জিনিসগুলো। কেড়ে নিতে পারব না, আমরা পুলিশ নই। নিয়ে সোজা চলে যাবে, রুখতেও পারব না।'

সবাই উত্তেজিত।

'তাহলে তো কাল ভোরেই যাওয়া উচিত,' বলল রবিন। 'আলো ফুটলেই বেরিয়ে পড়ব। ডারটি আর টিকসির আগেই গিয়ে তুলে নেব। ইস্, একটা অ্যালার্ম-ক্লক থাকলে ভাল হত।'

'ভেলায় করে চলে যাব,' মুসা বলল। 'বাকি তিনটে চিহ্ন খুঁজে বের করে…'

'তিনটে নয়, দুটো,' বাধা দিয়ে বলল কিশোর। 'চিমনিটা টু-ট্রীজেই রয়েছে। খেয়াল করোনি, এ-বাড়িটার বাঁয়ে উঁচু একটা চিমনি?'

'আমি করেছি,' রবিন বলল।

আরও কিছুক্ষণ পরামর্শ আর আলাপ-আলোচনার পর ঠিক হলো, ভোরে উঠেই বেরোবে। রাত বেশি না করে শুয়ে পড়ল ওরা, নইলে সকাল সকাল উঠতে পারবে না।

সিঁড়িমুখের কাছে শুয়ে আছে রাফিয়ান, চোখ বন্ধ, কান সজাগ।

সারাদিন অনেক পরিশ্রম করেছে, শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল ছেলেরা।

কেউ বিরক্ত করল না সে-রাতে। খাবারের গন্ধে লোভ সামলাতে না পেরে চুপি চুপি এসে উঁকি দিল একবার সেই শেয়ালটা। নড়লও না রাফিয়ান, চোখও মেলল না, চাপা গলায় গরগর করল শুধু একবার। তাতেই যা বোঝার বুঝে নিয়ে ফোলা লেজ আরও ফুলিয়ে পালাল শেয়াল মহাশয়। কর্কশ চিৎকার করে উঠল একটা হুতুম পেঁচা। ওটার সঙ্গে গলা মিলিয়ে কা-কা করল একটা দাঁড়কাক, ঘুমিয়ে পড়ল আবার।

হামাগুড়ি দিয়ে এল যেন আবছা আলো, বনের কালো অন্ধকারকে কঠিন হাতে তাড়ানোর সাহস নেই বুঝি। উঠে গা ঝাড়া দিয়ে ভাঙা দরজার কাছে এগোল রাফিয়ান। তাঁবু দুটো দেখল। চোখে পড়ল না কাউকে। ফিরে এসে সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে এল ভাঁড়ারে।

সঙ্গে সঙ্গে জেগে গেল মুসা আর কিশোর।

'কটা বাজে?' ঘড়ি দেখেই চমকে উঠে বসল কিশোর। 'সাড়ে সাতটা।'

'খাইছে!' আঁতকে উঠল মুসা। 'এই ওঠো ওঠো। দুপুর হয়ে গেছে।'

দ্রুত হাত মুখ ধুয়ে, দাঁত মেজে, চুল আঁচড়ে নিল ওরা। পরনের কাপড় ঝেড়ে নিল হাত দিয়ে। তাড়াতাড়ি খাবার বেড়ে দিল রবিন আর জিনা। নাকেমুখে

কোনমতে খাবারগুলো গুঁজে দিয়ে সিংকের কল থেকে পানি খেলো।
বেরোনোর জন্যে তৈরি।
তাঁবুর কাছে কাউকে দেখা যাচ্ছে না।
'গুড,' বলল কিশোর। 'ঘুম থেকে ওঠেনি। আমরাই আগে যাচ্ছি।'
ভেলায় চড়ে বসল অভিযাত্রীরা। দাঁড় তুলে নিল হাতে। সবাই উত্তেজিত, রাফিয়ানও।
'আগে টল স্টোনটা বের করি,' ঝপাত করে পানিতে দাঁড় ফেলল কিশোর।
'হ্রদের মাঝখানে চলে এল ওরা। টল স্টোন চোখে পড়ছে না। চেয়ে চেয়ে চোখ ব্যথা করে ফেলল। গেল কোথায় উঁচু পাথরটা?'
সবার আগে দেখল মুসা। চেঁচিয়ে বলল, 'ওই যে, ওইই, উঁচু গাছগুলোর পরে...'
'টল স্টোন তো পাওয়া গেল,' বলল কিশোর। 'এই, তোমরা উল্টোদিকে চাও তো, টক হিল দেখা যায় কিনা? কোন পাহাড়-টাহাড়? আমি টল স্টোনের ওপর চোখ রাখলাম। দরকার হলে ভেলটা সামনে পেছনে কোরো।'
টক হিলও মুসাই আগে দেখল। 'পেয়েছি।' বলল সে। 'ওটাই। দেখো দেখো, অদ্ভুত একটা পাহাড়, পিরামিডের মত চূড়া...কিশোর, টল স্টোন এখনও দেখা যাচ্ছে?'
'হ্যাঁ,' বলল কিশোর। 'তুমি পাহাড়টা থেকে চোখ সরিও না। জিনা, দেখো তো স্টীপ্‌ল্ দেখা যায় কিনা?' টল স্টোনের ওপর থেকে মুহূর্তের জন্যে চোখ সরাচ্ছে না সে। 'দেখো, পুরানো বাড়ি, গির্জা, মন্দিরের চূড়া বা স্তম্ভ...'
'দেখেছি, দেখেছি!' এত জোরে চেঁচিয়ে উঠল জিনা, যার যার চিহ্ন থেকে চোখ সরিয়ে ফেলল মুসা আর কিশোর। রবিন আগেই সরিয়েছে।
সকালের রোদে ঝলমল করছে গির্জার পাথরে তৈরি চূড়া।
'চমৎকার,' বলল কিশোর। 'রবিন, দেখো তো, চিমনিটা দেখা যায়?'
'না,' রবিন বলল। 'মুসা আরেকটু বাঁয়ে সরাও...আরেকটু...হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখছি। আর না, আর না...'
দাঁড় বাওয়া বন্ধ। কিন্তু এক জায়গায় স্থির থাকল না ভেলা, আপনগতিতে অল্প অল্প করে সরে গেল। পানিতে বার দুই দাঁড়ের খোঁচা মেরে আবার সরাতে হলো ভেলাটা। ইতিমধ্যে গির্জা হারিয়ে ফেলেছে জিনা।
একটু ওদিক, একটু ওদিক করে করে আবার জায়গামত আনা হলো ভেলা, আবার চারটে চিহ্ন চোখে পড়ল।
'কিছু একটা মারকার ফেলে জায়গাটার চিহ্ন রাখা দরকার,' টল স্টোন থেকে চোখ সরাল না কিশোর। 'জিনা, দেখো তো, চূড়া আর পাথরের ওপর একসঙ্গে চোখ রাখতে পারো নাকি?'
'দেখি চেষ্টা করে,' চূড়া থেকে চোখ সরিয়ে চট করে পাথরটার দিকে তাকাল জিনা, তারপর আবার চূড়ার দিকে। কাজটা সহজ নয়। ভেলা খালি নড়ছে, স্থির রাখা যাচ্ছে না পুরোপুরি, যাবে বলেও মনে হয় না।
দ্রুত হাত চালাল কিশোর। একটা টর্চ আর পকেট-ছুরি বের করল। 'জিনা,

তোমার ব্যাগে ফিতা আছে?'

'দেখো, আছে কয়েকটা,' দুটো চিহ্নের ওপর চোখ রাখতে হিমশিম খাচ্ছে জিনা।

একটার সঙ্গে আরেকটা ফিতের মাথা বেঁধে জোড়া দিয়ে লম্বা করল কিশোর। ছুরি আর টর্চ এক করে ফিতের একমাথা দিয়ে পেঁচিয়ে শক্ত করে বাঁধল। তারপর ফিতে ধরে ছেড়ে দিল পানিতে, আস্তে আস্তে ছাড়তে লাগল। টান থেমে গেল এক সময়, বোঝা গেল হ্রদের তলায় পৌঁছেছে ভার।

এক হাতে ফিতে ধরে রেখে আরেক হাতে পকেট খুঁজল কিশোর। এক অলস মুহূর্তে একটা কর্ককে ছুরি দিয়ে কেটে চেঁচে একটা ঘোড়ার মাথা বানিয়েছিল, সঙ্গে নিয়ে এসেছে ওটা। বের করল পকেট থেকে। ফিতেটাকে টান টান করে এমন এক জায়গায় কর্ক বাঁধল, যেন ওটা পানির সমতলের ঠিক নিচে ভাসে।

ভেসে রইল কর্কটা, দাঁড়ের নড়াচড়ায় আলতো ঢেউ উঠছে, তাতে লুকোচুরি খেলতে থাকল ঘোড়ার মাথা।

'হয়েছে,' জোরে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। 'চিহ্ন থেকে চোখ সরাতে পারো।'

ঘোড়ার মাথাটার দিকে তাকাল মুসা। 'এত আগাম চিন্তা করো কিভাবে?' বন্ধুর বুদ্ধির তারিফ করল সে। 'কিন্তু জিনিসটা বেশি ছোট। আবার খুঁজে বের করতে পারব? বড় কিছু হলে ভাল হত না?'

'সেটাই ভাবছি,' বলল কিশোর। 'কিন্তু বড় আর কি আছে?'

'আমার মেকআপ বক্সটা ধার নিতে পারো,' জিনা বলল। 'দাও,' হাত বাড়াল কিশোর।

ব্যাগ খুলে বেশ বড় একটা প্লাসটিকের বাক্স বের করল জিনা। খুব শক্ত হয়ে লাগে ডালা, ভেতরে পানি তো ঢুকবেই না, বাতাসও ঢোকে না তেমন, বায়ুনিরোধকই বলা চলে। ভেসে থাকবে। এক এক করে লিপস্টিক, পাউডারের কৌটা, চিরুনি আর টুকিটাকি অন্যান্য জিনিস ব্যাগে রেখে বাক্সটা দিল সে।

'মেয়েদের অকাজের বাক্সও অনেক সময় কাজে লাগে,' ফস করে বলে ফেলল মুসা।

টান দিয়ে বাক্সটা সরিয়ে আনল জিনা। 'দেখো, ভাল হবে না। আমাকে রাগালে বাক্স দেব না আমি।'

'না না, দাও, এমনি ঠাট্টা করলাম,' তাড়াতাড়ি বলল মুসা।

কর্কের পরে বাড়তি যে ফিতেটুকু রয়েছে, সেটা দিয়ে বাক্স বেঁধে পানিতে ছাড়ল কিশোর। ভেসে রইল। বোঝা যাচ্ছে, থাকবে।

'ফাইন,' বলল কিশোর। 'এবার দূর থেকেও চোখে পড়বে। দেখি তো, তলায় কি আছে?'

ভেলার ধার দিয়ে ঝুঁকে চারজনেই নিচে তাকাল। কিছুই না বুঝে রাফিয়ানও গলা বাড়িয়ে দিল পানির দিকে।

অদ্ভুত এক দৃশ্য। হ্রদের তলায় বড় কালো একটা ছায়া। ছোট ছোট ঢেউয়ের জন্যে অস্পষ্ট লাগছে, কেমন কাঁপা কাঁপা, তবে নৌকা যে তাতে কোন সন্দেহ

নেই।

'ওয়াটার মেয়ার,' বিড়বিড় করল মুসা।

'জেরি ব্যাটা খুব চালাক,' কিশোর বলল। 'লুটের মাল লুকানোর কি একখান জায়গা খুঁজে বের করেছে। নৌকার তলা ফুটো করে ডুবিয়েছে নিশ্চয়।'

'কিন্তু নৌকাটা তুলব কি করে?'

'তাই তো ভাবছি,' থেমে গেল কিশোর। ঘেউ ঘেউ শুরু করেছে রাফিয়ান।

একটা নৌকা ছুটে আসছে এদিকে, লিটল মারমেইড। টিকসি আর ডারটি দুজনেই দাঁড় বাইছে। ভেলার দিকে খেয়াল নেই, হ্রদের চারপাশের তীরের দিকে চোখ, একবার এদিক চাইছে, একবার ওদিক। বোঝা গেল, চিহ্নগুলো খুঁজছে ওরা।

'তৈরি হয়ে যাও, সবাই,' আস্তে বলল কিশোর। 'আজ আমাদের বাধা না-ও মানতে পারে।'

চোদ্দ

কাছে এগিয়ে আসছে নৌকা। দাঁড় তুলে নিয়েছে টিকসি, দুই-তিনটা চিহ্নের ওপর একা চোখ রাখতে হচ্ছে তাকে। খালি মাথা ঘোরাচ্ছে এপাশ-ওপাশ।

ঘেউ ঘেউ করেই চলেছে রাফিয়ান।

তার মাথায় হাত রেখে শান্ত হতে বলল জিনা।

দুই ডাকাতের অবস্থা দেখে হাসি পেল অভিযাত্রীদের। ওরা চারজন চারটে চিহ্নের ওপর চোখ রাখতে হিমশিম খাচ্ছিল, আর দুজনের কতখানি অসুবিধে হবে সে তো বোঝাই যায়।

নির্দেশ দিচ্ছে টিকসি, 'এদিকে আরেকটু বাঁয়ে…এহ্‌হে, বেশি হয়ে গেল… ডানে-ডানে-ডানে…'

কিছু বলল ডারটি।

ঝট করে মুখ ফিরিয়ে তাকাল টিকসি। ভেলাটা দেখে রাগে জ্বলে উঠল। পরক্ষণেই আবার ফিরল চিহ্নগুলোর দিকে। নিচু গলায় বলল কিছু ডারটিকে। মাথা ঝাঁকাল ডারটি। ভীষণ হয়ে উঠেছে দুজনেরই চেহারা।

গতি বাড়ছে নৌকার, সোজা এগিয়ে আসছে।

'আরে, ধাক্কা মারো!।' বলে উঠল রবিন।

ধাক্কা খেয়ে দুলে উঠল ভেলা, আরেকটু হলেই পানিতে উল্টে পড়ে যাচ্ছিল রবিন, খপ করে তার হাত চেপে ধরল মুসা। চেঁচিয়ে বলল, 'এই চোখের মাথা খেয়েছ! শয়তান কোথাকার! ভেবেছ কি?'

'তোরা কেন এসেছিস এখানে?' গর্জে উঠল ডারটি।

রেগে গেল রাফিয়ান, দাঁতমুখ খিঁচিয়ে চেঁচাতে শুরু করল।

'তোর বাপের জায়গা…' দাঁড়টা তুলে নিল মুসা, রাগে কথা সরছে না।

কাঁধে হাত দিয়ে তাকে চুপ করতে বলল কিশোর। ডারটির দিকে ফিরল, রাফিয়ানের ভয়ে ধীরে ধীরে নৌকা পিছিয়ে নিচ্ছে ডাকাতটা।

'দেখো,' শান্তকণ্ঠে বলল গোয়েন্দাপ্রধান, 'তোমরা বেশি বাড়াবাড়ি করছ।

হ্রদে অনেক জায়গা, আমাদের কাছে তোমাদের না এলেও চলে। খামোকা এসব করছ কেন?'

'পুলিশের কাছে যাচ্ছি,' রাগে লাল হয়ে গেছে টিকসির মুখ, 'তোমরাও বাড়াবাড়ি কম করছ না। না বলে অন্যের ভেলা নিয়ে এসেছ, অন্যের বাড়িতে জোর করে ঘুমাছে, আমাদের খাবার চুরি করেছ…'

'আবার সেই এক কথা,' হতাশ ভঙ্গিতে দু-হাত নাড়ল কিশোর। 'তোমরা কি করেছ? নৌকা বলে এনেছ? আমরা খাবার চুরি করেছি না তোমরা আমাদের খাবার চুরি করেছ? একটু আগে কি করলে? ধাক্কা মেরে ভেলা ডুবিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলে। যাও না পুলিশের কাছে, বলো গিয়ে। আমাদেরও মুখ আছে।'

ফুঁসছে ডারটি। দাঁড় তুলে নিল, ছুঁড়ে মারবে।

'খবরদার,' আঙুল তুলল কিশোর। 'অনেক সহ্য করেছি, আর না। এবার কুকুর লেলিয়ে দেব। তোমাকে ছেঁড়ার জন্যে অস্থির হয়ে আছে রাফি।'

'গররর!' কিশোরের কথায় সায় দিয়ে একসারি 'চমৎকার' দাঁত ডারটিকে দেখিয়ে দিল রাফিয়ান।

দ্বিধায় পড়ে গেল দুই ডাকাত। নিচু গলায় কিছু আলোচনা করল। তারপর মুখ ফিরিয়ে গলার স্বর নরম করে টিকসি বলল, 'দেখো ছেলেরা, আমরা শান্তিতে ছুটি কাটাতে এসেছি, উইক-এণ্ডে। কিন্তু আমরা যেখানেই যাই দেখি তোমরা আছ, এটা আমাদের ভাল লাগে না। আসলে, আশেপাশে কেউ না থাকুক এটাই চাইছি আমরা। ঠিক আছে, একটা রফা করা যাক। তোমরা চলে যাও, আমরা তাহলে পুলিশকে কিছু বলব না। খাবার যে চুরি করেছ, একথাও না।'

'পুলিশের কাছে যেতে কে মানা করছে? যাও না,' বলল কিশোর। 'রফাটফা কিছু হবে না। আমাদের যখন খুশি তখন যাব।'

জ্বলে উঠল টিকসির চোখ। সামলে নিল। আবার আলোচনা করল ডারটির সঙ্গে। ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'ছুটি কদিন তোমাদের? কবে যাচ্ছ?'

'আগামীকাল,' বলল কিশোর।

আবার কিছু আলোচনা করল দুজনে।

আস্তে করে নৌকাটা কয়েক ফুট সরিয়ে নিল ডারটি। উঁকি দিয়ে পানির নিচে তাকাল টিকসি। মুখ তুলে ডারটির দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকাল।

ছেলেদের সঙ্গে আর একটাও কথা না বলে নৌকা নিয়ে চলে গেল ওরা।

'কি করবে বুঝেছি,' হাসিমুখে বলল কিশোর। 'কাল আমাদের চলে যাওয়ার অপেক্ষায় থাকবে। তারপর আসবে নিরাপদে লুটের মাল তুলে নেয়ার জন্যে। টিকসি পানির দিকে তাকিয়েছিল, খেয়াল করেছ? নৌকাটা দেখেছে। আমাদের মার্কারও দেখেছে।'

'তাহলে এত খুশি হয়েছ কেন?' জিনা বুঝতে পারছে না। 'নৌকাটা আমরা তুলতে পারছি না। আর আগামীকাল চলে যেতেই হচ্ছে। স্কুল মিস করা চলবে না।'

দূরে চলে গেছে নৌকা, সেদিকে চেয়ে বলল কিশোর, 'কাল যে যাব, এটা ইচ্ছে করেই বলেছি, ওদের সরানোর জন্যে। লুটের মাল তুলে নিতে পারব

আমরা।'

'কিভাবে?' একসঙ্গে বলল অন্য তিনজন। রাফিয়ানও মুখ বাড়াল সামনে, যেন সে-ও জানতে চায়।

'নৌকা তো চাই না আমরা,' কিশোর বলল, 'চাই মালগুলো। তাহলে নৌকাটা তোলার দরকার কি? ডুব দিয়ে গিয়ে ওগুলো তুলে নিয়ে এলেই হলো। মনে হয় কোন বস্তা বা বাক্সের মধ্যে রেখেছে। ভারি না হলে এমনিতেই তোলা যাবে, আর ভারি হলে দড়ি বেঁধে টেনে তুলতে হবে।'

'শুনতে তো ভালই লাগছে, কিন্তু যাচ্ছে কে?' হ্রদের কালো পানির দিকে চেয়ে বলল রবিন। 'আমার ভাই ভয় লাগে।'

'আমি যাব,' মুসা বলল। 'সেদিন থেকেই তো খালি ভেলায় করে ঘুরছি। একবারও সাঁতার কাটতে পারিনি। রথ দেখা কলা বেচা দুইই হবে।'

'ভালমত ভেবে দেখো,' কিশোর সাবধান করল। 'যা ঠাণ্ডা, শেষে না নিউমোনিয়া বাধাও।'

'আরে দূর,' পাত্তাই দিল না মুসা। 'পানিতে বরফ গুলে দিলেও ঠাণ্ডা লাগবে না আমার।'

বিশ্বাস করল সবাই। এই হ্রদে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়ে থাকলেও কিছু হবে না তার।

তিন-চার টানে জামাকাপড় সব খুলে ফেলল মুসা। খালি হাফপ্যান্টটা রাখল পরনে। এতই নিখুঁত ভাবে ডাইভ দিয়ে নেমে গেল, ঢেউ প্রায় উঠলই না। বকের মত গলা বাড়িয়ে ভেলার কিনারে ঝুঁকে এল অন্য তিনজন। দেখছে, হাত-পা নেড়ে নেমে যাচ্ছে একটা আবছা মূর্তি। কালো পানিতে কেমন যেন ভূতুড়ে দেখাচ্ছে।

সময় কাটছে।

'এতক্ষণ থাকে কি করে?' উদ্বিগ্ন হলো রবিন। 'বিপদ-টিপদ...'

'না,' বলল কিশোর। 'ওকে তো চেনই। অনেকক্ষণ দম রাখতে পারে। সেই যে সেবার...'

হুস্‌স্‌ করে ভেলার পাশে ভেসে উঠল মুসার মাথা। জোরে জোরে কয়েকবার শ্বাস টেনে বলল, 'আছে!'

'কি কি দেখলে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

ভেলার কিনার খামচে ধরে ভেসে রইল মুসা। দম নিয়ে বলল, 'এক ডুবে সোজা গিয়ে নামলাম নৌকায়। ভাঙা, পুরানো। তুলতে গেলে খুলে যাবে জোড়ায়, পচে গেছে। পলিথিনের একটা ব্যাগে রয়েছে মালগুলো। বেজায় ভারি। টানাটানি করেছি, তুলতে পারলাম না।'

'নড়েছে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'না, নড়েওনি।'

'তাহলে বেঁধে রেখেছে হয়তো। কিংবা অন্য কোনভাবে আটকে রেখেছে। দড়ি বেঁধে দিয়ে আসতে হবে। তারপর সবাই মিলে টেনে তুলব। তবে তার আগে কিসে আটকানো রয়েছে, সেটাও খুলে দিয়ে আসতে হবে।'

পানিতে বিচিত্র শিরশিরানি তুলে বয়ে গেল একঝলক বাতাস। সামান্য কাঁটা

দিয়ে উঠল মুসার গা।

'বাহ্, ব্যায়ামবীরেরও কাঁপুনি ওঠে দেখি,' হেসে বলল জিনা। 'বুঝলাম, তলায় কেমন ঠাণ্ডা। আমিও নামব ভাবছিলাম।'

'তাহলে এসো।'

'কাপড় আনিনি তো···ওঠো। গা মোছো।'

'দাঁড়াও, খানিকক্ষণ সাঁতার কেটে নিই।'

'না না, উঠে পড়ো,' বাধা দিল কিশোর। 'পরে আরও ডোবাডুবি করতে হবে। বোটহাউস থেকে গিয়ে দড়ি আনতে হবে আগে।' তীরের দিকে তাকাল সে।

নৌকা তীরের কাছে একটা শেকড়ে বেঁধে ওপরে উঠে গেছে দুই ডাকাত। দেখা যাচ্ছে না ওদেরকে। হঠাৎ আলোর ঝিলিক দেখতে পেল কিশোর, রোদে লেগে ঝিক করে উঠেছে কিছু।

আরেকবার দেখা গেল ঝিলিক। রবিনও দেখল এবার। 'কি ব্যাপার?' সপ্রশ্ন চোখে কিশোরের দিকে তাকাল রবিন।

'বুঝতে পারছ না? দূরবীণ। ব্যাটারা লুকিয়ে লুকিয়ে চোখ রেখেছে আমাদের ওপর। মুসা যে ডুব দিয়ে এসেছে, তা-ও দেখেছে।'

'তাহলে?' জিনার প্রশ্ন।

'তাহলে আর কি? এখন আর ডুব দেয়া চলবে না।'

'এখন ডুব দিতে যাচ্ছেও না। আগে বোটহাউস থেকে দড়ি আনতে হবে, তারপর···'

'তারপরও হবে না। ওরা আজ সারাদিন নড়বে না ওখান থেকে।'

'তাহলে?' আবার একই প্রশ্ন করল জিনা।

'রাতে চাঁদ থাকবে,' বলল কিশোর।

'ভেরি গুড আইডিয়া,' ভেলায় চাপড় মারল জিনা।

'লুটের মাল নিয়ে চলে যাব আমরা সকালে। তারপর আসবে সাহেবরা, পাবে ঠনঠন।' বুড়ো আঙুল দেখাল সে।

'এখন সরে যাচ্ছি আমরা?' মুসা জিজ্ঞেস করল।

'মোটেই না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'আমরা চলে গেলে ওরা এসে তুলে নিয়ে যেতে পারে। সারাদিন লেকে থাকব আমরা, ঘুরব-ঘারব। ওদের পাহারা দেব আমরা, আমাদেরকে দেবে ওরা।'

'দুপুরে না খেয়ে থাকব?'

'না। রাফিয়ানকে নিয়ে তুমি আর জিনা থাকবে ভেলায়। আমি আর রবিন গিয়ে নিয়ে আসব খাবার।'

'যদি আবার খাবার চুরি করে?'

'পারবে না। ভাঁড়ারের আলমারির পেছনে আরেকটা ছোট ঘর আছে, দেখেছি। আলমারির ভেতর দিয়ে ঢুকতে হয়। খুব ভালমত না দেখলে বোঝা যায় না কোনদিক দিয়ে কিভাবে ঢুকতে হয়। ওখানে রেখে আসব।'

'তুমি যখন দেখেছ, ওরাও তো দেখে ফেলতে পারে,' রবিন বলল।

'তা পারে, সেটুকু ঝুঁকি নিতেই হবে। আর কি করার আছে বলো? তবে ওরা

আমাদের চেয়ে বেশি উত্তেজিত, সেটা করতে যাবে বলে মনে হয় না। কাল চলে যাব বলেছি আমরা, খাবার চুরি করে রাগিয়ে দিতে চাইবে না।'

'যদি পিস্তল জোগাড় করে আনে?' জিনার প্রশ্ন।

'তাহলে আর কিছু করার থাকবে না আমাদের। দেখা যাক, কি হয়।'

পনেরো

হেসে খেলে কেটে গেল সারাটা দিন।

পশ্চিম দিগন্তে নেমে যাচ্ছে সূর্য। ডুবে গেল এক সময়। আকাশের লালিমা ঢেকে দিল এক টুকরো কালো মেঘ। শঙ্কা ফুটল জিনার চেহারায়।

'ও কিছু না, সরে যাবে,' আশ্বস্ত করল কিশোর।

ভেলা লুকিয়ে রেখে পাড়ে নামল ওরা। আস্তানায় ফেরার পথে চট করে একবার বোটহাউসে ঢুকে এক বাণ্ডিল দড়ি বের করে আনল মুসা।

ঠিকই অনুমান করেছে কিশোর, বৃষ্টি এল না। ঘণ্টাখানেক বাদেই পাতলা হয়ে গেল মেঘ, তারা দেখা দিল। পরিষ্কার আকাশ।

সিঁড়িমুখের কাছে রাফিয়ানকে পাহারায় রেখে অন্ধকার ভাঁড়ারে নামল ওরা। গোটা দুই মোম জ্বালল কিশোর।

না, কেউ ঢোকেনি ঘরে।

খাবার বের করে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিল ওরা।

'শুয়ে পড়ো সবাই,' বলল কিশোর। 'দশটা এগারোটার দিকে বেরোতে হবে।'

'একটা অ্যালার্ম-ক্লক থাকলে ভাল হত,' বলল মুসা। 'রবিন ঠিকই বলেছিল।'

'আমার ঘুম আসবে না,' রবিন বলল। 'ঠিক আছে, জেগে থাকি, সময়মত তুলে দেব তোমাদের।'

'ঘুম না আসুক, শুয়ে থাকো,' বলল কিশোর। 'বিশ্রাম হবে।'

শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল কিশোর আর মুসা। জিনার দেরি হলো।

চিত হয়ে শুয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছে রবিন। পাতালকক্ষে বাতাস ঢুকতে পারছে না ঠিকমত, তবু যা আসছে সিঁড়িমুখ দিয়ে, তাতেই কাঁপছে মোমের শিখা, ঘরের দেয়ালে ছায়ার নাচন। সত্যি, তাদের এই অভিযানের তুলনা হয় না। আর সে দেখেছে, যতবারই জিনা সঙ্গে থাকে, অ্যাডভেঞ্চার যেন মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। তার মনে পড়ল সেই প্রেতসাধকের কথা, সাগর সৈকতে গুপ্তধন উদ্ধারের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কথা, মৃত্যুখনির সেই বুক-কাঁপানো মৃত্যুগুহা···আর এবারকার অভিযানটাই বা কম কি? এক কাজ করবে—ভাবল সে, রকি বীচে ফিরেই কিশোরকে পটিয়ে-পাটিয়ে জিনাকেও গোয়েন্দাদের একজন করে নেবার কথা বলবে। জানে, সহজে রাজি হবে না কিশোর। আদৌ রাজি হবে কিনা, তাতেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে রবিনের, তবু বলে দেখবে। এখন আর অসুবিধে নেই। রকি বীচেই স্কুলে ভরতি হয়েছে জিনা, ইচ্ছে করলে চার গোয়েন্দা করা যায়···

এগোরোটা বাজার দশ মিনিট আগে সবাইকে তুলে দিল রবিন।

সারাদিন পরিশ্রমের পর এত আরামে ঘুমিয়েছিল, উঠতে কষ্ট হলো তিনজনেরই।

তৈরি হয়ে নিল।

বেরিয়ে এল বাইরে।

যেমন রেখে গিয়েছিল, তেমনি শুয়ে আছে রাফিয়ান, কিন্তু সতর্ক। সাড়া পেয়ে উঠে বসল।

আকাশে অনেকখানি উঠে এসেছে চাঁদ। উজ্জ্বল জ্যোৎস্না। সারা আকাশ জুড়ে সাঁতার কাটছে ছোট-বড় মেঘের ভেলা। কখনও চাঁদ ঢেকে দিচ্ছে, আবছা অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে বনভূমি, চাঁদ বেরিয়ে এলেই হেসে উঠছে আবার হলুদ আলোয়।

'তাঁবুর কাছে কাউকে দেখা যাচ্ছে না,' উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখে বলল মুসা।

'না যাক,' কিশোর বলল। 'তবু সাবধানের মার নেই। কোন রকম শব্দ করবে না। এসো যাই।'

গাছপালা আর ঝোপের ছায়ার পাঁচ মিনিট হাঁটল ওরা হ্রদের পাড় ধরে। চাঁদের আলোয় চকচকে বিশাল এক আয়নার মত দেখাচ্ছে হ্রদটাকে। গুনগুন করে গান ধরল মুসা, জিনাও তার সঙ্গে গলা মেলাতে যাচ্ছিল, বেরসিকের মত বাধা দিয়ে বসল কিশোর। 'এই চুপ চুপ, গান গাওয়ার সময় নয় এটা। ব্যাটারা শুনলে...'

ভেলায় চড়ল ওরা।

সবাই উত্তেজিত, রোমাঞ্চিত। সেটা সংক্রামিত হয়েছে রাফিয়ানের মাঝেও। চঞ্চল। কি করবে যেন বুঝে উঠতে পারছে না। রাতের এই অভিযান দারুণ লাগছে তার কাছে। আর কিছু করতে না পেরে এক এক করে গাল, হাত, চেটে দিতে লাগল সবার।

এক রত্তি বাতাস নেই। বড় বেশি নীরব। দাঁড়ের মৃদু ছপছপ শব্দও বেশি হয়ে কানে বাজছে। পানির ছোট ছোট ঢেউ আর বুদবুদ উঠে সরে যাচ্ছে ভেলার গা ঘেঁষে, রূপালি খুদে ফানুসের মত ফাটছে বুদবুদগুলো।

'এত সুন্দর রাত খুব কমই দেখেছি,' তীরের নীরব গাছপালার দিকে চেয়ে আছে রবিন। 'এত শান্তি। এত নীরব।'

তাকে ব্যঙ্গ করার জন্যেই যেন কর্কশ চিৎকার করে উঠল একটা পেঁচা। চমকে গেল রবিন।

'যাও, গেল তোমার নীরবতা,' হাসতে হাসতে বলল মুসা।

'রবিন ঠিকই বলেছে,' কিশোর বলল, 'এত সুন্দর রাত আমিও কম দেখেছি। ইয়ার্ডে কাজ না থাকলে, এমনি জ্যোৎস্না রাতে ছাতে উঠে বসে থাকে রাশেদচাচা, অনেকদিন দেখেছি। আকাশের দিকে, চাঁদের দিকে চেয়ে চেয়ে কি যেন ভাবে। জিজ্ঞেস করেছিলাম একদিন। বিশ্বাস করবে? কেঁদে ফেলেছিল চাচা, দেশের কথা, তার ছেলেবেলার কথা বলতে বলতে। বাংলাদেশে নাকি এর চেয়েও সুন্দর চাঁদ ওঠে। ফসল কাটা শেষ হলে ধু-ধু করে নাকি ফসলের মাঠ, ধবধবে সাদা। শিশির ঝরে। চাঁদনি রাতে শেয়ালের মেলা বসে সেই মাঠে, বৈঠক বসে, চাচা নাকি দেখেছে। চাচা প্রায়ই বলে, কোনমতে ইয়ার্ডের ভারটা আমার কাঁধে গছাতে পারলেই চাচীকে নিয়ে দেশে চলে যাবে...'

'আরে, এই রাফি, আমার কান খেয়ে ফেলবি নাবি?' বেরসিকের মত মুসার গান তখন থামিয়ে দিয়েছিল কিশোর, সেই শোধটা নিল যেন এখন।

'ওই যে, বাক্সটা না?' হাত তুলে বলল জিনা।

হ্যাঁ, বাক্সটাই মারকার। চাঁদের আলো চিকচিক করছে ওটার ভেজা পিঠে।

কাছে এসে ভেলা থামাল।

কাপড় খুলতে শুরু করল মুসা। জিনা সাঁতারের পোশাক পরে এসেছে।

রিঙের মত করে পেঁচানো দড়ির বাণ্ডিলের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিল মুসা। ডাইভ দিয়ে পড়ল পানিতে। জিনা নামল তার পর পরই।

দম কেউ কারও চেয়ে কম রাখতে পারে না।

প্রথমে ভাসল জিনার মাথা।

তার কিছুক্ষণ পর মুসার। দম নিয়ে বলল, 'বাঁধন কেটে দিয়েছি পোঁটলাটার। আবার যেতে হবে, দড়ি বাঁধব।'

জিনাকে নিয়ে আবার ডুব দিল মুসা।

দুজনে মিলে শক্ত করে ব্যাগের মুখে পেঁচিয়ে বাঁধল দড়ি। হ্যাঁচকা টান দিয়ে দেখল মুসা, খোলে কিনা। খুলল না। ওপর থেকে টেনে তোলা যাবে, বাঁধন খুলে পড়ে যাবে না ব্যাগে।

দড়ির আরেক মাথা হাতে নিয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল মুসা। পাশে জিনা।

'হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর

হাঁপাতে হাঁপাতে মাথা ঝাঁকাল দুজনে।

দম নিয়ে ভেলায় উঠে এল জিনা আর মুসা।

'তোয়ালেটা কোথায়?' কাঁপতে কাঁপতে বলল জিনা। 'ইস্, পানি তো না, বরফ।'

তাদের দিকে নজর নেই এখন রবিন আর কিশোরের। দড়ি ধরে টেনে ব্যাগটা তুলতে শুরু করেছে। ভারের জন্যে একপাশে কাত হয়ে গেছে ভেলা। আরেকটু টান পড়লেই পানি উঠবে।

উল্টোধারে সরে গেল জিনা আর মুসা, রাফিয়ানকেও টেনে সরাল নিজেদের দিকে। সোজা হলো আবার ভেলা।

তীরের দিকে চেয়ে হঠাৎ ঘাউ ঘাউ করে উঠল রাফিয়ান।

তাড়াতাড়ি তার মুখে হাত চাপা দিয়ে ধমক দিল জিনা, 'চুপ! চুপ!' শঙ্কিত চোখে তাকাল কুকুরটা যেদিকে চেয়ে আছে সেদিকে। 'টিকসিরা আসছে না তো?'

কাউকে দেখা গেল না। বোধহয় শেয়াল-টেয়াল দেখেছে রাফিয়ান।

ব্যাগটা তুলে আনা হয়েছে।

আর এখানে থাকার কোন মানে নেই। তীরের দিকে রওনা হলো ওরা।

ভালয় ভালয় আস্তানায় ফিরে যেতে পারলেই বাঁচে এখন।

ভেলা আগের মতই লুকিয়ে রাখা হলো। বোটহাউসে রাখলে আর ডারটি দেখে ফেললে সন্দেহ করবে। কি ঘটেছে বুঝেও যেতে পারে।

খাড়া পাড়, শেকড় বেয়ে উঠতেই কষ্ট হয়। ভারি একটা বোঝা নিয়ে ওঠা যাবে না। ব্যাগটা নিচে রেখে, দড়িটা দাঁতে কামড়ে ধরে আগে উঠে গেল মুসা।

তার পেছনে রবিন আর জিনা। কিশোর নিচে রয়েছে। দড়ি ধরে ব্যাগটা টেনে তুলতে বলল ওদেরকে।

ব্যাগটা উঠে যেতেই সে-ও উঠে এল ওপরে।

চুপ করে আছে রাফিয়ান। তারমানে ঝোপের ভেতর ঘাপটি মেরে নেই কেউ, আচমকা ঘাড়ে এসে লাফিয়ে পড়বে না।

গাছের ছায়ায় ছায়ায় আস্তানায় ফিরে এল ওরা। রাফিয়ানকে সিঁড়িমুখের কাছে পাহারায় বসিয়ে অন্যেরা নেমে এল ভাঁড়ারে।

মোম জ্বালল কিশোর।

'আগে কিছু খেয়ে নিলে কেমন হয়?' প্রস্তাব দিল মুসা।

'ভালই হয়,' জিনাও রাজি।

স্যাণ্ডউইচ বের করে খেতে শুরু করল তিনজনে, কিশোর বাদে। সে ব্যাগ খোলায় ব্যস্ত।

'যা বাঁধা বেঁধেছ,' ভেজা গিঁট কিছুতেই খুলতে পারল না গোয়েন্দাপ্রধান, 'কাটতে হবে।' ছুরি বের করল সে।

বাঁধন কাটার পরেও ব্যাগের মুখ দিয়ে ভেতরের বাক্সমত জিনিসটা বের করা গেল না। দীর্ঘ পানিতে থেকে থেকে বাক্সের গায়ে আঠা হয়ে লেগে গেছে প্লাসটিকের চাদর। কেটে, ছিঁড়ে তারপর বের করতে হবে।

'দাও তো, আমাকেও একটা দাও,' হাত বাড়াল কিশোর।

একটা স্যাণ্ডউইচ দিল জিনা।

খেয়ে নিয়ে আবার চাদর কাটায় মন দিল কিশোর। ভেতরে কি আছে দেখার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে সবাই।

স্টীলের একটা ট্রাংক বেরোল, ফাঁকগুলো রবারের লাইনিং দিয়ে এমন ভাবে বন্ধ, পানি ঢোকার পথ নেই।

তালা লাগানো নেই, নইলে আরেক ফ্যাকড়া বাধত।

ডালা তুলতে শুরু করল কিশোর। দুরুদুরু করছে সবার বুক। ঝুঁকে এসেছে ট্রাংকের চারপাশ থেকে।

ডালা তোলা হলো। ভেতরে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে প্লাসটিকের অসংখ্য ছোট বাক্স। সব এক সাইজের।

'গহনার বাক্স!' হাত বাড়িয়ে একটা বাক্স তুলে নিল জিনা। ঢাকনা খুলে স্থির হয়ে গেল।

সবার চোখেই বিস্ময়।

কালো মখমলের শয্যায় শুয়ে আছে একটা অপূর্ব সুন্দর নেকলেস। মোমের আলোয় জ্বলছে যেন পাথরগুলো। নিশ্চয় কোন রানী-মহারানীর।

'এটার ছবি দেখেছি আমি,' বিড়বিড় করল জিনা। 'ফেলোনিয়ার রানীর গলায়। তিনি পরে তাঁর এক ভাস্তিকে জন্মদিনে প্রেজেন্ট করে দেন। ভাস্তির বর হলিউডের নামকরা অভিনেতা, বিরাট বড়লোক।'

'হীরা, না?' মুসা বলল। 'দাম কত হবে? একশো পাউণ্ড?'

'মাঝে মাঝে এত বোকার মত কথা বলো না তুমি। একশো হাজার পাউণ্ডেও

দেবে না।'

'থাকগে তাহলে, আমার ওসব কোনদিনই লাগবে না,' হাত নাড়ল মুসা।

'তুমি হার দিয়ে কি করবে? ব্যাটাছেলে হার পরে?' জিনা বলল।

'কে বলল পরে না? হিপ্পি মার্কা গায়কগুলোর গলায় তো প্রায়ই দেখি।'

আরও কয়েকটা বাক্স খুলে দেখল ওরা। প্রতিটা গহনা দামী। হীরা-পান্না-চুনি-মুক্তা, সবই রয়েছে। হার, কানের দুল, চুরি, আঙটি, প্রায় সব ধরনের অলঙ্কার আছে। রাজার সম্পদ।

'একসঙ্গে এত গহনা কোন মিউজিয়ামেও দেখিনি,' বলল রবিন।

'যাক, ভালই হলো,' ফোঁস করে চেপে রাখা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল কিশোর, 'চোরের হাতে পড়ল না। ভাগ্যিস আমরা এসে পড়েছিলাম। নইলে পুলিশ জানতই না, অখ্যাত এক হ্রদের তলায় লুকানো ছিল এগুলো।'

'নেব কি করে?' মুসার প্রশ্ন।

'সেটাই ভাবছি। ট্রাংক নিয়ে ডারটি আর টিকসির সামনে দিয়ে যাওয়া যাবে না। এক কাজ করো, যার যার ব্যাগে ভরে ফেল, যতটা পারা যায়। বাকিগুলোর বাক্স ফেলে দিয়ে রুমালে পোঁটলা বাঁধব।'

ভাগাভাগি করে ব্যাগে ভরার পরও অনেক জিনিস রয়ে গেল। বাক্স থেকে খুলে ওগুলো রুমালে বাঁধতে হলো, তাতেও লাগল চারটে রুমাল। চারজনের কাছ থাকবে চারটে, ঠিক হলো।

'সকালে উঠে প্রথমে কোথায় যাব?' রবিন জিজ্ঞেস করল। 'পুলিশ?'

'এখানকার পুলিশের যা সুরত দেখে এলাম,' মুখ বাঁকাল কিশোর। 'হবে না। পোস্ট অফিস থেকে মিস্টার নরিসকে ফোন করব। তিনি কিছু একটা ব্যবস্থা করবেন। তাঁকে বিশ্বাস করা যায়।'

'আমার ঘুম পাচ্ছে,' বড় করে হাই তুলল মুসা, মুখের কাছে হাত নিয়ে গিয়ে আঙুলগুলো কলার মোচার মত বানিয়ে নাড়ল বিচিত্র ভঙ্গিতে, ঢুকিয়ে দেবে যেন মুখের ভেতর।

শুয়ে পড়ল সবাই। কিন্তু ঘুম কি আর আসে? বিপদ কাটেনি এখনও।

ষোলো

রাফিয়ানের চেঁচামেচিতে সকালে ঘুম ভাঙল ওদের। সিঁড়িমুখ দিয়ে রোদ ঢুকছে।

লাফিয়ে উঠে বসল কিশোর। অন্যদের ঘুমও ভেঙে গেছে।

কি হয়েছে দেখার জন্যে ওপরে উঠে এল গোয়েন্দাপ্রধান।

টিকসি দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখে ভাব জমাতে চাইল, 'তোমাদের কুকুরটা কিন্তু খুব ভাল। ধারেকাছে ঘেঁষতে দেয় না কাউকে।'

'ধন্যবাদ,' নিরস গলায় বলল কিশোর।

'দেখতে এলাম, খাবার-টাবার কিছু আছে কিনা,' হাসল টিকসি। 'লাগবে কিছু?'

'হঠাৎ দরদ এমন উথলে উঠল কেন?' কেন, সেটা খুব ভালমতই বুঝতে পারছে

কিশোর। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের হাত থেকে নিস্তার পেতে চায় দুই ডাকাত।

'খাবার তাহলে লাগবে?' কিশোরের তীব্র খোঁচাটা কোনমতে হজম করল টিকসি। তাছাড়া তাকে ভয়ও পেতে আরম্ভ করেছে। বড় বেশি ধার ছেলেটার জিভে। চাঁচাছোলা কথা। কাউকে পরোয়া করে বলে না।

'নো, থ্যাংকস,' আবার বলল কিশোর। 'অনেক খাবার বেঁচে গেছে। কারও লাগলে বরং দিতে পারি।'

'ও...তা...তা,' আমতা আমতা করছে টিকসি। কি বলতে গিয়ে আবার কি জবাব শুনতে হবে কে জানে! 'যাচ্ছ কখন?'

'যাব। আজ স্কুলে হাজিরা দিতেই হবে।'

'তাড়াতাড়ি করো তাহলে। বৃষ্টি আসবে।'

আকাশের দিকে তাকাল কিশোর। 'কই, মেঘের নামগন্ধও তো দেখছি না।'

অন্যদিকে চোখ ফেরাল টিকসি।

মুচকি হেসে ঘুরে দাঁড়াল কিশোর। সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল নিচে। টিকসি যেমন চাইছে ওরা চলে যাক, কিশোরও চাইছে সে চলে যাক। মহিলা দাঁড়িয়ে থাকলে ওদেরও বেরোতে অসুবিধে।

দশ মিনিটেই তৈরি হয়ে বেরিয়ে এল চারজনে।

টিকসি চলে যাচ্ছে, ঝোপের ওপর দিয়ে মাথা দেখা যাচ্ছে তার। ফিরে তাকাল একবার, এক মুহূর্ত থেমে দেখল, তারপর ঘুরে আবার হাঁটতে লাগল।

'জলার ধার দিয়ে যেতে ভালই লাগবে,' রবিন বলল।

'সেদিন আসার সময় সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল, ভালমত দেখতে পারিনি। আজ দেখব।'

কথা বলতে বলতে চলেছে ওরা। জোরে পা চালাচ্ছে। যত তাড়াতাড়ি পোড়া বাড়ির কাছ থেকে সরে যাওয়া যায়, ভাল।

সময়ের হিসেব রাখছে না ওরা, দরকার মনে করছে না। মুসার একটা কথায় হেসে উঠল সবাই। এই সময় হঠাৎ পেছনে চেয়ে গলা ফাটিয়ে ঘেউঘেউ জুড়ে দিল রাফিয়ান।

ফিরে তাকাল সবাই। চমকে উঠল। দৌড়ে আসছে দুই ডাকাত।

'আরে, জলা ভেঙেই আসছে। গাধা নাকি?' রবিন বলল

'শর্ট-কাট,' কিশোর বলল। 'চোরাকাদায় পড়লে ঠেলা বুঝবে। মরুকগে ব্যাটারা। হাঁটো। পথ ধরে। আমরা জলায় নামছি না।'

চলার গতি বাড়িয়ে দিল ওরা।

'পাগল হয়ে গেছে,' ফিরে চেয়ে বলল জিনা।

'হবারই কথা,' কিশোর বলল। 'এভাবে নাকের ডগা দিয়ে লাখ লাখ ডলার চলে যাচ্ছে। নৌকায় মাল না পেয়ে নিশ্চয় আমাদের ভাঁড়ারে ঢুকেছিল। ট্রাংক আর বাক্সগুলো ওভাবে রেখে আসা উচিত হয়নি। জঙ্গলে ফেলে দিয়ে এলে হত।'

'আসুক না, কি হবে?' মুসা বলল। 'রাফি আছে। তাছাড়া আমরা চারজন। দুজনের সঙ্গে পারব না? পিস্তল নেই ওদের কাছে।'

'তা-ও কথা ঠিক। দেখি কি হয়।'

ছপছপ করে কাদাপানি ভেঙে আসছে ডারটি। তার পেছনে টিকসি। কোথায় পা ফেলছে, খেয়ালই করছে না।

অনেক কাছে এসে পড়ল দুজনে।

গোয়েন্দাদের সঙ্গে বোঝা, দৌড়ানোর উপায় নেই। হাঁপিয়ে পড়ল।

'এভাবে হবে না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'ধরে ফেলবে। তার চেয়ে দাঁড়াই। দেখা যাক কি করে।'

ফিরে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে শুরু করল রাফিয়ান। ভয়ানক হয়ে উঠেছে চেহারা। কিন্তু কেয়ার করছে না ডারটি। বাঘা কুকুরের সঙ্গে লাগতেও যেন আপত্তি নেই আর এখন। যে করেই হোক, গহনাগুলো তার চাই।

আর বেশি বাকি নেই, ধরে ফেলবে ছেলেদের, এই সময় বিপদে পড়ল ডারটি। আঠাল কাদায় আধ হাত ডুবে গেল পা। কোনমতে টেনে তুলে আরেক জায়গায় ফেলল, ভাবল ওখানটায়ও নরম কাদা। কিন্তু তলায় পাথর বা শক্ত অন্য কিছু রয়েছে, যেটাতে জোরে পা পড়ায় বেকায়দা রকম কাত হয়ে গেল পা, গোড়ালি গেল মচকে। চেঁচিয়ে উঠল, 'বাবারে, গেছি! আমার পা গেল! উফ্!' আধহাত কাদার মধ্যেই বসে পড়ল সে।

তাকে তোলার জন্যে লাফিয়ে এগিয়ে আসতে গিয়ে টিকসিরও দুই পা দেবে গেল কাদায়, একবারে হাঁটু পর্যন্ত। টেনে তোলার জন্যে জোরাজুড়ি করতেই আরও ডুবে গেল পা। আতঙ্কিত হয়ে পড়ল সে, ভাবল চোরা কাদায় ডুবে যাচ্ছে।

ভালমত আটকেছে দুজন। এমন এক জায়গায়, কেউ গিয়ে সাহায্য না করলে বেরিয়েই আসতে পারবে না। সাহায্যের জন্যে অনুনয় শুরু করল।

মায়া হলো রবিনের। 'যাব নাকি?'

'পাগল হয়েছ,' বলল মুসা।

'থাক,' কিশোর বলল, 'শিক্ষা হোক কিছুটা। আমরা গিয়ে লোক পাঠিয়ে দেব। চোরাকাদায় পড়েনি, মরবে না। তুলতে গিয়ে আমরাই শেষে পড়ব বিপদে।'

ওদেরকে দেখে খুশি হলো পোস্টম্যান। 'কেমন কেটেছে, অ্যাঁ? টু-ট্রীজে?'

'খুব ভাল,' বলে অন্যদের রেখে টেলিফোনের দিকে এগোল কিশোর।

বাড়িতেই পাওয়া গেল মিস্টার নরিসকে। শুনে তো প্রথমে চমকে উঠলেন। বললেন, 'তোমরা ওখানেই থাকো। আমি আসছি।'

ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে পৌঁছে গেলেন নরিস। ছেলেদের গাড়িতে তুলে নিলেন। গ্রামরক্ষীর কাছে গিয়ে কিছুই হবে না, সোজা চললেন শেরিফের কাছে। জেলখানাটার কাছেই শেরিফের অফিস।

শেরিফ লোক ভাল, বুদ্ধিমান। সাড়ে ছয় ফুট লম্বা, লিকলিকে শরীর। সব শুনে শিস দিয়ে উঠলেন। পোঁটলা খুলে প্রথমেই তুলে নিলেন ফেলোনিয়া নেকলেসটা।

'এটা যে কত খোঁজা খুঁজেছে পুলিশ,' বললেন তিনি। বেল বাজিয়ে সহকারীকে ডেকে সংক্ষেপে সব জানিয়ে বললেন 'হ্যারি, তিনজন লোক নিয়ে যাও। ডাকাতদুটোকে তুলে আনোগে।'

অবাক হয়ে শুনল হ্যারি। ছেলেদের দিকে চেয়ে সামান্য মাথা ঝাঁকাল। হেসে

বলল, 'তোমরা বাহাদুর। যাই, নিয়ে আসিগে পাজিগুলোকে।'

গহনাগুলো শেরিফের দায়িত্বে দিয়ে দিল ছেলেরা। তবে প্রতিটি জিনিসের একটা লিস্ট করে তাতে 'রিসিভড' লিখিয়ে শেরিফের স্বাক্ষর নিয়ে নিল। সাক্ষী রইলেন মিস্টার নরিস। কাগজটা ভাঁজ করে সযত্নে পকেটে রেখে দিল কিশোর।

'পাখোয়াজ ছেলে,' তারিফ করলেন শেরিফ। 'বড় হয়ে কি হওয়ার ইচ্ছে?'

'হয়তো গোয়েন্দাই থেকে যাব,' বলল কিশোর। 'জানি না এখনও।'

শেরিফের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরোল ওরা। খামারে নিয়ে যাওয়ার জন্যে অনেক চাপাচাপি করলেন মিস্টার নরিস, কিন্তু রাজি হলো না ছেলেরা। স্কুল কামাই করবে না।

শেষে তাদেরকে বাস স্টেশন পর্যন্ত পৌছে দিলেন মিস্টার নরিস।

বিদায় নেয়ার আগে একে একে সবাই হাত মেলাল তাঁর সঙ্গে। গম্ভীর মুখে রাফিয়ানও একটা পা বাড়িয়ে দিল।

হেসে উঠলেন মিস্টার নরিস। 'তুই একটা কুকুর বটে, রাফি। তোর মত একটা কুকুর যদি আমার থাকত।'

গোঁ গোঁ করে কুকুরে-ভাষায় কিছু বলল রাফিয়ান, বোধহয় বলেছে, 'ঠিক আছে, যান। জিনা তাড়িয়ে দিলেই চলে আসব আপনার কাছে।'

তার কথা যেন বুঝতে পারল জিনা, তাড়াতাড়ি গলার বেল্ট ধরে রাফিয়ানকে কাছে সরিয়ে নিল।

হাসল সবাই।

আবার এদিকে কখনও বেড়াতে এলে যেন তাঁর বাড়িতে ওঠে, বার বার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিলেন মিস্টার নরিস।

বাস আসতে বোধহয় দেরি আছে।

মুসা বলল, 'কিছু খেয়ে নিলে কেমন হয়?'

'খুব ভাল,' বলল কিশোর। 'আমিও একথাই ভাবছিলাম।' খাবারের দোকানটা দেখিয়ে বলল, 'চলো, ডিকের মায়ের সঙ্গেও দেখা হবে। বলেছিলেন ফেরার পথে দেখা করে যেতে।'

ছেলেদের দেখে খুব খুশি হলেন বৃদ্ধা। তবে আগের বারের মতই রাফিয়ানকে ভেতরে ঢুকতে দিলেন না, দরজার বাইরে রাখলেন। আদর-অভ্যর্থনার পর টুকটাক আরও কিছু কথা, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'আজ কটা স্যাণ্ডউইচ লাগবে?'

'আজ বেশি লাগবে না, বাড়ি ফিরছি তো,' বলল কিশোর। 'তাছাড়া পথে খিদে পেলে খাবার পাওয়া যাবে।' হিসেব করে বলল, 'চার-পাঁচে বিশটা।'

'ঠিক আছে,' ঘুরে রান্নাঘরের দিকে রওনা হলেন বৃদ্ধা। দরজার কাছে গিয়ে ফিরলেন। 'হ্যাঁ, কেউ এলে ডেকো।'

চলে গেলেন দরজার ওপাশে।

****
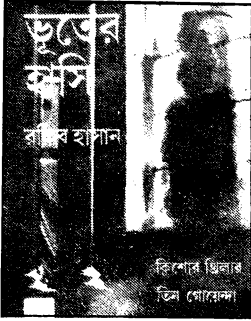
ভূতের হাসি

প্রথম প্রকাশ ঃ মে, ১৯৮৮

সাইকেলের লাইট জ্বেলে দিল মুসা আর রবিন। বাড়ি এখনও মাইল দুয়েক। শীতকালে ক্যালিফোর্নিয়ার এই পার্বত্য অঞ্চলে হঠাৎ করেই রাত নামে।

'খাইছে!' বলে উঠল সহকারী গোয়েন্দা। 'আরও আগে রওনা দেয়া উচিত ছিল।'

'হুঁ,' অন্ধকারে হাসল রবিন মিলফোর্ড। 'খাইছে' বলা মুদ্রাদোষ হয়ে গেছে তার বন্ধু মুসা আমানের।

পর্বতের ভেতরে পাহাড়ী নদীতে সাঁতার কাটতে গিয়েছিল দুই গোয়েন্দা। চমৎকার কেটেছে দিন, আরও ভাল লাগত যদি কিশোর থাকত সঙ্গে। তাদের আরেক বন্ধু কিশোর পাশা, তিন গোয়েন্দার প্রধান। স্যালভিজ ইয়ার্ডে জরুরী কাজ ছিল, তাই যেতে পারেনি।

ধীরে ধীরে প্যাডাল ঘুরিয়ে চলেছে দুই ক্লান্ত কিশোর। পাহাড়ী পথ। এক পাশে পাথরের দেয়াল শুরু হলো।

রাতের অন্ধকার চিরে দিল তীক্ষ্ণ চিৎকার।

সাহায্য চায়!

চমকে ব্রেক চাপল মুসা। দাঁড়িয়ে গেল সাইকেল। সামলাতে না পেরে তার গায়ের ওপর এসে পড়ল রবিন, 'উফ্' করে উঠল।

ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা, 'শুনেছ?'

মুসার সাইডস্ট্যাণ্ডের ভেতর ঢুকে গেছে রবিনের সামনের চাকা, টেনে ছাড়িয়ে নিতে নিতে বলল, 'শুনলাম তো। কেউ ব্যথা পেল বুঝি?'

কান পেতে রয়েছে দুজনে।

দেয়ালের ওপাশে ঝোপের ভেতর কিসের নড়াচড়া।

আবার শোনা গেল চিৎকার।

হ্যাঁ, সাহায্যের আবেদনই। বিপদে পড়েছে লোকটা।

ওদের ঠিক সামনে ভারি একটা লোহার গেট, পাল্লার ওপর কাঁটা বসানো। দেয়ালের ওপাশে যাওয়ার পথ।

এক মুহূর্ত দ্বিধা করল না আর মুসা। সাইকেল রেখে দৌড় দিল গেটের দিকে।

পেছনে ছুটল রবিন। 'হাউফ' করে কনুই চেপে ধরে দাঁড়িয়ে পড়ল হঠাৎ। ছোট্ট কি যেন জোরে বাড়ি খেয়ে উড়ে গিয়ে পড়ল মাটিতে।

'এই যে,' নিচু হয়ে জিনিসটা কুড়িয়ে নিল মুসা।

ইঞ্চি তিনেক লম্বা ধাতব জিনিস, স্পষ্ট দেখা না গেলেও বুঝতে অসুবিধে হলো না, পুতুল। তারার আলোয় মৃদু চকচক করছে।

'কে ছুঁড়ল, মুসা?'

'জানি না। দেখো, গলায় ফাঁস লাগানো। 'বাঁধা ছিল কোন কিছুর সঙ্গে।'

'দেয়ালের ওপাশ থেকে ছুঁড়েছে মনে হলো,' রবিন বলল। 'তোমার…' থেমে গেল। দেয়ালের ওপাশে পায়ের শব্দ। ঝোপঝাড় মাড়িয়ে ছুটে আসছে।

'কি যেন ছুঁড়ে ফেলেছে। দেখো দেখো,' চাপা গলায় বলল কেউ।

'দেখছি, বস্,' বলল দ্বিতীয়জন।

গেটের তালায় ঘষার শব্দ, খোলার চেষ্টা চলছে।

দ্রুত এদিক ওদিক তাকাল দুই গোয়েন্দা। বড় একটা ঝোপ দেখে তাড়াতাড়ি গিয়ে তার মধ্যে সাইকেল ঢোকাল, লুকিয়ে বসে রইল ভেতরে। দেয়ালের কাছাকাছি।

মরচে ধরা কব্জায় কিচকিচ শব্দ তুলে খুলে গেল লোহার ভারি পাল্লা। গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একটা আবছা মূর্তি, রাস্তার ধার ধরে দৌড় দিল।

ঝোপের ভেতর দম বন্ধ করে রয়েছে ছেলেরা, দুরুদুরু করছে বুক। তাদের পাশ দিয়ে ছুটে চলে গেল লোকটা।

'চেহারা দেখেছ?' ফিসফিস করল রবিন।

'না। বেশি অন্ধকার।'

'আমিও না। পুতুলটা খুঁজছে বোধহয়। দিয়ে দেয়া উচিত।'

'চুপ!'

ফুট দশেক দূরে এসে দাঁড়িয়েছে আরেকটা ছায়ামূর্তি। লম্বা, চোখা নাক। পাখির মাথার মত খুদে একটা মাথা, পাখির মতই ঝটকা দিয়ে এদিক ওদিক নড়ছে।

দুজনকে চমকে দিয়ে অদ্ভুত কণ্ঠে হেসে উঠল মূর্তিটা।

আতঙ্কে অবশ হয়ে এল মুসার শরীর।

তাদের আরও অবাক করে মানুষের কণ্ঠে কথা বলে উঠল আজব পক্ষীমানব, 'চলে এসো। এখন পাবে না।'

'হ্যাঁ, বস্। বেশি অন্ধকার,' পথের ধার থেকে জবাব দিল দ্বিতীয় মূর্তিটা। 'কাল সকালে খুঁজে বের করব।'

মাথার কাছে সামান্য কুঁজো কিম্ভূত ছায়াটার। অন্য ছায়াটা তার কাছাকাছি হলো। ঝোপ মাড়িয়ে গেটের দিকে এগোল দুটোই। ভেতরে ঢুকল, বিচিত্র শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল পাল্লা। তালা লাগল আবার। ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল পদশব্দ।

'দেখেছ?' গলা কাঁপছে রবিনের। 'মাথাটা দেখেছ? একেবারে পাখি! আর হাসিটা কি জঘন্য। পিলে চমকে যায়। কি ওটা?'

'আল্লা মালুম।'

'চলো, ইয়ার্ডে যাই। কিশোরকে বলব।'

'হ্যাঁ, চলো,' মুসা একমত হলো।

সাইকেলে চাপল আবার দুই গোয়েন্দা। জোরে প্যাডাল ঘুরিয়ে চলল। যত তাড়াতাড়ি পারে সরে যেতে চায় ভূতুড়ে এলাকা থেকে। লা ক্যাসিটাস ধরে চলেছে ওরা। পেছনে আবার শোনা গেল অট্টহাসি, খান খান করে দিল যেন পাহাড়ী

রাতের জমাট নিস্তব্ধতা।

গতি আরও বাড়াল ওরা। গিরিপথ পেরিয়ে এসে সামনে রকি বীচের পরিচিত আলো দেখার আগে কমাল না।

দুই

'নিরেট, নিখাদ স্বর্ণ!' বিড়বিড় করল কিশোর।

হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে পুতুলটা।

'দামী?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'সোনার চেয়েও দামী,' মাঝে মাঝে কঠিন শব্দ ব্যবহার, কিংবা দুর্বোধ করে কথা বলা কিশোরের স্বভাব।

'সোনা আবার সোনার চেয়ে দামী হয় কিভাবে?' বুঝতে পারছে না মুসা।

হাসিতে বিকশিত পুতুলটা ঠকাস করে টেবিলে নামিয়ে রাখল কিশোর। ঋষিদের মত আসন পেতে বসল সোনার পুতুল। 'দেখেছ, কি যত্ন করে খোদাই করেছে? দক্ষ শিল্পীর কাজ। মাথায় দেখো, যেন পালকের মুকুট। শিল্পী রেড ইনডিয়ান। অনেক পুরানো। এ-রকম জিনিস মিউজিয়ামে দেখেছি।'

হেডকোয়ার্টারে আলোচনায় বসেছে তিন গোয়েন্দা।

পুরানো একটা মোবাইল হোম, ট্রেলার, বাতিলই কিনে এনেছেন কিশোরের চাচা রাশেদ পাশা। বিক্রি করা যায়নি ওটা। দিয়ে দিয়েছেন ছেলেদেরকে। লোহালক্কড় আর পুরানো জঞ্জালের তলায় চাপা পড়েছে ওটা এখন, বাইরে থেকে চোখে পড়ে না।

জঞ্জালের ভেতর দিয়ে কয়েকটা গোপন পথ বানিয়ে নিয়েছে তিন কিশোর, হেডকোয়ার্টারে ঢোকার পথ। ভাঙা ট্রেলারটাকে ঠিকঠাক করে নিয়েছে ওরা, ভেতরটা আর বোঝাই যায় না, বাতিল হয়ে পড়ে ছিল। চেয়ার-টেবিল আছে, টেলিফোন, টেপ-রেকর্ডার আর নানা রকম আধুনিক যন্ত্রপাতি আছে, ছোট একটা ল্যাবরেটরি, এমনকি খুদে ডার্করুমও রয়েছে ছবি প্রসেস করার জন্যে।

নিচের ঠোঁটে বার দুই চিমটি কাটল কিশোর; বলল, 'তাহলে, তোমাদের ধারণা, সাহায্যের জন্যে যে চেঁচিয়েছে সে-ই পুতুলটা ছুঁড়ে দিয়েছে? কিন্তু ধারণা দিয়ে তো কাজ হবে না, প্রমাণ চাই।'

'কি বলছ, কিশোর?' প্রতিবাদ করল মুসা। 'চিৎকার শুনে বীরের মত এগিয়ে গেলাম সাহায্য করতে। অন্ধকারে পুতুল কুড়িয়ে নিলাম। ঝোপের ভেতরে লুকিয়ে ভূত দেখলাম, হাসি শুনলাম, তা-ও পালালাম না। আর কি করতে পারতাম?'

'বস্ বস্ করল,' বলল রবিন। 'ডাকাতের দল না-তো?'

'তাহলে ওই ভূতুড়ে ছায়াটা কি? পাখির মত মাথা, ঠোঁটের মত নাক, কুঁজো। আর কি হাসি। ভূতের বাপ ওটা, ডাকাত না।'

'অযৌক্তিক কথা বলে লাভ নেই,' কিশোর বলল। 'হাসিটা কেমন?'

'তীক্ষ্ণ,' সঙ্গে সঙ্গে বলল মুসা। 'বাচ্চা ছেলের চিৎকারের মত।'

'না, মেয়েমানুষের,' শুধরে দিল রবিন।
'না, মেয়েমানুষ না। খেপার।'
'বদ্ধ উন্মাদের। পিলে চমকে দেয়।'
'বাজে হাসি, খুবই বাজে।'
'কেমন যেন বিষণ্ণ। বুড়ো মানুষের হাসির মত লাগে।'
'থামো, থামো,' হাত তুলল কিশোর। 'হাসিটা একই সঙ্গে দুজনে শুনেছ?'
'নিশ্চই,' জোর গলায় বলল মুসা। 'তবে একই হাসি কিনা বলতে পারব না।'
'আমি শুনতে পারলে ভাল হত, কেমন হাসি বুঝতে পারতাম। তবে সাহায্যের জন্যে যে চেঁচিয়েছে,এ তে তো কোন দ্বিমত নেই, নাকি?'
'না,' একসঙ্গে বলল দুই সহকারী-গোয়েন্দা।
গভীর ভাবনা থেকে ডুব দিয়ে উঠল কিশোর। তোমাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে, জায়গাটা পেদ্রো'জ এস্টেট।'
আঙুল মটকাল রবিন। 'নিশ্চই। বুড়ো পেদ্রোর জমিদারি। পাঁচ হাজার একরের বেশি।'
'হ্যাঁ, বেশির ভাগই বন আর পাহাড়। ফসলের জমি তেমন নেই। শুনেছি, অনেক আগে বুড়োর নাকি গরুর পাল ছিল, গরু পুষত।'
'এখন নেই?' মুসা জিজ্ঞেস করল।
মাথা নাড়ল রবিন। 'না, লাইব্রেরিতে রেফারেন্স বইপত্র ঘেঁটেছিলাম একদিন। স্পেন থেকে এসেছিল বুড়োর দাদা, খামার করেছিল ওখানে। বুড়ো পেদ্রোর আমলেই গরু শেষ হয়ে যায়। তার একমাত্র মেয়ে মিস ভেরা পেদ্রোর জন্যে কিছু রেখে যেতে পারেননি। মিস ভেরাও বুড়ো হয়েছেন, খুব সাধারণ ভাবে থাকেন। ল্যাণ্ড-পুয়ার বলে একটা কথা আছে না, তাই। এত জায়গা, অথচ কাজে লাগাতে পারছেন না। টাকা নেই, লোকজন রাখতে পারেন না। এক চাকরানী আর একজন মালী, ব্যস। মহিলা নাকি একা থাকতে পছন্দ করেন, কেউ কখনও দেখা করতে যায় না তাঁর সঙ্গে।'
বইয়ের পোকা রবিন, তিন গোয়েন্দার সমস্ত কেসের রেকর্ড রাখার দায়িত্ব তার ওপর, ফালতু কথা বলে না। সে যা বলছে, জেনেশুনেই বলছে।
গম্ভীর হয়ে গেল কিশোর। 'হুঁ। আচ্ছা, পেদ্রোজ এস্টেটে কি করছিল দুজনে? মূর্তিটাই বা ছুঁড়ে ফেলল কে?'
'দুজন নয়, একজন,' শুধরে দিল মুসা। 'আরেকটা তো ভূত। ভূতের সঙ্গে যোগ দিয়েছে এক ডাকাত।'
'কি ডাকাতি করতে যাবে ওখানে?' মনে করিয়ে দিল রবিন, 'মিস ভেরা পেদ্রোর টাকা নেই।'
পুতুলটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছে কিশোর। আশা করছে যেন, এখুনি কথা বলে উঠবে, প্রশ্নের জবাব দেবে। হঠাৎ স্থির হয়ে গেল তার হাত।
'কি হলো?' জিজ্ঞেস করল রবিন।
পুতুলের নিচের দিকে এক জায়গায় নখ দিয়ে খুঁটছে কিশোর। ছোট্ট একটা

দরজা খুলে মেঝেতে পড়ল কি যেন।
'গোপন খুপরি!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা।
কাত হয়ে কুড়িয়ে নিল কিশোর, এক টুকরো কাগজ। ভাঁজ খুলে টেবিলে বিছিয়ে হাত দিয়ে ডলে সমান করল। দেখার জন্যে ঝুঁকে এল অন্য দুজন।
'মেসেজ?' বলল রবিন।
'বুঝতে পারছি না,' মাথা নাড়ল গোয়েন্দা-প্রধান। 'লেখাই মনে হচ্ছে। কি ভাষা কে জানে।'
ভুরু কুঁচকে চেয়ে আছে মুসা আর রবিন, ওরাও কিছু বুঝতে পারছে না।
'এ-ভাষা আর কখনও দেখিনি,' বলল কিশোর।
নীরবে খানিকক্ষণ কাগজটার দিকে চেয়ে রইল ওরা।
'শোশ্-শোনো,' তোতলাতে শুরু করল রবিন। 'লে-লেখার···মানে, কালি দিয়ে লেখা হয়নি···রক্ত।'
আলোর কাছে সরিয়ে নিয়ে আরও ভালমত লেখাটা দেখল কিশোর।
অস্বস্তিতে মাথা চুলকাচ্ছে মুসা।
'ঠিকই বলছে, রবিন,' একমত হলো কিশোর। 'রক্তেই লেখা। হাতের কাছে কালি-টালি কিছু ছিল না লেখকের।'
'হয়তো কোন বন্দি,' রবিন অনুমান করল।
'কিংবা দল-ছুট কেউ,' মুসা বলল। 'ডাকাতের দল থেকে বেরিয়ে···'
'অনেক কিছুই হতে পারে,' বাধা দিয়ে বলল কিশোর। 'তবে বোঝা যাচ্ছে, তিন গোয়েন্দার উপযুক্ত রহস্য, আরেকটা কেস। এখন প্রথম কাজ, মেসেজের পাঠোদ্ধার করা।'
'কে করবে?'
'একজনের কথাই মনে আসছে যিনি সাহায্য করতে পারবেন।'
'মিস্টার ক্রিস্টোফার?'
'হ্যাঁ। রাত অনেক হয়েছে, আজ বিরক্ত করা ঠিক হবে না। কাল সকালে ফোন করব।'

তিন

পরদিন সকালে নাস্তা সেরেই স্যালভিজ ইয়ার্ডে ছুটে এল মুসা আর রবিন। রেন্ট-আ-রাইড অটো কোম্পানিতে ফোন করেছিল কিশোর, রাজকীয় রোলস-রয়েস নিয়ে হাজির হয়েছে হ্যানসন। পুরানো মডেলের কুচকুচে কালো বিশাল গাড়িটার জায়গায় জায়গায় সোনালি অলঙ্করণ, খুব সুন্দর।
'আগে হলিউড যাব, হ্যানসন,' বলল কিশোর, 'মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারের অফিসে।'
'ভেরি গুড, মাস্টার পাশা,' বিনীত কণ্ঠে বলল খাঁটি ইংরেজ শোফার।
অফিসেই রয়েছেন বিখ্যাত চিত্রপরিচালক। বিশাল টেবিলের ওপাশ থেকে

স্বাগত জানালেন তিন গোয়েন্দাকে, 'এসো, ইয়াং ফ্রেণ্ডস। এবার কি সে?'
খুলে বলল ছেলেরা।
মন দিয়ে শুনলেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। পুতুলটা নিয়ে ভালমত দেখে নামিয়ে রাখলেন টেবিলে। 'পুরানো, অনেক পুরানো। অ্যামিউলেট। ইনডিয়ান কারিগরের কাজ, সন্দেহ নেই। ইনডিয়ান শিল্পের ওপর একটা ডকুমেন্টারি ফিল্ম করেছিলাম টেলিভিশনের জন্যে, অনেক কিছু জেনেছি তখন। অ্যামিউলেটটা দেখেই বোঝা যায়, চাম্যাশ ইনডিয়ানদের কাজ।'
'অ্যামিউলেট কি, স্যার?' জিজ্ঞেস করল মুসা।
'মন্ত্রপুত পুতুল। গলায় ফাঁস লাগানো থাকে, এতে নাকি শয়তান কাছে ঘেঁষতে পারে না, মূর্তির মালিকের অশুভ কিছু ঘটে না। স্রেফ কুসংস্কার। চাম্যাশদের অনেকের কাছেই এ-ধরনের পুতুল আছে।'
'রকি বীচেও ইনডিয়ান ছিল?'
'ছিল,' জবাব দিল রবিন। 'আগে রকি বীচে চাম্যাশ ইনডিয়ানরা ছিল উপকূলের ধারে, স্প্যানিশ জমিদারদের গোলামী করেছে অনেকে।'
'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ,' মাথা দোলালেন পরিচালক। 'এখন পক্ষীমানবের কথা বলো। লম্বা, কুঁজো, পাখির মত খুদে মাথা, ঝটকা দিয়ে দিয়ে নড়ছিল, অট্টহাসি হেসে উঠেছিল, না?'
'হ্যাঁ, স্যার।'
'তুমি আর মুসা ছায়াটার খুব কাছে ছিলে, একই সময়ে হাসি শুনেছ, অথচ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বর্ণনা করছ। তোমার কি মনে হয়, কিশোর?'
'বুঝতে পারছি না, স্যার।'
'আমিও না,' স্বীকার করলেন পরিচালক। 'দেখি, মেসেজটা?'
কাগজের টুকরোটা বের করে দিল কিশোর।
'রক্তেই লেখা,' ভাল করে দেখে বললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। 'আরেকটা ব্যাপার লক্ষ করেছ? খুব বেশি পুরানো নয় কাগজটা, বেশি দিন আগে রাখা হয়নি।'
'পড়তে পারছেন, স্যার?' জিজ্ঞেস করল রবিন।
'না। এরকম লেখা আর দেখিনি।'
'খাইছে! তাহলে?' হতাশ কণ্ঠে বলল মুসা। 'কিশোর বলছিল, আপনি পড়তে পারবেনই।'
'এখন তাহলে কি করব, স্যার?' রবিনও হতাশা ঢাকতে পারল না।
'আমি পারিনি বলে যে অন্য কেউ পারবে না, তা-তো বলিনি,' মিটিমিটি হাসছেন পরিচালক। 'আমার এক বন্ধু আছে। ইউনিভারসিটি অভ সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়ার প্রফেসর, প্রাচীন ভাষার বিশেষজ্ঞ। ফিচার ফিল্মটা করার সময় অনেক সাহায্য করেছে আমাকে। রকি বীচেই থাকে। আমার সেক্রেটারির কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে যাও। কি হয়, জানিও আমাকে।'
মিস্টার ক্রিস্টোফারকে ধন্যবাদ জানিয়ে অফিস থেকে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। প্রফেসরের ঠিকানা লিখে নিল সেক্রেটারির কাছ থেকে। পাশা

স্যালভিজ ইয়ার্ড থেকে মাত্র কয়েক ব্লক দূরে থাকেন প্রফেসর নরম্যান এইচ. হেনরি।

হ্যানসনকে রকি বীচে ফিরে যেতে বলল কিশোর।

প্রফেসর হেনরির ছোট্ট সাদা বাড়িটা রাস্তা থেকে দূরে। ঘন গাছপালায় ঘেরা। সীমানার চারপাশে সাদা খাটো খুঁটির বেড়া। হ্যানসনকে গাড়ি নিয়ে চলে যেতে বলে, গেটের কাঠের পাল্লা ঠেলে ভেতরে ঢুকল কিশোর। পেছনে মুসা আর রবিন। ইঁট বিছানো পথ চলে গেছে গাড়িবারান্দায়। এগোল ওরা।

অর্ধেক পথ পেরিয়েছে, এই সময় পাশের ঘন ঝোপ থেকে বেরিয়ে পথরোধ করে দাঁড়াল এক লোক।

'এই,' বলেই থেমে গেল রবিন।

বেঁটে, চওড়া কাঁধ লোকটার, গাঢ়-বাদামী পালিশ করা পাকা চামড়ার মত গায়ের রঙ। কালো, চঞ্চল চোখের তারা। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে শক্ত ঝকঝকে দাঁত। মোটা খসখসে সূতী কাপড়ের শার্ট পরনে, একই কাপড়ের পাজামা, কোমরে কাপড়ের চওড়া বেল্ট কষে বেঁধেছে, মাথায় সাদা বড় হ্যাট। খালি পা।

হাতে বাঁকা, লম্বা ফলাওয়ালা ভয়াল এক ছুরি।

কালো চোখ জ্বলছে লোকটার। সামান্য কুঁজো হয়ে পা পা করে এগোচ্ছে, ছুরিটা সামনে বাড়ানো।

পাথর হয়ে গেছে তিন গোয়েন্দা। আরেক পা এগিয়ে ভীষণ ভঙ্গিতে ছুরি নাড়ল লোকটা। বিচিত্র ভাষায় কি যেন বলে লাফিয়ে এসে পড়ল কাছে। থাবা দিয়ে কিশোরের হাত থেকে সোনার পুতুলটা ছিনিয়ে নিয়েই এক দৌড়ে গিয়ে ঢুকে পড়ল ঝোপে।

ঘটনার আকস্মিকতায় থ হয়ে গেছে ছেলেরা। নড়ার, এমন কি চিৎকার করার ক্ষমতাও যেন নেই।

সবার আগে সামলে নিল মুসা। 'নিয়ে গেল তো!'

বিপদের তোয়াক্কা না করে লোকটার পিছে দৌড় দিল সে, ঝোপে গিয়ে ঢুকল হুড়মুড় করে। পেছনে ছুটল অন্য দুজন।

ঝোপঝাড় ভেঙে বাগানের এক ধারে বেরিয়ে এল ওরা। দেরি হয়ে গেছে। পুরানো রঙ-চটা একটা গাড়িতে উঠছে লোকটা। ড্রাইভিং সীটে বসে আছে আরেকজন। ছেলেরা বেড়া ডিঙানোর আগেই গর্জে উঠল পুরানো এঞ্জিন, চলতে শুরু করল গাড়ি।

'যাহ্, গেল অ্যামউলেট!' চেঁচিয়ে বলল মুসা।

এই সময় পেছনে কড়া গলায় ধমকে উঠল কেউ।

চার

'এই, কি হচ্ছে এখানে?' হালকা-পাতলা একজন মানুষ, কাঁধ সামান্য কুঁজো। ধূসর

চুল। পুরু কাচের চশমা। ছেলেদের দিকে চেয়ে আছেন।

'আমাদের অ্যামিউলেট নিয়ে গেল!' নালিশ করল যেন মুসা।

'ছুরি দেখিয়ে,' রবিন যোগ করল।

'তোমাদের অ্যামিউলেট?' চোখে বিস্ময় ফুটল মানুষটির। 'অ তোমাদেরকেই পাঠিয়েছে ক্রিস্টোফার। তিন গোয়েন্দা, না?'

'আপনিই প্রফেসর হেনরি?' পাল্টা প্রশ্ন করল কিশোর।

'একটা প্রোব্লেম নিয়ে এসেছ?' প্রশ্নের জবাব প্রশ্ন দিয়েই সারলেন প্রফেসর 'একটা অপরিচিত ভাষা বুঝতে পারছ না।'

'প্রোব্লেম নিয়ে এসেছিলাম,' বিষণ্ন কণ্ঠে রবিন বলল, 'এখন আর নেই। লোকট নিয়ে গেছে।'

'আছে,' শুধরে দিল কিশোর। 'অ্যামিউলেট নিয়ে গেছে, কিন্তু কাগজটা আছে।'

পকেট থেকে কাগজটা বের করে হাসিমুখে প্রফেসরের হাতে তুলে দিল গোয়েন্দাপ্রধান।

'আশ্চর্য!' লেখাটা একনজর দেখেই চেঁচিয়ে উঠলেন প্রফেসর, পুরু লেন্সের ওপাশে চকচক করছে চোখ। 'এসো এসো, স্টাডিতে গিয়ে বসি।'

লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটতে শুরু করলেন প্রফেসর। চোখ কাগজের দিকে। কয়েক কদম গিয়েই প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়লেন একটা গাছের ওপর।

স্টাডিতে ঢুকে হাত নেড়ে ছেলেদের চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে নিজে বসলেন ডেস্কের ওপাশে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কোন সন্দেহ নেই। আশ্চর্য!' আপনমনে বিড়বিড় করছেন প্রফেসর। ছেলেদের উপস্থিতি ভুলেই গেছেন যেন। 'রক্তে লেখা! খুব বেশি দিনের নয়! ফ্যানটাসটিক!'

কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিল কিশোর। 'পড়তে পারছেন, স্যার?'

'অ্যাঁ!' চোখ তুলে তাকালেন প্রফেসর। 'হ্যাঁ হ্যাঁ, পারছি। ইয়াকুয়ালি। কোন সন্দেহ নেই। ইয়াকুয়ালি ভাষা। জানোই তো, ইনডিয়ানদের মাত্র কয়েকটা গোত্রের লিখিত ভাষা আছে। স্প্যানিশ অক্ষরের রূপান্তর। মিশনারিদের কাছ থেকে স্প্যানিশ শিখে নিজেরা নতুন একটা ভাষা তৈরি করে নিয়েছিল ইয়াকুয়ালিরা।'

'চাম্যাশদের মত?' প্রশ্ন করল মুসা।

'গর্দভ নাকি ছেলেটা?' রেগে উঠলেন প্রফেসর। 'চাম্যাশরা তো আদিম জাত, বুনো। তাদের সঙ্গে ইয়াকুয়ালিদের তুলনা? বলি, ইংরেজি ভাষার সঙ্গে চায়নিজের তুলনা?'

'ওরা আমেরিকান ইনডিয়ান তো?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'নিশ্চয় আমেরিকান, এটা আবার জিজ্ঞেস করতে হয় নাকি?' কাগজের লেখার দিকে তাকালেন আবার প্রফেসর। 'এখানে, এই রকি বীচে, ইয়াকুয়ালিদের হাতের লেখা মেসেজ? নাহ্, বিশ্বাসই হচ্ছে না! পর্বতের ওপর থেকে পারতপক্ষে নিচেই নামে না ইয়াকুয়ালিরা, শহরে আসা তো দূরের কথা। সভ্যতাকে ঘৃণা করে ওরা।'

'ইয়ে, স্যার, কোন্ পর্বত?' জিজ্ঞেস করতে কিশোরও ভয় পাচ্ছে। 'কোথায় বাস করে ইয়াকুয়ালিরা?'

'কোথায় মানে? মেকসিকো। কোন্ ক্লাসে পড়ো?' কিশোরের দিকে তাকালেন প্রফেসর। এই যেন প্রথম খেয়াল করলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নয়, ওরা কিশোর, মাত্র স্কুলে পড়ে, ইনডিয়ানদের ইতিহাস জানার কথা নয় ওদের। লজ্জিত হেসে বললেন, 'ফরগিভ মি, বয়েজ। ইয়াকুয়ালিরা কোথায় থাকে, তোমরা জানবে কি করে? গোপনে থাকতে পছন্দ করে ওরা, আধুনিক সভ্যতাকে এড়িয়ে চলে।'

'কিন্তু স্যার,' দ্বিধা করছে কিশোর, বলে না আবার বকা শুনতে হয়। 'মেকসিকো তো এখান থেকে খুব দূরে না। এক-আধজন ইয়াকুয়ালি যদি কোন ভাবে রকি বীচে এসেই পড়ে, অবাক হওয়ার কি আছে?'

'অসম্ভব!' তিন গোয়েন্দাকে চমকে দিয়ে গর্জে উঠলেন প্রফেসর। এত জোরে চেঁচানো উচিত হয়নি বুঝেই যেন কণ্ঠস্বর নরম করলেন। 'কারণ, ইয়াং মেন, ওরা তাদের এলাকা ছাড়তে নারাজ। মেকসিকোর মাদ্রে পর্বতের দুর্গম অঞ্চলে বাস। লোকালয় থেকে অনেক দূরে, সাংঘাতিক শুকনো এক জায়গা। ডেভিলস গার্ডেন বলে অনেকে, শয়তানের বাগান। পর্বতের অনেক ওপরে, চূড়ার কাছাকাছি থাকে ইয়াকুয়ালিরা, টিকটিকির মত বেয়ে উঠে যায় খাড়া পাহাড়ে, পাহাড়ী ছাগলও ওদের কাছে কিছু না। তাই তো ওদের বলে ডেভিলস অভ দা ক্লিফস।'

'ডেভিলস?' কেঁপে উঠল মুসার গলা। 'এতই ভয়ানক?'

'হ্যাঁ, ভয়ানক বটে। আক্রান্ত হলে শয়তানের চেয়েও বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। কিন্তু, সাধারণত ওরা খুব শান্তিপ্রিয় জাত। নিজেদের নিয়ে থাকতে ভালবাসে। আরেকটা কাজ ভালবাসে, পাহাড়ে চড়া। সময় অসময় নেই, ইচ্ছে, হলেই উঠে যায় উঁচু পর্বতের চূড়ায়।'

'এত উঁচু থেকে নিচে নামল কি করে তাহলে মেসেজটা?' জিজ্ঞেস করে বসল রবিন।

জোরে জোরে চিবুক ডললেন প্রফেসর। 'তাই তো, কি করে নামল? কয়েক বছর ধরে অবশ্য মেকসিকান গভারনমেন্ট ওদের পোষ মানানোর চেষ্টা করছে। যত যাই হোক, ইয়াকুয়ালিরাও মানুষ, সভ্যতার লোভ পেয়ে বসতে কতক্ষণ?'

'তারমানে, ধরে নেয়া যায় অন্তত একজন ইয়াকুয়ালি রকি বীচে এসেছে?' বলল কিশোর। 'কাজ করতে?'

'কি জানি,' নিজেকেই প্রশ্ন করলেন যেন প্রফেসর, জোর নেই গলায়। 'নিজের এলাকা ছেড়ে কোথাও গিয়েছে ইয়াকুয়ালি, বিশ্বাস করতে পারছি না। তাছাড়া এখানে কি করতে আসবে? মেসেজটা রকি বীচে পেয়েছ, শিওর?'

'হ্যাঁ, স্যার। একটা অ্যামিউলেটের ভেতরে।'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলালেন প্রফেসর। 'ইয়াকুয়ালিরা অ্যামিউলেট পছন্দ করে।'

'কিন্তু মিস্টার ক্রিস্টোফার তো বললেন, অ্যামিউলেটটা চাম্যাশদের তৈরি,' প্রশ্ন তুলল রবিন। 'এরকম একটা পুতুল নাকি ফিল্ম তৈরির সময় ব্যবহার করেছেন।'

'চাম্যাশ? আরও অবাক করলে। মিলছে না,' মাথা নাড়লেন প্রফেসর।

'চাম্যাশদের সঙ্গে ইয়াকুয়ালিদের কোন সম্পর্ক নেই। চাম্যাশ পুতুল ইয়াকুয়ালিদের হাতে যায় কি করে? ওই পুতুলটাই তোমাদের কাছ থেকে ছিনতাই হয়েছে?'

'হ্যাঁ, স্যার,' বলল মুসা।

'খাঁটি সোনার তৈরি,' জানাল রবিন।

'বলো কি?' ভুরু কুঁচকে ছেলেদের দিকে তাকালেন প্রফেসর। 'স্বর্ণ? চাম্যাশ অ্যামিউলেট? অসম্ভব!'

'সত্যি বলছি, স্যার,' জোর দিয়ে বলল কিশোর। 'আমি স্বর্ণ চিনি।'

'মিস্টার ক্রিস্টোফারও তো তাই বললেন,' রবিন বলল।

তাজ্জব হয়েছেন প্রফেসর। হাঁ হয়ে যাচ্ছে মুখ, ঝুলে পড়ছে নিচের চোয়াল। শাট করে বন্ধ করলেন হঠাৎ। হাত বোলালেন চোয়ালে। কাছাকাছি হয়ে আসছে চোখের পাতা, চিন্তিত। আস্তে করে সামনে ঝুঁকলেন। 'তাই যদি হয় মাই ইয়াং ফ্রেণ্ডস,' সাবধানে শব্দ বাছাই করলেন প্রফেসর, বক্তব্যের গুরুত্ব বোঝানোর জন্যে, 'তাহলে কাজের কাজই করেছ। দুশো বছরের পুরানো জটিল এক রহস্যের সূত্র এসে পড়েছে তোমাদের হাতে।'

বড় বড় হয়ে গেল কিশোরের চোখ। 'দুশো বছরের পুরানো রহস্য?'

'ইয়েস, মাই বয়েজ, চাম্যাশ হোর্ডের রহস্য।'

পাঁচ

'শোনো,' বললেন প্রফেসর, 'চাম্যাশরা স্বর্ণ ব্যবহার করে না। এদিকে সোনার খনি কখনই ছিল না। পুতুলটা সোনার হলে, নিশ্চয় চাম্যাশ হোর্ড থেকে এসেছে।'

'চ্যামাশ হোর্ড কি জিনিস, স্যার?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'সতেরোশো নব্বই সাল থেকে আঠারোশো বিশের মধ্যে,' বলে চললেন প্রফেসর, 'ভয়ানক একদল খুনে চাম্যাশ আড্ডা গেড়েছিল এদিকের পর্বতের মধ্যে। ইয়াকুয়ালিদের মত না হলেও পাহাড়ে চড়ায় ওরাও ওস্তাদ ছিল। পাহাড়ের মধ্যে লুকিয়ে পড়লে খুঁজে বের করা খুব মুশকিল হত। দলটাকে কিছুতেই সামলাতে পারছিল না স্প্যানিশরা। শেষে অন্য ফন্দি করল, সোনার লোভ দেখাল, এটা-ওটা নানারকম সোনার জিনিস উপহার দিল। খারাপ করল আরও। সোনার কদর বুঝে গেল ওই চাম্যাশরা, এতদিন শুধু বশ্যতা স্বীকার করেনি, এবার লুটপাট শুরু করে দিল। স্প্যানিশ জমিদারদের খুন করে লুট করতে লাগল তাদের সম্পদ।

'আর কোন উপায় না দেখে সেনাবাহিনীর কাছে ধর্না দিল জমিদারেরা। শেষ করে দেয়া হলো দলটাকে। ধরা পড়ল দলের নেতা ম্যাগনাস ভারদি। অনেক অত্যাচারেও মুখ খুলল না। কিছুতেই বলল না, কোথায় লুকিয়ে রেখেছে ধনরত্নের স্তূপ। মৃত্যুর আগে বলে গেল, এমন এক জায়গায় রেখেছে ওগুলো, যা কেউ কোনদিন খুঁজে পাবে না। সত্যি, খুঁজে পেল না। কত লোক যে কতভাবে খুঁজেছে, কিন্তু পায়নি। বাতাসে হারিয়ে গেল যেন চাম্যাশ হোর্ড। আমার বিশ্বাস ছিল, পানিতে ফেলে দিয়েছে, সাগরে, যাতে কেউ কোন দিন না পায়।'

অনেক দূরে চলে গেছে যেন কিশোরের নজর। 'এত কষ্টে জোগাড় করেছে, পানিতে ফেলে দেয়ার জন্যে? নিশ্চয় সেটা পারেনি ম্যাগনাস, মন সায় দেয়নি।'

'হয়তো,' বললেন প্রফেসর। 'আর পুতুলটা হোর্ডের হয়ে থাকলে, আশা করা যায়, গুপ্তধনগুলো ধারে-কাছেই কোথাও রয়েছে। দারুণ এক আবিষ্কার হবে সেটা।'

'মেসেজে নিশ্চয় হোর্ডের কথা বলা আছে,' সামনে ঝুঁকল কিশোর।

'মেসেজ?' চোখ মিটমিট করলেন প্রফেসর। কাগজটার দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠলেন। 'হায় হায়, ভুলেই গিয়েছিলাম।'

মেসেজটা পড়তে পড়তে কুঁচকে গেল প্রফেসরের ভুরু।

'আদিম এসব ভাষা অনুবাদ করা কঠিন। আদিম বলছি, তার কারণ, ভাষাটা নতুন হলেও যাদের ভাষা তারা আদিম লোক, প্রাগৈতিহাসিক চিন্তাভাবনা রয়ে গেছে, মনটা কাজ করে সেভাবেই। বলার ভঙ্গিও আদিম। যাই হোক, এটা বলছে ঃ *ওয়ারড্স স্মোক। সিঙ্ ডেথ সঙ। ব্রাদারস্ হেল্প।* ব্যস, এই।'

'সাহায্যের আবেদন?' বলল কিশোর।

'মনে হয়,' অবাক হয়ে মেসেজটার দিকে চেয়ে আছেন প্রফেসর। 'কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারছি না, চাম্যাশ অ্যামিউলেটের ভেতরে ইয়াকুয়ালি মেসেজ কেন? গভীর রহস্য।'

'সমাধান করে ফেলব, স্যার,' দৃঢ় আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলল কিশোর।

'হ্যাঁ, করে ফেলো,' হাসলেন প্রফেসর। 'জানিও আমাকে, প্লীজ। চাম্যাশ হোর্ড দেখার ইচ্ছে আমার অনেক দিনের।'

গেটের কাছে ছেলেদেরকে এগিয়ে দিয়ে গেলেন তিনি। রোদে উজ্জ্বল সকাল। বার বার তাকালেন এদিক ওদিক, ভয়, যে কোন সময় ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে পারে বাদামী চামড়ার লোকটা।

বাইরে বেরিয়েই কিশোরের দু'দিক থেকে চেপে এল রবিন আর মুসা।

'কিশোর?' প্রায় চেঁচিয়ে বলল রবিন। 'কি মনে হয় তোমার? চাম্যাশ হোর্ড পেয়ে গেছে কেউ?'

'তার কাছ থেকে কেউ ছিনিয়ে নেয়ার তালে আছে?' মুসার প্রশ্ন।

'হয়তো অ্যামিউলেটটাই সূত্র,' আবার বলল রবিন।

'কিন্তু ছিনিয়ে নিল যে, কে লোকটা?' মুসা বলল। 'ইনডিয়ান ডাকাতদের আরেকটা দল?'

'বাদামী লোকটাকে কিন্তু ইনডিয়ানের মত লাগল।'

'পেদ্রোর বাড়িতে সেদিন যে ছায়াটা দেখলাম, নিশ্চয় কোন ইনডিয়ানের প্রেতাত্মা।'

গভীর চিন্তায় মগ্ন কিশোর, ঘনঘন চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে, বিরক্ত হয়ে ঘুরে তাকাল। 'পাগল হয়ে গেছ নাকি? এভাবে অনুমানে কিছু হবে না। কাজ করতে হবে, কাজ। পেদ্রোজ এস্টেটে গিয়ে খোঁজখবর নিতে হবে।'

'গোপনে?' জিজ্ঞেস করল মুসা। 'মানে লুকিয়ে ঢুকব?'

'না, লুকিয়ে ঢুকব। হয়তো কিছু জানাতে পারবেন মহিলা। কিন্তু তাঁর সঙ্গে দেখা করি কিভাবে?'

নানারকম প্রস্তাব দিল রবিন আর মুসা। কোনটাই পছন্দ হলো না গোয়েন্দাপ্রধানের। শেষে ঠিক হলো, রবিনের বাবার সাহায্য নেবে। তিনি সাংবাদিক। ক্যালিফোর্নিয়ার পুরানো ইতিহাস জোগাড় করে পত্রিকায় ধারাবাহিক একটা ফিচার করছেন কিছু দিন ধরে। প্রেদ্রোজ এস্টেটে তাঁর পক্ষে সহজে ঢোকা সম্ভব। মহিলার সাক্ষাৎকার নেবেন। তাঁর সঙ্গে ঢুকবে তিন গোয়েন্দা, ফাঁকে ফাঁকে দু-চারটা প্রশ্ন ওরাও হয়তো করতে পারবে।

বাবাকে রাজি করানোর দায়িত্ব নিল রবিন।

হাঁটতে হাঁটতে ইয়ার্ডের কাছে চলে এসেছে ওরা। গেটের দিকে চোখ পড়তেই চেঁচিয়ে উঠল মুসা, 'আরে, দেখো কে? শুঁটকি!'

ঢেঙা, হালকা-পাতলা একটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে গেটের পাশে, পেছন ফিরে রয়েছে। হ্যাঁ, টেরিয়ার ডয়েলই, তিন গোয়েন্দার পুরানো শত্রু শুঁটকি টেরি। বড়লোকের বখে যাওয়া ছেলে, রকি বীচে বাড়ি আছে, মাঝে মাঝে ছুটি কাটাতে আসে, জান জ্বালিয়ে ছাড়ে তিন গোয়েন্দার। মুসার দীর্ঘ দিনের ইচ্ছে, সময়-সুযোগমত পেলে ওর চোখা বাঁকা নাকটা এক ঘুসিতে ভোঁতা করে দেবে। কিন্তু রকি বীচে একা নয় টেরিয়ার, অনেক বন্ধু আছে, সবগুলো শয়তান, টেরিয়ারের নীল গাড়িতে চড়া আর হোটেল-রেস্তোরাঁয় ভালমন্দ খাবার লোভে তার দলে যোগ দিয়েছে। তিন গোয়েন্দার যদিও তেমন কোন ক্ষতি আজতক করতে পারেনি ওরা, তবে যথেষ্ট ভুগিয়েছে।

'এখানে কি করছে ব্যাটা?' রবিনের জানার খুব ইচ্ছে।

নিচু গলায় তাগাদা দিল কিশোর। 'জলদি, লাল কুকুর চার।'

ঘুরে, পাশ দিয়ে স্যালভিজ ইয়ার্ডের পেছনে চলে এল ওরা, টেরিয়ারের অলক্ষে। বেড়ার গায়ে ওখানে একটা অগ্নিকাণ্ডের দৃশ্য আঁকা, ১৯০৬ সালে স্যান ফ্র্যানসিসকোয় আগুন লেগেছিল, তারই একটা দৃশ্য। জ্বলন্ত শিখার কাছ থেকে দূরে বসে আগুনের দিকে চেয়ে আছে একটা লাল কুকুর। কাঠের একটা গিঁট রয়েছে একটা চোখের জায়গায়, অবিকল চোখের মতই দেখা যায়। নখ দিয়ে খুঁচিয়ে ওটা বের করে আনল কিশোর, ভেতরে আঙুল ঢুকিয়ে গোপন সুইচে চাপ দিতেই তিন দিকে সরে গেল তিনটে হার্ডবোর্ডের পাল্লা। ভেতরে ঢুকে গেল ছেলেরা, সুইচ টিপে আবার পাল্লা বন্ধ করে দিল কিশোর।

জঞ্জালের তলা দিয়ে চলে গেছে পথ, বুকে হেঁটে ট্রেলারের তলায় এসে পৌছল ওরা। ঢাকনা তুলে ঢুকল হেডকোয়ার্টারে।

চেয়ারে বসতে না বসতেই স্পীকারে ভেসে এল জোরাল মহিলা-কণ্ঠ, 'কিশোর? এই কিশোর?'

'খাইছে!' আঁতকে উঠল মুসা। 'মেরিচাচী। নিশ্চয় জঞ্জালের বোঝা নিয়ে এনেছেন রাশেদ চাচা। মারা পড়ব এখন।'

জবাব দিল না কিশোর।

'কিশোর?' আবার ডাক শোনা গেল। 'গেল কই ছেলেগুলো? আরে এই কিশোর, শুনছিস? একটা ছেলে দেখা করতে এসেছে তোর সঙ্গে, টনি পেদ্রো। কিশোর?'

একে অন্যের দিকে তাকাল ছেলেরা। জনৈক *পেদ্রো* এসেছে তাদের সঙ্গে দেখা করতে, যখন ওরা পথ খুঁজে পাচ্ছে না কি করে ঢুকবে পেদ্রো এস্টেটে? একেই বলে মেঘ না চাইতেই জল। কিন্তু কে এই টনি পেদ্রো?

'মিস ভেরা তো শুনলাম একা থাকেন?' রবিন বলল।

'চলো, দেখি,' দুই সুড়ঙ্গের মুখের দিকে রওনা হলো কিশোর। 'জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে।'

ছয়

'এই যে, বেরিয়েছে,' ছেলেদের দেখেই বলে উঠলেন মেরিচাচী। 'এই, ছিলি কোথায়? এত ডাকাডাকি করছি। একেক সময় ভাবি, ইয়ার্ডটা বানানোই হয়েছে বুঝি তোদের লুকোচুরি খেলার জন্যে। নে, কথা বল।' ছেলেটাকে দেখিয়ে দিয়ে চলে গেলেন তিনি, অফিসে অনেক কাজ।

লম্বা একটা ছেলে, তিন গোয়েন্দার চেয়ে বয়েসে বড়, লম্বা কালো চুল। ধূসর স্যুট পরনে, বিদেশী ছাঁট, আমেরিকান নয়। হেসে হাত বাড়িয়ে দিল সে, 'আমি টনি পেদ্রো।'

বিস্মিত হয়েছে, সে ভাবটা গোপন করে কিশোরও হাত বাড়াল। 'আমি কিশোর পাশা। ও রবিন মিলফোর্ড, আর ও মুসা আমান।'

'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম,' হাসল টনি। 'তোমাদের এক বন্ধু জানাল, তোমরা নাকি অদ্ভুত ক্যারেকটার।'

'টেরিয়ার ডয়েল।'

অদ্ভুত ক্যারেকটার নয়, বলতে চেয়েছে আসলে আজব চিড়িয়া, বুঝল তিন গোয়েন্দা।

'শুঁটকি পাঠিয়েছে তোমাকে?' গুঙিয়ে উঠল রবিন।

'বলল, তোমাদের মাথায় নাকি ছিট আছে,' জবাবটা এড়িয়ে গিয়ে বলল টনি 'আছে নাকি? শুনেছি, সব আমেরিকান ছেলের মাথায়ই ছিট কমবেশি থাকে।'

'ওই শুঁটকি ব্যাটাই খাঁটি আমেরিকান,' জোরে হাত নাড়ল মুসা। 'আমরা কেউ নেই। কিশোর বাঙ্গালী, আমি আফ্রিকান, আর রবিন অর্ধেক আইরিশ। তুমি কি আমেরিকান নাকি?'

'না না,' তাড়াতাড়ি বলল টনি, 'ইংল্যাণ্ড। ক্যামব্রিজ। মিস ভেরা পেদ্রো আমার দাদী, বাবার ফুফু। ওই যে, পেদ্রোজ এস্টেটের মালিক, নাম নিশ্চয় শুনেছ। কয়েক মাস আগে বাবা মারা যাওয়ার সময় দাদীর কথা বলেছে আমাকে। আগে তো জানতামই না। আমার দাদা, ভেরা-দাদীর ভাই নাকি ফ্রান্সে খুন হয়েছিল, আমার বাবা তখন মায়ের পেটে। কঠিন অসুখে মারা গেছে বাবা। যখন বুঝল

বাঁচবে না, দাদীর কাছে চিঠি লিখল। দাদীই আমাকে তার কাছে নিয়ে এসেছে।'

সারাক্ষণ হাসি লেগে আছে টনির মুখে, কথা বলার সময়ও। দ্রুত অনেক বেশি কথা বলে, ফলে কথার টান ঠিক বোঝা যায় না। কেউ কিছু বলার আগেই আবার লাগাম ছেড়ে দিল, 'হ্যাঁ, যে কথা বলতে এসেছি। পুরানো জঞ্জালে বোঝাই হয়ে আছে ভেরাদাদীর ভাঁড়ার। ওগুলো এবার পরিষ্কার করে ফেলতে চায়। ফেলেই দিতে চেয়েছিল। আমি বুদ্ধি দিলাম, ফেলে কি লাভ? পুরানো বাতিল মাল কেনার পাগলও আছে, তাদের কাছে বেচে দাও। কথাটা খুব মনে ধরল দাদীর, আমাকে খোঁজ নিতে বলল। কাউকে তো চিনি না এদিকে। দাদীর উকিলের কাছে তোমাদের কথা শুনলাম। রকি বীচেই থাকে উকিল সাহেব, তারই বন্ধুর ছেলে টেরিয়ার ডয়েল। তাকে জিজ্ঞেস করলাম স্যালভিজ ইয়ার্ডটা কোথায়, দেখিয়ে দিতে পারবে কিনা। দেখিয়ে দিল বটে, কিন্তু ভেতরে আনতে পারলাম না কিছুতেই। বেশ অবাক হয়েছি।'

কি যেন কাজে ওয়ার্কশপের বাইরে এসেছিলেন মেরিচাচী, 'পুরানো জঞ্জালে বোঝাই' কথাটা তাঁর কানে গেছে। বেড়ার এপাশে উঁকি দিলেন। 'কিশোর, কিসের কথা বলছে রে?'

'পুরানো মাল, চাচী,' বলে আবার টনির দিকে ফিরল কিশোর। 'হ্যাঁ, টনি, কখন দেখতে যাব?'

'এখন গেলেই তো ভাল হয়।'

'এক্ষুণি?' বললেন মেরিচাচী। 'দুপুর তো হয়ে এল। ঠিক আছে, যা। খেয়ে যা। ফিরতে নিশ্চয় বিকেল হবে।'

'চাচা কই?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'কি জানি, রোভারকে নিয়ে কোথায় গেল। বোধহয় মালটাল আনতে।'

'যাব কিসে? ছোট ট্রাকটা আছে?'

'আছে।'

তাড়াতাড়ি খেয়ে নিল তিন গোয়েন্দা। অফিসে বসে রইল টনি।

ট্রাক বের করল বোরিস। চড়ল তিন কিশোর। টনি যাবে তার নিজের গাড়িতে।

গেটের বাইরে বেরিয়ে টেরিয়ারকে খুঁজল টনি, ধন্যবাদ দেয়ার জন্যে, কিন্তু কোথাও দেখা গেল না তাকে। নীল গাড়িটাও নেই। অবাকই হলো টনি।

মুচকি হাসল তিন গোয়েন্দা।

'শুটকির ব্যাপারটা কি বলো তো?' মুসা বলল।

'কি আর?' জবাব দিল কিশোর। 'বরাবর যা করে, নাক গলাবে আমাদের কাজে। ওর কথা ভাবছি না, আমি ভাবছি টনির কথা। বেশি কাকতালীয় হয়ে গেল না? তোমরাও পুতুল পেলে, তার পরদিনই এসে হাজির হলো পেদ্রোদের নাতি, আমাদেরকে এস্টেটে নিয়ে যেতে চায়।'

'তাই তো? পুতুলটা আমাদের কাছে আছে ভাবছে না তো?' রবিনের জিজ্ঞাসা।

'ইয়াল্লা!' বলল মুসা। 'এক পুতুল কয় দলে খুঁজছে?'

'ছিনতাই যে হয়েছে, টনি জানে এটা?' বলল রবিন।

'হয়তো জানে,' কিশোর বলল। 'তাহলে এটাও জানে মেসেজটা আমাদের কাছে আছে। সেটাই হাতাতে চায় এখন।'

'তাই কি? দেখে কিন্তু খারাপ মনে হয় না।'

'খামোকাই হয়তো সন্দেহ করছি। তবে সতর্ক থাকতে হবে আমাদের।'

একমত হলো রবিন আর মুসা।

রকি বীচ থেকে বেরিয়ে এসেছে ঝরঝরে ট্রাক, টনির স্পোর্টস কারকে অনুসরণ করে উঠে যাচ্ছে পাহাড়ী পথ ধরে।

আঁকাবাঁকা গিরিপথ শেষ করে এসে এস্টেটের পুরানো লোহার দরজার সামনে থামল দুটো গাড়ি।

পাল্লা খুলল টনি।

ভেতরে ঢুকল গাড়ি দুটো। খোয়া বিছানো আধ মাইল পথ পেরিয়ে এসে থামল বিরাট এক বাড়ির সামনে। স্প্যানিশ ধাঁচের বাড়ি, সাদা দেয়াল, লাল টালির ছাত। মস্ত বড় জানালাগুলোতে মোটা লোহার শিক, দোতলার কয়েকটা দরজার সামনে ঝোলা বারান্দা। দেয়ালের সাদা রঙ মলিন, জায়গায় জায়গায় ছ্যাতলা পড়া, চিড়ও ধরেছে কোথাও কোথাও, অযত্ন আর অবহেলার ছাপ।

পথ দেখিয়ে তিন গোয়েন্দাকে বাড়ির পেছনে আরেকটা বাড়িতে নিয়ে এল টনি, ইঁটের দেয়াল, গোলাঘর। ভেতরে পুরানো জিনিসপত্র ঠাসা। ভাঙা আসবাবপত্র, গৃহস্থালীর সরঞ্জাম, পুরানো আমলের এমন অনেক জিনিস আছে, যেগুলোর নামও জানে না তিন গোয়েন্দা। ধুলোয় মাখামাখি। দেখে মনে হয়, গত পঞ্চাশ বছরে ওগুলোতে হাত দেয়নি কেউ।

'দাদী তো সন্ন্যাসী,' বলল টনি। 'এখানে কি আছে না আছে জানেই না হয়তো।'

পুরানো মাল ভালই চেনে কিশোর, কোনটা বিক্রি হবে না হবে, তার চাচার চেয়ে ভাল বোঝে। বলল, 'আরিব্ববা, এত পুরানো। এই যে, একটা চরকা। ওটা কি? ও, জাহাজের টেবিল, লেখার ডেস্ক।'

পুরো এক ঘণ্টা জিনিসপত্র দেখল সে, তাকে সাহায্য করল রবিন আর মুসা। এতই মগ্ন, চাম্যাশ অ্যামিউলেটের কথা ভুলে গেছে, মনেই পড়ছে না কারও মাত্র আগের রাতে 'ভূত' দেখা গেছে এ-বাড়ির কাছে।

টনির দিকে ফিরল অবশেষে কিশোর, 'হুঁ, দেখলাম। ভালই।'

'ঘরে, এসে বসো তাহলে,' আমন্ত্রণ জানাল টনি। 'কিছু খাও। দাদীর সঙ্গেও কথা বলা যাবে। তার সঙ্গেই দামদর করো।'

এটাই চাইছে তিন গোয়েন্দা, মিস ভেরা পেদ্রোর সঙ্গে কথা বলতে।

'খুব ভাল হয় তাহলে,' সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল কিশোর। 'বোরিস, মালগুলোর লিস্ট করে নিন।'

'হো-কে (ওকে),' সায় জানাল বোরিস।

'ঠিক আছে, আপনি থাকুন,' টনি বলল। 'বীয়ার পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'হো-কে। ভেরি গুড।'

বিরাট বাড়ির বিশাল ড্রইংরুমে ছেলেদের নিয়ে এল টনি। ঠাণ্ডা ঘর। পুরানো আমলের আসবাবপত্র, গাঢ় রঙ। চাকরানীকে ডেকে লেমোনেড আর বিস্কুট আনার জন্যে বলল সে।

খাবারের ট্রে নিয়ে এল চাকরানী, তার পেছনে এলেন এক বৃদ্ধা। ক্ষীণ-দেহী, ধবধবে সাদা চুল। বয়েসের ভারে ঘোলাটে চোখের তারা, উজ্জ্বল হলো ছেলেদের দেখে।

'আমি ভেরা প্রেদ্রো,' পরিচয় দিলেন মহিলা। 'বুঝতে পারছি, টনির সঙ্গে তোমাদের বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। শুনলাম, স্যালভিজ ইয়ার্ড থেকে এসেছ। মাল পছন্দ হয়েছে?'

'হ্যাঁ, ম্যাডাম,' মাথা নোয়াল কিশোর।

'সব কিছু ছেড়েই দিয়েছিলাম,' বললেন মহিলা। 'টনি এসে নতুন জীবন দিয়েছে আমাকে। বাঁচার আগ্রহ জাগিয়েছে।'

টেবিলে লেমোনেড আর বিস্কুট সাজিয়ে রেখে চলে গেল কাজের মেয়েটা।

ছেলেদের হাতে হাতে খাবার তুলে দিলেন মিস ভেরা, মেহমানদের ভাল লাগছে তাঁর, বোঝা যাচ্ছে। 'গতরাতে বুঝিয়েছে আমাকে টনি। খামোকা পুরানো মাল ভাঁড়ারে ফেলে রেখে লাভ কি? নষ্ট হচ্ছে। তার চেয়ে বেচে দিলে কিছু পয়সা আসবে।'

সতর্ক হয়ে গেল তিন গোয়েন্দা।

'গত রাতে?' বলল কিশোর।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালেন মহিলা। 'আমাদের নাকের সামনে দিয়ে চুরি হয়ে গেল একটা সোনার পুতুল। দুটো পুতুলের একটা। আমার পাগলা ভাইটার জিনিস, সেই যে বাড়ি থেকে পালাল, আর ফিরল না। ওগুলোই ছিল তার স্মৃতি, তা-ও একটা গেল চুরি হয়ে।'

'সব দোষ, ভাই, আমার,' ছেলেদের শোনাল টনি, কি করে চুরি হয়েছে। 'বাবা জানত পুতুল দুটোর কথা, আমাকে বলেছে। লাইব্রেরিতে ড্রয়ারে খুঁজে পেয়েছি ওগুলো, নিচের দিকের একটা ড্রয়ারে। লাইব্রেরিতে দরজা খোলা রেখে বেরিয়েছিলাম, আবার ফিরে গিয়ে দেখি একটা পুতুল নেই।'

'কে নিয়েছে জানো না নিশ্চয়?' ঘুরিয়ে প্রশ্ন করল কিশোর।

'মিস্টার ডাংম্যান তো বলল একটা ছেলে নিয়েছে। দেখেছে নাকি।'

'হ্যাঁ, দেখেছি,' শোনা গেল ভারি কণ্ঠ।

ফিরে চাইল ছেলেরা।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা, চমৎকার স্বাস্থ্য, গায়ে উজ্জ্বল জ্যাকেট, পরনে হাফপ্যান্ট, লম্বা পায়ের শক্ত মাংসপেশী ফুলে রয়েছে। ধূসর চোখজোড়া চঞ্চল। লালচে চুল। রুক্ষ চেহারা, ঠোঁটের এক কোণে গভীর কাটা একটা দাগ, সারাক্ষণ বিকৃত হাসি ফুটিয়ে রেখেছে যেন বেচারার মুখে।

পরিচয় করিয়ে দিল টনি। জানাল, মিস্টার ডাংম্যান তার দাদীর বন্ধু।

'ডাকাতির কথা তো শুনলে,' ডাংম্যান বলল, বিস্তৃত হলো বিকৃত হাসি। কথার টান টনির টানের সঙ্গে ঠিক মেলে না। বোধহয় খাস লণ্ডন শহরের মানুষ। ছেলেদের কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই বলে গেল, 'একটা ছেলেকে দেখলাম বাড়ির কাছ থেকে ছুটে পালাচ্ছে। তাড়া করলাম। গেটের কাছে গিয়ে হারিয়ে ফেললাম তাকে, আর খুঁজে পেলাম না। ছেলেটার সঙ্গে আরও এক-আধজন ছিল হয়তো। যা-ই হোক, গেল পুতুলটা, আর পাওয়া যাবে না।'

'আমরা চেষ্টা করে দেখতে পারি,' কিশোর বলল। 'চোরাই মাল খুঁজে বের করার অভিজ্ঞতা আছে আমাদের।'

'অনেক জটিল রহস্যেরও সমাধান করেছি,' মুসা জানাল।

হেসে উঠল ডাংম্যান। 'ডিটেকটিভ মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, স্যার, ডিটেকটিভই,' বলে পকেট থেকে কার্ড বের করে দিল কিশোর।

পড়ল ডাংম্যান। আবার হাসল। 'যাক, আশা হচ্ছে। পাওয়া যেতে পারে পুতুল।' মুসার দিকে ফিরল। 'তুমি যেন কি বললে? রহস্যের সমাধান?'

'অনেক করেছি। বিশ্বাস না হলে পুলিশ চীফ ইয়ান ফ্লেচারকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন।'

'তাই?' আবার কার্ডটার দিকে তাকাল ডাংম্যান।

ঘরের কোণে চেয়ারে বসে আছে টনি, জিজ্ঞেস করল, 'আশ্চর্যবোধকগুলো কেন? তোমরা অদ্ভুত ছেলে, সেটা বোঝানোর জন্যে?'

কড়া জবাব দিতে যাচ্ছিল মুসা, সেটা বুঝে তাড়াতাড়ি বলল কিশোর, 'ওগুলো আমাদের প্রতীকচিহ্ন। তাছাড়া নানা রকম আজব রহস্য যে সমাধান করি, সেটাও বোঝায় চিহ্নগুলো।'

'দারুণ,' প্রশংসা না ব্যঙ্গ করল টনি, বোঝা গেল না। 'দাদী, ওদেরকে দাও না একটা সুযোগ?'

'কিন্তু টনি,' দ্বিধা করছেন মহিলা, 'কোন বিপদে পড়ে যদি ওরা?'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন,' সুর মেলাল ডাংম্যান। 'বিপদে পড়তে পারে।'

'সতর্ক থাকব আমরা, ম্যাডাম,' বলল কিশোর। 'তেমন বুঝলে মিস্টার ফ্লেচারকে গিয়ে ধরব সাহায্যের জন্যে। চোর কোন ছেলেছোকরা হয়ে থাকলে, আমাদের জন্যেই কাজটা উপযুক্ত হবে।'

'ঠিকই বলেছে ও দাদী,' টনি বলল। 'তাছাড়া পুলিশ চীফের সঙ্গে খাতির আছে ওদের...'

'ঠিক আছে,' নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না মিস পেদ্রো। 'তবে একটা কথা ঠিক, এত ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে গিয়ে পুলিশের কাছে পাত্তা পাব না আমরা।'

'হ্যাঁ,' সায় দিয়ে বলল ডাংম্যান, 'পুলিশের অনেক জরুরী কাজ আছে। তারচে ওরাই খুঁজুক, তেমন বুঝলে গিয়ে পুলিশের কাছে বলবে। তবে সাবধানে থাকবে, কথা দিয়ে যেতে হবে।'

'তা থাকবে,' বলে উঠল টনি। 'জানের মায়া কার না আছে? দাদী, একটা

পুরস্কার ঘোষণা করলে কেমন হয়? বিপদ যেমন, তেমন খাটুনিও আছে কাজটায়?'

নাতির দিকে চেয়ে হাসলেন মিস পেদ্রো। 'হ্যাঁ, তা মন্দ হয় না। ধরো, এই একশো ডলার?'

'কি বলো রাজি?' গোয়েন্দাদের দিকে চেয়ে বলল টনি। 'এক কাজ করো, কাল লাঞ্চের সময় এখানে চলে এসো। কি ভাবে কি করা যায়, চারজনে বসে প্ল্যান করব?'

'লাঞ্চের সময় এসে কি করবে?' তাড়াতাড়ি বলল ডাংম্যান। 'আমাদের খাবার কি পছন্দ হবে? আমি আর মিস পেদ্রো তো খাই নিরামিষ।' তিন কিশোরের দিকে ফিরল। 'তোমরা হয়তো জানো না, ভেজিট্যারিয়ান লীগের প্রেসিডেন্ট আমি। রকি বীচে লীগটা আমিই শুরু করেছি, অনেক সাহায্য করছেন মিস পেদ্রো। একটা অনুষ্ঠানে তোমরা হাজির থাকতে পারো, লেকচার শুনবে। উপকার হবে। আজ বিকেলেই একটা আছে।'

'পারলে খুব খুশি হতাম, স্যার,' বিনীত কণ্ঠে বলল কিশোর। 'কিন্তু আজ অনেক কাজ। এই তো, মালপত্রগুলো নিয়ে যেতে হবে। দেরি করলে চাচী চিন্তা করবে। ম্যাডাম, জিনিসগুলোর দাম...'

'ও যা হোক কিছু একটা ধরে দিও তোমরা,' দরাদরি করতে মহিলা নারাজ। 'জানাই তো আছে তোমাদের, কেমন মাল, কত দাম হতে পারে। আমাকে আর এসবে টেনো না।'

'ঠিক আছে, যাই তাহলে,' উঠল কিশোর। 'বোরিসকে গিয়ে সাহায্য করি।' দুই সহকারীকে বলল, 'এসো।'

'মূর্তিটার কথা ভুলো না কিন্তু,' বলল টনি।

'হ্যাঁ, আর পুরস্কারের কথাটাও,' হাসল ডাংম্যান।

বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা।

গোলাঘরে মাল গোছাচ্ছে বোরিস।

ভেতরে ঢুকে দ্রুত চারপাশে একবার চেয়ে নিল কিশোর, বোরিস ছাড়া আর কেউ নেই। নিচু গলায় দুই বন্ধুকে বলল সে, 'ব্যাপারটা খেয়াল করেছ?'

'কী?' অবাক হয়ে বলল মুসা।

'আশ্চর্যবোধকের কথা জিজ্ঞেস করল টনি।'

'এতে অবাক হওয়ার কি আছে? অনেকেই তো করে।'

'অনেকের করা আর টনির করাটা আলাদা। আমাদের কার্ড দিইনি তাকে।'

'তাই তো!' চোখ মিটমিট করল রবিন। 'কার্ডটা তো ছিল ডাংম্যানের হাতে।'

'তারমানে আগে থেকেই আমাদের কথা সব জানে টনি?' ভুরু কুঁচকে গেছে মুসার।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'জানে। তারমানে, বেশ কিছু মিথ্যে বলেছে আমাদের কাছে। পুরানো মাল বিক্রি তার একটা বাহানা। সেজন্যে আমাদের খোঁজ করবে কেন? সোজা গিয়ে মেরিচাচীর কাছে বললেই চলত।'

চুপ করে আছে অন্য দুজন।

হঠাৎ হাসি ফুটল কিশোরের মুখে।

'হাসছ যে?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'লোকে যে কত রকমের নাম রাখে। ডাংম্যান! হাহ্-হা! জানো, বাংলা করলে কি দাঁড়ায়?'

'কি?'

'গোবরমানব,' অর্থটা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিল কিশোর। দুই সহকারী-গোয়েন্দাও হেসে ফেলল।

সাত

'আমাদের কার্ড তাহলে কোথায় দেখল সে?' মুসার প্রশ্ন।

'দেখেনি,' রবিন বলল। 'নিশ্চয় শুঁটকি বলেছে।'

'মনে হয় না,' জোর দিয়ে বলল কিশোর। 'শুঁটকির কাছে যাওয়ার আগেই আমাদের কথা জেনেছে সে, আমি শিওর। আর শুঁটকি আমাদের সুনাম কিছুতেই করবে না, হিসুংক নাম্বার ওয়ান। তাছাড়া ওর কাছে শুনে থাকলে সেকথা বলত টনি।'

'কিন্তু বলেনি,' বুঝতে শুরু করেছে রবিন। 'আমরা তিন গোয়েন্দা, জেনেও চুপ থেকেছে। আমরা বলার আগে মুখেও আনেনি।'

'তারমানে,' মুসা বলল, 'বলতে চাইছ, আগেই জেনেছে। অথচ জানে যে সেটা জানাতে চায়নি?'

'কিন্তু কেন?' প্রশ্ন করল রবিন। 'আমাদের কার্ড দেখেও না বলার কি কারণ থাকতে পারে?'

'একটাই কারণ,' ভেবেচিন্তে বলল কিশোর। এমন কোন উপায়ে জেনেছে, যেটা আমাদের বলা উচিত মনে করছে না। আচ্ছা, তোমাদের কার্ডগুলো গুণে দেখো তো? কার পকেটে কটা রেখেছিল?'

সঙ্গে কয়েকটা করে কার্ড রাখে তিনজনেই। বের করে গুণে দেখল মুসা আর রবিন।

'আমার একটা কম,' বলল মুসা। 'কালও দেখেছি, পাঁচটা ছিল।'

'কাল কখন?'

'সকালে।'

'রাতে ফেলেছ তাহলে। পেদ্রোজ এস্টেটের গেটের কাছে। পকেট থেকে রুমাল বের করেছিলে পুতুল জড়ানোর জন্যে, তখনই টান লেগে পড়েছে,' বলল রবিন।

'এবং টনি সেটা পেয়েছে,' কিশোর যোগ করল। 'হয়তো রাতেই গেটের কাছে এসেছিল সে। যেহেতু বলছে না...'

'খাইছে!' বাধা দিল মুসা। 'সে-ই পুতুল চুরি করেছিল ভাবছ?'

'অসম্ভব কি?'

'কিন্তু, কিশোর,' রবিন বলল, 'সে-ই যদি চুরি করবে, আমাদের সাহায্য চাইতে এল কেন? চাপাচাপি করে সে-ই তো তার দাদীকে রাজি করাল, আমাদের সাহায্য নেয়ার জন্যে।'

'চাপাচাপি খুব বেশি করেছে,' বলল কিশোর, 'সেটাই সন্দেহজনক। ওর হয়তো ধারণা, পুতুলটা আমাদের কাছে আছে। ফেরত চায়। পুরস্কারের লোভ দেখিয়েছে সে-জন্যেই।'

'তাতে তার কি লাভ? পুতুল পেলে তো আমরা নিয়ে দেব মিস পেদ্রোর কাছে। আমাদের কাছে সরাসরি চাইলেই পারত। পারত না?'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল দু-বার কিশোর। 'এই প্রশ্নটাই খোঁচাচ্ছে আমাকে। দুটো ব্যাপার শিওর। এক, পুতুলটা ফেরত চায় টনি। দুই, দরকার হলে, ওটার যা বাজারদর, তার চেয়ে বেশি দিতে রাজি।'

'কিন্তু হারিয়ে বসে আছি আমরা,' গুঙিয়ে উঠল মুসা 'ফেরত পাওয়ারও কোন আশা নেই।'

'হয়তো আছে,' সহজে নিরাশ হওয়ার ছেলে নয় কিশোর। 'চুরি হওয়ার পর থেকেই ভাবছি, কি করে আবার ফেরত আনব। লোকটার যা চেহারা আর পোশাক-আশাক, রকি বীচে বেশিক্ষণ লুকিয়ে থাকতে পারবে না। ভূত-থেকে-ভূতের সাহায্য নেব আমরা।'

'ঠিক,' তুড়ি বাজাল মুসা।

'হ্যাঁ, কটা ছেলেমেয়ের চোখ ফাঁকি দেবে?' রবিন বলল।

'তাড়াতাড়ি করা দরকার,' বলল কিশোর। 'এসো, মালগুলো গুছিয়ে নিই। বোরিস একা পারছে না।'

এক ঘণ্টার মধ্যেই পছন্দসই জিনিসগুলো আলাদা করা হয়ে গেল, প্রতিটির লিস্ট করে নিয়েছে কিশোর। ফিরে চলল ইয়ার্ডে।

লিস্ট দেখে খুব খুশি হলেন মেরিচাচী। কোনটার দাম কত হতে পারে, তাই নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করলেন। এখানে আর কিছু করার নেই। হেডকোয়ার্টারে চলল তিন গোয়েন্দা।

পুতুল ছিনতাইকারী আর তার সঙ্গীর চেহারার বর্ণনা নিখুঁতভাবে লিখে নিল কিশোর। তারপর এক এক করে ফোন শুরু করল তার পাঁচজন বন্ধুকে। লোকগুলো আর ঝরঝরে গাড়িটার কোন খবর পেলে জানাতে অনুরোধ করে রিসিভার তুলে দিল মুসার হাতে। সে ফোন করল তার পাঁচ বন্ধুকে। তারপর রবিন করল তার পাঁচ বন্ধুকে। ওই পনেরো জন আবার তাদের পাঁচ বন্ধুকে জানাবে, তারা জানাবে তাদের পাঁচজন করে বন্ধুকে। দেখতে দেখতে সারা রকি বীচের কিশোর মহলে ছড়িয়ে পড়বে খবরটা।

'এবার,' হেসে বলল কিশোর, 'শুধু অপেক্ষার পালা।'

কিন্তু ছ-টা পর্যন্ত করার পরও কোন খবর এল না। নির্বাক একে অন্যের দিকে তাকাল তিন গোয়েন্দা। ব্যাপারটা কি? রকি বীচের কোন ছেলেমেয়ে দেখেনি নাকি? বাতাসে মিলিয়ে গেল ওরা?'

'লুকিয়ে পড়েছে,' রবিন বলল।
'রকি বীচে আছে কিনা, কে জানে,' বলল মুসা।
'আমি শিওর, আছে,' আশা ছাড়তে পারছে না কিশোর। 'খোঁজ পেতে সময় লাগবে, এই আরকি। খবর পাবই। এখন...'
'এখন আমরা বাড়ি যাব,' ঘড়ির দিকে চেয়ে বলল মুসা। 'খিদে লেগেছে।'
অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে মুখ বাঁকাল কিশোর। মুসার এই খাওয়ার ব্যাপারটায় মাঝে মাঝে বিরক্ত হয় সে। যত জরুরী কাজই থাকুক, তার কাছে খিদেটাই আসল।
'ঠিক আছে,' বলল কিশোর, 'যাও। রবিন, ডিনার সেরে লাইব্রেরিতে যাবে একবার। লোকাল হিস্টরির ওপর অনেক বই আছে, সেদিন দেখলাম। ওগুলো ঘাঁটলেই পেয়ে যাবে। আর হ্যাঁ, মিস ভেরা পেদ্রোর ভাইয়ের কথাও কিছু লেখা আছে কিনা, দেখো তো।'
'আমার কি কাজ?' জানতে চাইল মুসা।
'তুমি? সোজা এখানে চলে আসবে। আমরা দুজন যাব পেদ্রোজ এস্টেটে। রহস্যময় কিছু ঘটছে ওখানে। কি, সেটা জানা দরকার।'
'কি জানার আছে?' বুঝতে পারছে না মুসা।
'হয়তো অনেক কিছুই। প্রথমেই ধরো, সেই ছায়ামূর্তির কথা, অদ্ভুত ছায়া আর হাসি। ওটাকে দেখতে চাই একবার। নিজের চোখে।'
'আবার!' চমকে উঠল মুসা।
'খাওয়ার পর সোজা এখানে আসবে,' আবার বলল কিশোর। 'কালো শার্ট-প্যান্ট পরে আসবে।'

পশ্চিমের উঁচু পাহাড়গুলোর ওপাশে অস্ত যাচ্ছে টকটকে লাল সূর্য। এস্টেটের লোহার গেটের সামনে পৌঁছল কিশোর আর মুসা। ঝোপের ভেতর সাইকেল লুকিয়ে রেখে ক্যারিয়ার থেকে ছোট, পেটফোলা ব্যাগটা খুলে নিল কিশোর। 'খুব উঁচু দেয়াল,' ফিসফিসিয়ে বলল সে, 'তাই তৈরি হয়ে এসেছি।'
ব্যাগ খুলে ছোট দুটো ওয়াকি-টকি বের করল কিশোর। চার কাঁটাওয়ালা মাঝারি সাইজের একটা হুক আর মোটা দড়ির বাণ্ডিলও বের করে নিল। 'যদি আমরা কোন কারণে আলাদা হয়ে যাই, সে-জন্যে,' ওয়াকি-টকি দেখিয়ে বলল সে। 'হুক আর দড়ি দেয়াল টপকানোর জন্যে।'
হুকের ছিদ্র দিয়ে দড়ির এক মাথা ঢুকিয়ে শক্ত করে বাঁধল কিশোর, ছুঁড়ে দিল ওপর দিকে। দেয়ালের ওপরে আটকে গেল হুকের একটা কাঁটা। দুজনে মিলে দড়ি ধরে টেনে দেখল, খুলে আসছে না।
দড়ি বেয়ে আগে উঠে গেল মুসা। উঁকি দিয়ে দেখল ওপাশে। উঠে বসে ফিরে চেয়ে কিশোরকে ওঠার ইঙ্গিত করল।
উঠে এল কিশোর।
দেয়াল থেকে হুকটা খুলে নিয়ে দড়ি গুটিয়ে আবার ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখল কিশোর। দুজনে লাফিয়ে নামল এস্টেটের সীমানার ভেতরে। ব্যাগটা একটা

ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রাখল।

'বাড়িটাতে ঢুকব,' বলল কিশোর। 'খুব সাবধান।'

ম্লান হয়ে আসছে সাঁঝের আলো। গাছপালা আর ঝোপঝাড়ের আড়ালে আড়ালে সাবধানে এগোল ওরা। ছোট একটা টিলায় উঠে থামল, এখান থেকে মূল বাড়ি আর গোলাঘরটা স্পষ্ট দেখা যায়। চোখ রাখা যাবে।

দিনের আলো শেষ, হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে যেন অন্ধকার। আলো জ্বলে উঠেছে বাড়িটার ঘরে ঘরে। জানালার শার্সিতে মানুষের ছায়া, কিন্তু কেউ বেরোল না, ঘরের ভেতরেই হাঁটাচলা করছে। চারদিক শান্ত। দূরে রাস্তার দিক থেকে কদাচিত ভেসে আসছে গাড়ির এঞ্জিনের শব্দ।

এক জায়গায় একই ভঙ্গিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে থেকে শরীর ব্যথা হয়ে যাচ্ছে, জমে যাচ্ছে যেন মাংসপেশী। মুসার একটা পা প্রায় অবশ, মৃদু ডলাডলি করে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করে নিল।

কিশোর নড়ল না, পড়ে আছে তো আছেই। স্থির, পাথরের মূর্তি যেন।

সময় যাচ্ছে।

এক সময় বাড়ির নিচতলার আলো নিভে গেল। চাঁদ নেই আকাশে। আরও ঘন হলো অন্ধকার।

হঠাৎ, মুসার বাহুতে হাত রাখল কিশোর।

'কি?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল অবাক মুসা।

'ওই যে!'

লম্বা, আবছা একটা মূর্তি এগিয়ে যাচ্ছে বাড়িটার দিকে। দাঁড়িয়ে পড়ল, কান পেতে কিছু শোনার চেষ্টা করছে বোধহয়, তারপর আবার চলতে শুরু করল। গোলাঘরের পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে পুবের বনের দিকে।

'ও বনে ঢুকলেই আমরা...' কথা আর শেষ করতে পারল না কিশোর।

তীক্ষ্ণ, তীব্র, বুনো হাসি ছড়িয়ে পড়ল দিকে দিকে, খান খান করে দিল যেন আঁধার রাতের স্তব্ধ নীরবতা।

আট

চিড়িয়াখানায় অন্ধকারে হায়েনার হাসি শুনেছে কিশোর, হাসিটা অনেকটা সে-রকম লাগল তার কাছে।

'ওটাই!' গলা কেঁপে উঠল মুসার। 'ভূতের ছায়া। আজ অন্যরকম লাগছে!'

'মানে?'

'সে-দিনের মত কুঁজো নয়। তবে হাসিটা একরকম।'

'জলদি করা দরকার। নইলে হারিয়ে ফেলব। চলো।'

উঠে, টিলার উল্টো ধার দিয়ে দ্রুত নেমে এল ওরা। বনের দিকে ছুটল। যে পথ ধরে ছায়াটা গেছে, সে-পথ ধরে। যতখানি কাছে থেকে সম্ভব অনুসরণ করতে চায়।

ফিরে তাকাল না ছায়াটা, লম্বা লম্বা পা ফেলে একভাবে এগিয়ে চলেছে। থেমে গেছে বুনো হাসি।

মাইলখানেক পর ঘন হতে শুরু করল বন। এগিয়েই চলেছে ছায়া। আরও খানিকদূর এগিয়ে মোড় নিল, মূল পথ থেকে সরে গেল একটা গলিপথে।

সরু এই পথটা গিয়ে পড়েছে বাটি-আকৃতির ছোট একটা উপত্যকায়। খোয়া বিছানো কাঁচা পথ চলে গেছে উপত্যকার বুক চিরে, পথের শেষ মাথায় ছোট, পুরানো একটা কাঠের বাড়ি। চারপাশে ঘেরা বারান্দা, খড়খড়ি লাগানো জানালা, পাথরে তৈরি চিমনি।

'শিকারীর বাংলো গোছের কিছু,' বলল কিশোর। 'হান্টিং লজ।'

'দেখো!'

আড়াল থেকে বেরিয়ে কালো মস্ত আরেকটা ছায়া এগিয়ে আসছে বাড়ির দিকে। আরও কাছে আসার পর কানে এল এঞ্জিনের শব্দ। ট্রাক, হেডলাইট নিভানো। যেন উড়ে এসে ট্রাকটা থামল ছায়ামূর্তির কাছে, কেবিন থেকে লাফিয়ে নামল বেঁটে, ভারি একটা লোক। দ্রুত, চাপা গলায় কথা হলো কিছু, তারপর ঘুরে ট্রাকের পেছনে গিয়ে টেইল-বোর্ড নামাল লোকটা।

পেছন থেকে নামল চারটে বেঁটে মূর্তি।

ওদেরকে এক সারিতে দাঁড় করাল লোকটা। আগে আগে বাড়িটার দিকে চলল সে, পেছনে অন্যেরা।

লম্বা ছায়াটা আগেই গিয়ে উঠেছে বারান্দায়। আলো জ্বেলে দিল।

'খাইছে!' আঁতকে উঠল মুসা। 'কি ওগুলো?'

খুবই বেঁটে চারটে মূর্তি, মাথা নেই।

'মাথা! মাথা গেল কই!' গলা কাঁপছে মুসার।

'আ-আমি জানি না!' কিশোর পাশাও কথা হারিয়ে ফেলেছে। 'ও-ওরা, মনে তো হচ্ছে, মুণ্ডুশূন্য বামন...'

অন্ধকারে একে অন্যের মুখের দিকে তাকানোর চেষ্টা করল দুই কিশোর।

'হচ্ছে কি এখানে?' মুসার জিজ্ঞাসা।

'জানি না,' গলা শুকিয়ে গেছে গোয়েন্দাপ্রধানের। 'কাছে গেলে বোঝা যাবে। চলো, জানালা দিয়ে উঁকি দিই।'

ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল দুজনে।

হঠাৎ আবার বিস্ফোরিত হলো যেন ভয়াল হাসি, ঠিক তাদের পাশে।

কোনরকম ভাবনা-চিন্তার অবকাশ নেই আর। পাঁই করে ঘুরে দিল দৌড় দুজনে, যে পথে এসেছে, সে-পথে। পেছন ফিরে তাকানোর সাহস হারিয়েছে।

উত্তেজিত হয়ে লাইব্রেরি থেকে বেরোল রবিন। জবর খবর জেনেছে।

দ্রুত হেডকোয়ার্টারে এসে ঢুকল সে। কিন্তু মুসা আর কিশোর ফেরেনি। এলেই যেন বাড়িতে ফোন করে, ওদের জন্যে মেসেজ রেখে বেরিয়ে এল রবিন। বাড়ি চলল।

টেলিভিশনে স্থানীয় সংবাদ শুনছেন মিস্টার মিলফোর্ড। লস অ্যাঞ্জেলেসের একটা বিশিষ্ট পত্রিকায় সাংবাদিকতার কাজ করেন তিনি, কাজেই রেডিও-টেলিভিশনের যে কোন খবর শোনা পারতপক্ষে বাদ দেন না। বাড়িতে থাকলে তো নয়ই।

রান্নাঘরে মাকে খুঁজে পেল রবিন।

এক গ্লাস দুধ আর কয়েকটা বিস্কুট এগিয়ে দিলেন মিসেস মিলফোর্ড। 'লাইব্রেরি থেকে এলি?'

'হ্যাঁ,' বলল রবিন। 'মা, কিশোর কোন মেসেজ দিয়েছে?'

'না-তো।'

'অ।' রান্নাঘরের টেবিলে বসে খেতে শুরু করল রবিন।

এই সময় বাবা ঢুকলেন সেখানে। 'কি যে হচ্ছে আজকাল,' অনিশ্চিত কণ্ঠস্বর, কাউকে উদ্দেশ্য করে বলেননি। 'রকি বীচেই আজ একটা লোককে মারার চেষ্টা হয়েছিল। পাবলিক হলে, লোকজনের সামনে।'

'রকি বীচে?' আঁতকে উঠলেন মিসেস মিলফোর্ড। 'সাংঘাতিক কাণ্ড! কে? কাকে?'

'আর বলো না, কোন চরমপন্থী হবে। যাকে আক্রমণ করা হয়েছিল, সে এক নিরামিষভোজী সঙ্ঘের প্রেসিডেন্ট, আরেক পাগল। ভক্তদের সামনে বক্তৃতা দিচ্ছিল, এই সময় সাদা, বিচিত্র পোশাক পরা দুই লোক মঞ্চে উঠে আক্রমণ করে বসল। দুজনেরই বাদামী চামড়া।'

গলায় দুধ প্রায় আটকে গেল রবিনের। একটু কেশে পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, 'বাদামী চামড়া?'

'তাই তো বলল।'

'প্রেসিডেন্ট ব্যথা পেয়েছে?' জিজ্ঞেস করলেন মিসেস মিলফোর্ড।

'না। লোক দুটোকে ধরা যায়নি। পালিয়েছে।'

'নাম কি ওর, বাবা?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'কার নাম?'

'ওই যে, নিরামিষভোজী প্রেসিডেন্ট।'

'ডাংম্যান। কি ডাংম্যান যেন।'

কোন সন্দেহ থাকল না আর রবিনের, পুতুল ছিনতাইকারীরাই আক্রমণ করেছে নিরামিষভোজীদের প্রেসিডেন্টকে। দুই ঢোকে বাকি দুধটুকু শেষ করে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল সে। টেলিফোন করবে। একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেছে, বাদামী লোকগুলো যে-ই হোক, সাংঘাতিক কোন উদ্দেশ্য রয়েছে তাদের।

রিঙ হয়েই চলেছে হেডকোয়ার্টারে। কিন্তু ধরছে না কেউ। তারমানে ফেরেনি এখনও মুসা আর কিশোর।

হুমড়ি খেয়ে ঝোপের ভেতর পড়ে রয়েছে দুই গোয়েন্দা। হাঁপাচ্ছে জোরে জোরে। কাঁটা, ভাঙা শুকনো ডালের মাথার খোঁচা আর আঁচড় লেগে ছিলে গেছে গায়ের

চামড়া। পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়েছে কয়েকব্যর, দুই হাঁটুর চামড়াও ক্ষতবিক্ষত। তবে অনেক পেছনে ফেলে এসেছে রহস্যময় কাঠের বাংলো।

'পাগলা-ভূতটা' তাদের সঙ্গে সঙ্গে এসেছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না।

সাবধানে মাথা তুলে পেছনে তাকাল মুসা। 'কিশোর, কিছু দেখতে পাচ্ছ?'

'না। এখানে আমরা নিরাপদ।'

'আমার তা মনে হচ্ছে না। কি ওগুলো? মুণ্ডুশূন্য বামনগুলো?'

'সহজ কোন ব্যাখ্যা নিশ্চয় আছে,' অস্বস্তিবোধ পুরোপুরি যাচ্ছে না কিশোরের। 'ভাল মত দেখারই তো সুযোগ পেলাম না। ফিরে গিয়ে আবার যদি...'

'পারলে তুমি যাও,' হাত নাড়ল মুসা। 'আমি নেই। একে তো পাগলা হাসি, তার ওপর ওই মাথাছাড়া...' কেঁপে উঠল সে। 'আল্লাহ্‌গো, বাঁচাও!'

জোরে নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। 'হাসিটা অবশ্য বিকটই, ভয় লাগে।'

'খালি ভয়? চলো পালাই। আবার এসে পড়লে,' ভয়ে ভয়ে পেছনে তাকাল মুসা।

নীরব হলো কিশোর। গভীর ভাবনায় ডুবে গেছে।

উদ্বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছে গোয়েন্দা-সহকারী।

অবশেষে বলল কিশোর, 'আমার মনে হয়, সব কিছুর মধ্যেই যুক্তি রয়েছে, মুসা। বাদামী চামড়ার সেই মূর্তিচোর লোকটা, এই ভূতের হাসি, মুণ্ডুশূন্য বামন...'

'কি যুক্তি?'

'সেটাই জানতে হবে। তবে এখন আমাদের বাড়ি যাওয়াই ভাল।'

'হ্যাঁ, এইটা হলোগে কাজের কথা।'

অন্ধকারে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল মুসা। এই একটা কাজে সে বিশেষ পারদর্শী। একবার কোন পথে গেলে সেটা সহজে ভোলে না, কি করে যেন ঠিক চিনে নেয়। কিশোরের খুব অবাক লাগে মাঝে মাঝে।

চলছে ঠিক পথেই, তবে গতি ধীর।

যেখানে দিয়ে ঢুকেছিল দেয়ালের সেই জায়গাটার কাছে এসে থামল দুজনে।

ঝোপের ভেতর থেকে ব্যাগটা বের করল মুসা।

হুক ছুঁড়ে মারল কিশোর। একবার, দু-বার, তিনবার, আটকাতে পারছে না, অথচ তখন একবারেই কাজ হয়ে গিয়েছিল। তবে তখন আলো ছিল।

'দেখি, আমার কাছে দাও,' হাত বাড়াল মুসা। প্রথমবারে সে-ও পারল না, কাজ হলো দ্বিতীয়বারে। টেনেটুনে দেখল দড়িটা না, খুলে আসবে না। উঠতে গিয়েই স্থির হয়ে গেল। নীরবতার মাঝে রাইফেলের বোল্ট টানার ক্লিক শব্দটা বড় বেশি করে কানে বেজেছে।

'এই সরে এসো!' কঠিন আদেশ শোনা গেল।

পথের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে লম্বা একটা মূর্তি, হাতের রাইফেল এদিকে ফেরানো।

কিছু করার নেই। দেয়ালের কাছ থেকে সরে এল দুই কিশোর, পথে উঠল। মূর্তিটার কাছে এসে বলে উঠল কিশোর, 'টনি, আমি কিশোর, ও মুসা।'

রাইফেল সরাল না টনি। সন্দেহ যাচ্ছে না। শীতল কণ্ঠে বলল, 'এখানে কি করছ?'

'টনি,' অধৈর্য হয়ে বলল মুসা, 'কি করছি ভালমতই জানো। সোনার পুতুল খুঁজছি।'

'এই অসময়ে?' ধমকের সুরে বলল টনি। 'অন্ধকারে চোরের মত? কই, আজ আবার আসবে বলোনি তো। সত্যি করে বলো, কেন এসেছ?'

'কি জ্বালা! বললাম তো পুতুল খুঁজতে,' জবাব দিল কিশোর। 'ভাবলাম, গেটের কাছে হারিয়েছে যখন, অন্ধকারে চোরটা আবার ফিরে আসতে পারে ওখানে।' কণ্ঠস্বর পাল্টে গেল। 'টনি, পুতুল খোঁজার অনুমতি আমাদেরকে দিয়েছেন তোমার দাদী, নাকি?'

দ্বিধায় পড়ে গেল টনি। 'তোমাদের বিশ্বাস করব কিনা ভাবছি।'

'তোমাকেও তো অবিশ্বাস করতে পারি আমরা!' রেগে গেল মুসা। 'আমরা যে তিন গোয়েন্দা, অনেক আগে থেকেই জানো তুমি। আমাদের কার্ড পেয়েছ।'

থামানোর জন্যে মুসার পায়ে লাথি মেরে বসল কিশোর, কিন্তু লাভ হলো না, ধনুক ছেড়ে বেরিয়ে গেছে তীর।

'কি করে জানলে?'

আর মিথ্যে বলে লাভ নেই, সত্যি কথাই বলল মুসা।

'হুঁ,' নরম হলো টনির গলা, রাইফেল নামাল, 'তোমরা চালাক ছেলে। হ্যাঁ, তোমাদের কার্ড পেয়েছি, গেটের কাছে। ডাংম্যানকে সেকথা বললাম। যা করার বুঝেশুনে করতে বলল আমাকে। দাদীর উকিলকে জিজ্ঞেস করলাম তোমাদের কথা। সে আমাকে টেরিয়ার ডয়েলের কাছে পাঠাল, সেকথা আগেই বলেছি। হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ, মাল বিক্রির ছুতোয়ই তোমাদেরকে এস্টেটে নিয়ে এসেছিলাম, চাইছিলাম, পুতুল খোঁজার কাজটা দাদী তোমাকে দিক।'

'তুমি ভেবেছিলে আমরা চুরি করেছি,' ঝাঁঝাল মুসার কণ্ঠ।

'হ্যাঁ,' স্বীকার করল টনি, 'কিছু মনে করো না। মিস্টার ডাংম্যানকে সে-কথাও বলেছি। সে বলল, 'তা না-ও হতে পারে। চোর হয়তো তাড়াহুড়োয় পুতুলটা গেটের কাছে ফেলে গেছে, তোমরা কুড়িয়ে পেয়েছ। তাই ঠিক করলাম, পুরস্কার ঘোষণা করে পুতুল ফেরত দেয়ার সুযোগ করে দেব তোমাদের।'

'ওসব ঝামেলা না করে,' বলল কিশোর, 'খোলাখুলি বললেই ভাল করতে।'

'ওই যে, মিস্টার ডাংম্যান বলল, তোমরা চোর না-ও হতে পারো।'

'কুড়িয়ে পেয়েছি কিনা, সেটাও তো জিজ্ঞেস করতে পারতে?'

'সেটাও আলোচনা করেছি আমরা। মিস্টার ডাংম্যান বলল, তোমরা স্বীকার করবে না। ভয় দেখালে কোন দিনই আর দেবে না পুতুলটা।'

'তাই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে,' আনমনে বলল কিশোর। 'পুরস্কার ঘোষণা করালে। এমন ভাব দেখালে, যেন জানোই না পুতুলটা আমাদের কাছে আছে।'

'হ্যাঁ। এখন তো সব খোলাখুলি হয়ে গেল। দিয়ে দাও না ওটা। তুমিই তো

পেয়েছ?'

'রবিন আর মুসা পেয়েছিল।'

'পেয়েছিল?'

'হ্যা। হারিয়েছি আবার। সকালে বাদামী চামড়ার এক লোক কেড়ে নিয়ে গেছে।'

মাথা নাড়ল কিশোর। 'না, ফেরত পাওয়ার সুযোগ এখনও আছে। লোকটাকে খুঁজে বের করতে পারলেই...'

শব্দ করে হাসল টনি। 'আমার সাহায্য নেবে? তোমাদের সঙ্গে কাজ করতে খুব ভাল লাগবে আমার।'

'হ্যা, একটা সাহায্যই করতে পারো,' বলল কিশোর। চোখ খোলা রাখো, এস্টেটে কারা আসে যায় খেয়াল রাখো।'

'ঠিক আছে।'

'এখন আমাদের বাড়ি যাওয়া দরকার। দেরি হয়ে গেছে।'

গেট দিয়ে ওদের বের করে দিল টনি।

অন্ধকার গিরিপথ ধরে সাইকেল চালিয়ে চলল দুই গোয়েন্দা।

'কিশোর,' একসময় জিজ্ঞেস করল মুসা, 'আমরা যে ভূত দেখেছি, টনিকে বললে না কেন?'

'ওকে বিশ্বাস করতে পারছি না। আমার ধারণা, কিছু একটা গোপন করছে।'

নয়

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নামল রবিন। তাড়াহুড়ো করে কাপড় পরে নিচতলায় নামল। বাবা-মা ওঠেননি। তাঁদের দরজায় টোকা দিয়ে ডেকে বলল, 'মা, আমার নাস্তা খেয়ে নিচ্ছি।'

মায়ের ঘুমজড়ানো কণ্ঠ শোনা গেল, 'ঠিক আছে। কোথায় যাবি?'

'ইয়ার্ডে।'

জানালা দিয়ে রোদ ঢুকছে রান্নাঘরে। রুটি, ভাজা ঠাণ্ডা ডিম আর এক গ্লাস কমলার রস দিয়ে নাস্তা শেষ করে এসে মুসাকে ফোন করল রবিন।

মুসার মা জানালেন মুসা বেরিয়ে গেছে।

ঘর থেকে ছুটে বেরোল রবিন।

ইয়ার্ডে ঢুকেই পড়ে গেল মেরিচাচীর সামনে।

'এই যে, একটাকে অন্তত পাওয়া গেল,' বলে উঠলেন তিনি। 'অন্য দুটোকে ডাকাডাকি করলাম, জওয়াবই নেই। পালিয়েছে বোধহয় ভোররাতেই। রবিন, কিশোরকে বলো, আজ তার চাচার সঙ্গে এস্টেটে যেতে হবে।'

'বলব, আন্টি।'

মেরিচাচী অফিসে গিয়ে ঢোকার পর পা বাড়াল রবিন, ওয়ার্কশপের দিকে। দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে ঢুকল হেডকোয়ার্টারে।

মুসা আর কিশোর দুজনেই আছে।

'মেরিচাচী কি বললেন?' ভুরু নাচাল মুসা।

জানাল রবিন। গম্ভীর হয়ে থাকা কিশোরকে জিজ্ঞেস করল, 'ভূত-থেকে-ভূতের কি খবর?'

মাথা নাড়ল শুধু কিশোর, মুহূর্তের জন্যে চোখ সরাচ্ছে না টেলিফোনের ওপর থেকে।

'কাল রাতে কি জেনেছি, জানো?' কথা আর পেটে রাখতে পারছে না রবিন।

'আমরা কি দেখেছি, শোনো আগে,' মুসার অবস্থাও রবিনের মতই। হড়হড় করে উগড়ে দিতে আরম্ভ করল সে। শুনে চোখ বড় বড় হয়ে গেল রবিনের।

'নিশ্চই মাথা আছে ওদের,' মুসা বামনদের কথায় আসতেই বলল কিশোর। 'তবে দেখা যায়নি। মরুকগে ব্যাটারা। আমি ভাবছি, ভূত-থেকে ভূতের কি অবস্থা? খবর-টবর আসে না কেন? ওই বাদামী লোকদুটোই সমস্ত রহস্যের চাবিকাঠি, কিন্তু কোথায় ওরা? হ্যাঁ, রবিন, চাম্যাশ হোর্ডের কথা কি জেনেছ কাল?'

'এখানকার লোকাল হিস্টরি বইতে ব্যাপারটা নিয়ে বেশ ফোলানো-ফাঁপানো হয়েছে,' জানাল রবিন। 'ডাকাতের দলটা মারা পড়তেই গুপ্তধন খুঁজতে বেরিয়েছিল লোকে, দলে দলে। অনেক দিন ধরে অনেক ভাবে খুঁজেছে, পায়নি। ডাকাতেরা পুরো পর্বত জুড়ে ছড়িয়ে ছিল, এককে দিন এককে জায়গায় সরে যেত। পেদ্রোজ এস্টেটেও গিয়ে লুকিয়েছিল একবার। গুপ্তধনগুলো কোথায় আছে, আন্দাজই করতে পারেনি কেউ।'

'অ্যামিউলেট দুটোর খবর কি?' জিজ্ঞেস করল মুসা। 'আর মিস ভেরা পেদ্রোর ভাইয়ের নাম?'

'মিস পেদ্রোর ভাইয়ের নাম ছিল ফিয়ারতো, খুনী। একটা লোককে খুন করে ফেরারী হয়েছিল। অবাকই লাগে, যে লোকটাকে খুন করেছিল, সে ছিল শিকারী, থাকত এস্টেটের হানটিং লজে। কেউ জানে না, কেন তাকে খুন করেছে ফিয়ারতো। অ্যামিউলেট দুটোর কোন কথাই লেখা নেই বইতে। একবার উল্লেখও করা হয়নি।'

নিচের ঠোঁটে কামড়ে ধরল কিশোর। 'আচ্ছা, ম্যাগনাস ভারদি মরার আগে ঠিক কি বলেছিল, বলো তো।'

'চারটে বইতে তিন রকম লিখেছে,' নোটবই বের করল রবিন। 'একটাতে লিখেছে, *হোয়াট ম্যান ক্যান ফাইণ্ড দা আই অভ দা স্কাই?* আরেক লেখক বলছেন, *দা স্কাইজ আইজ ফাইণ্ড নো ম্যান।* অন্য দুটো বইতে একরকম কথা, *ইট ইজ ইন দা আইজ অভ দা স্কাই হোয়্যার নো ম্যান ক্যান ফাইণ্ড ইট।* চাম্যাশ ভাষা থেকে অনুবাদ করতে গিয়েই গড়বড় করে ফেলেছে মনে হয়।'

'খুব বেশি গোলমাল করেনি,' বলল কিশোর। 'আই অভ দা স্কাই কথাটা সবাই বলছে।'

'কিন্তু, কিশোর,' মুসা বলল, 'আই অভ দা স্কাইয়ের মানে কি?'

'আকাশে কি জিনিস আছে, যা দেখতে চোখের মত?' পাল্টা প্রশ্ন করল

কিশোর।

'অনেক সময় মেঘ ওরকম দেখায়।'

'আমার মনে হয় সূর্য,' রবিন বলল।

মাথা নোয়াল কিশোর। 'আমারও তাই মনে হয়। চাঁদও হতে পারে। রূপকথার বইতে, ছবিতে চাঁদ আর সূর্যকে মানুষের মুখের মত করে আঁকে অনেকে।'

'তাহলে কি চাঁদে গিয়ে গুপ্তধন লুকিয়েছে নাকি?' প্রশ্ন তুলল মুসা।

'না, তা নয়। তবে এমন কোন জায়গা হয়তো বেছে নিয়েছে, যেখানে সব সময় চাঁদ আর সূর্যের আলো পড়ে। প্রাচীন অনেক মন্দির এমনভাবে তৈরি হয়েছে, সব সময় রোদ পড়ে ওগুলোতে।'

'হ্যাঁ,' সায় দিল রবিন। 'কিছু কিছু মন্দির তো আছে, ওপরের দিক খোলা, সেখান দিয়ে রোদ কিংবা জ্যোৎস্না এসে পড়ে মঞ্চের ওপর।'

'তাহলে কি ওরকম কোন জায়গা খুঁজতে হবে?'

'কোথায় খুঁজব?' হঠাৎ উজ্জ্বল হলো কিশোরের মুখ। 'ম্যাগনাস ভারদি অন্য কিছুও বুঝিয়ে থাকতে পারে। কোন গিরিখাত, গিরিপথ বা উপত্যকার কথাও বোঝাতে পারে, যেখান থেকে চাঁদ কিংবা সূর্যকে দেখতে চোখের মত লাগে। কি মুসা, এমন কোন জায়গা চেনো?'

'কোত্থেকে চিনব? আমার চোখে তো পড়েনি। আর সান্তা মনিকা তো ছোট পর্বত না, সবটাতেই নাকি ঘুরেছিল ভারদির ডাকাতের দল। কোন জায়গা থেকে চাঁদ-সুরুজকে চোখের মত লেগেছে ব্যাটাদের, ওরাই জানে।'

'হ্যাঁ,' মুসার সঙ্গে একমত হলো রবিন। 'তাছাড়া ভারদি বলেছে, গুপ্তধন কেউ খুঁজে পাবে না, এমন জায়গায়ই রেখেছে।'

'আমার তা মনে হয় না,' বলল কিশোর। 'নিশ্চয় ব্যাপারটাকে ধাঁধা বানিয়ে রেখে গেছে ভারদি। বাদামী লোকটা পুতুল দিয়ে কি করবে যদি খালি একথাটা জানতে পারতাম, অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যেত।'

'ও-মা, কিশোর, ভুলেই গিয়েছি!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'মিস্টার ডাংম্যানকে আক্রমণ করেছিল ওরা।'

খুলে বলল সব।

লাফিয়ে উঠল কিশোর। 'এক্ষুণি মিস্টার ডাংম্যানের কাছে যাওয়া দরকার। জরুরী কিছু হয়তো জানতে পারব। না দুজন নয়, একজন এসো আমার সঙ্গে। আরেকজন থাকো ফোনের কাছে। কে থাকবে?'

'গতরাতে মুসা গেছে, আজ আমি যাব,' বলল রবিন। 'বেকুব হয়ে সারাক্ষণ একা এখানে বসে থাকতে পারব না।'

'যাও,' খুশি হয়েই বলল মুসা, কাঁটায় লেগে ছড়ে যাওয়া একটা জায়গায় হাত বোলাচ্ছে। 'আমি আছি।'

'মুসা,' কিশোর বলল, 'ওয়াকি-টকি নিয়ে যাচ্ছি। ভূত-থেকে-ভূতের কোন খবর এলে সঙ্গে সঙ্গে জানাবে।'

ফোন করে ভেজিট্যারিয়ান লীগের ঠিকানা জেনে নিয়ে হেডকোয়ার্টার থেকে বেরোল কিশোর আর রবিন। সাইকেল নিয়ে একটা গোপন পথ দিয়ে ওয়ার্কশপ থেকে বেরোল, মেরিচাচীর চোখে যাতে না পড়ে সেজন্যে এই সতর্কতা।

দশ মিনিটেই বাড়িটা খুঁজে বের করে ফেলল ওরা। শহরের এক প্রান্তে লা পামা স্ট্রীটের শেষ মাথায় ব্লকের মস্ত গথিক-স্টাইলে বানানো পুরানো বাড়িটাকে হেডকোয়ার্টার করেছে ভেজিট্যারিয়ান লীগ। শুকনো বাদামী পাহাড়ের ঢাল নেমে এসে মিশেছে পথের সঙ্গে। পর পর কয়েকটা ব্লকের পেছন দিয়ে আরেকটা সরু পথ চলে গেছে, তার কিনারে সব কটা বাড়ির গ্যারেজ।

গথিক-বাড়ির গেটের কাছে সাইকেল রাখল দুই গোয়েন্দা। সদর দরজায় এসে বেল বাজাল। বেঁটে তাগড়া এক লোক দরজা খুলে দিল।

'মিস্টার ডাংম্যান আছেন?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'ও, তোমরা?' লোকটার পেছন থেকে উঁকি দিল ডাংম্যান। 'এসো, এসো। ল্যাঙলী, সরো, ওদের আমি চিনি।' গোয়েন্দাদের দিকে চেয়ে বলল, 'এত তাড়াতাড়ি আসবে ভাবিনি কিন্তু? লীগে যোগ দিতে এসেছ তো?'

বেঁটে লোকটা গিয়ে কাজে লাগল আবার। আবছা আলোকিত হলঘরে অগোছাল হয়ে রয়েছে কিছু বাক্স, ওগুলোই গোছাচ্ছিল বোধহয়, ঘণ্টা শুনে দরজা খুলতে এসেছে।

বিনীত গলায় বলল কিশোর, 'না, স্যার, এত তাড়াতাড়ি নিরামিষ ধরার ইচ্ছে নেই। আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি।'

'কথা? বেশ, অফিসে এসো। সব অগোছাল হয়ে আছে, দেখেশুনে পা ফেলো। তোমরা লীগে যোগ দিলে খুব খুশি হতাম, অনেক সাহায্য করতে পারতে।'

বাক্স, বই, ফাইলিং কেবিনেট, গাদা গাদা বিজ্ঞাপন আর পোস্টার ছড়িয়ে রয়েছে সারা ঘরে, ওগুলোর মাঝ দিয়ে সাবধানে পা ফেলছে ওরা।

ওক কাঠের ভারি দরজা খুলে বড় অরেকটা রোদে-উজ্জ্বল ঘরে ছেলেদের নিয়ে এল ডাংম্যান, এটাই অফিস। প্রাচীন একটা ডেস্কে বসে দুটো প্রাগৈতিহাসিক চেয়ার দেখিয়ে মেহমানদের বসতে বলল।

'বলো, কি বলতে এসেছ?'

'শুনলাম, আপনাকে নাকি মারতে চেয়েছিল?' বলল কিশোর।

'আর বোলো না, পাগল। বদ্ধ উন্মাদ। দুই জন। এমন হঠাৎ করে মঞ্চে লাফিয়ে উঠল। বক্তৃতা দিচ্ছিলাম তখন। কোন মতে নিজেকে বাঁচিয়েছি। ঠেলাঠেলি, হই-চই জুড়ে দিল মেম্বাররা, পুলিশ ডাকতে গেল, অথচ দুজনকে ধরার কথা মনে এল না কারও। পালাল।'

'আক্রমণ করেছিল কেন, স্যার?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'জানি না।'

'কিছু বলেছে?' কিশোর প্রশ্ন করল।

'বলেছে, তবে ইংরেজি নয়। অনেক চেঁচামেচি, বকবক করেছে, কি বলেছে

ওরাই জানে। একটাকে জাপটে ধরেছিলাম, কিন্তু রাখতে পারলাম না, ঝাড়া দিয়ে ছুটে গেল। পুলিশ আসার আগেই পালাল দু-ব্যাটা। হয়তো ফ্যানাটিক হবে, নিরামিষভোজীদের দেখতে পারে না। ও-রকম অনেকের পাল্লায় পড়েছি আগেও। কত রকম লোক যে আছে দুনিয়ায়। মতের মিল হলো না, ব্যস, ধরে মারো ব্যাটাকে, এমন অনেক আছে।'

'জানি। তবে ওদের দুজনের কথা যা শুনলাম, ফ্যানটিক মনে হচ্ছে না।'

অবাক হলো ডাংম্যান। 'নয়? তাহলে কেন মারতে এল? তোমরা অন্য কিছু ভাবছ, অন্য কারণ?'

'হ্যাঁ, স্যার, আমরা ভাবছি...' বলতে গিয়ে থেমে গেল রবিন।

মৃদু একটা শব্দ হয়েছে।

ডাংম্যানও শুনছে, চোখ কুঁচকে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে শব্দের উৎস আবিষ্কারের জন্যে।

বীপ-বীপ-বীপ! বীপ-বীপ-বীপ!

ঝটকা দিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'মাপ করবেন, স্যার, আমাদের এখুনি বাইরে যেতে হচ্ছে। আসছি। রবিন, এসো।'

'তাড়াতাড়ি এসো,' ডাংম্যান বলল। 'পেদ্রোজ এস্টেটে যাব। রোজই যাই মিস পেদ্রোর সঙ্গে দেখা করতে। তার সাহায্য না পেলে এখানে কিছুই করতে পারতাম না।'

'আসছি, স্যার,' ঘুরে হাঁটতে শুরু করল কিশোর। পিছু নিল রবিন।

ওয়াকি-টকি সিগন্যাল দিচ্ছে। নিশ্চয় মুসা। আশেপাশে বড় বড় বিল্ডিং। শব্দ ঠিকমত ধরা যাবে না। খোলা জায়গা খুঁজল কিশোর। বাগানটা চোখে পড়ল, উজ্জ্বল রোদ। একটা ঝোপের ধারে ছায়ায় চলে এল দুজনে।

হুমড়ি খেয়ে বসে পড়ে সুইচ টিপল কিশোর। 'ফার্স্ট বলছি। সেকেণ্ড, শুনছ? ফার্স্ট, শুনছ? ওভার।'

'শুনছি। বলো। ওভার,' জবাব দিল কিশোর।

'কিশোর?' মুসার দুর্বল কণ্ঠ উত্তেজিত। 'ভূত-থেকে-ভূতে খবর দিয়েছে। এইমাত্র। একটা ছেলে লোক দুটোকে দেখেছে। ঝরঝরে গাড়িটা লা পামা স্ট্রীটের...'

'কিশোর!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'ওই যে, আসছে!'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। রিসিভারের বোতাম থেকে আঙুল সরে গেল, কেটে গেল বেতার যোগাযোগ। স্তব্ধ হয়ে গেল মুসার কণ্ঠ।

সেকথা ভাবার সময় নেই এখন কিশোর আর রবিনের। ওদের সাইকেলের কাছে দাঁড়িয়ে আছে সেই বাদামী চামড়াদের একজন, পরনে বিচিত্র সাদা পোশাক। আরেকজন দাঁড়িয়ে আছে বাড়ির সদর দরজা আর ঝোপটার মাঝামাঝি জায়গায়। দুজনের হাতেই দুটো বড় বাঁকা ফলাওয়ালা ছুরি।

ছেলেরা ওদের দেখে ফেলতেই রওনা হলো দুজনে। ভীষণ ভঙ্গিতে ছুরি নেড়ে এগিয়ে আসতে শুরু করল।

গেটের দিকে যাওয়ারও উপায় নেই, বাড়িতে ঢোকার পথও রুদ্ধ।
'দৌড় দাও!' চেঁচিয়ে বলল কিশোর। 'সোজা পাহাড়ে!'

দশ

বাড়ির কোণের দিকে দৌড় দিল ওরা।

দ্বিধায় পড়ে গেল লোক দুজন। ক্ষণিকের জন্যে। চেঁচিয়ে উঠল গলা ফাটিয়ে।

ফিরেও তাকাল না ছেলেরা। বাগানের শেষে নিচু বেড়া লাফ দিয়ে ডিঙিয়ে এসে পড়ল বাদামী পাহাড়ের গোড়ায়, পথে।

'পাহাড়ে ওঠো,' হাঁপাতে শুরু করল কিশোর। পরিশ্রম একেবারেই সয় না তার।

আগে ছুটছে রবিন, পেছনে কিশোর, শুকনো ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে। শক্ত, ঘন, ধূসর ঝোপের ডাল তাদের কাপড় ছিঁড়ছে, চামড়া ছিলছে, খেয়ালই করছে না কেউ। কানে আসছে পদশব্দ। তাড়া করে আসছে দুই বাদামী। চেঁচাচ্ছে।

'কি বলে?' রবিনও হাঁপিয়ে উঠছে।

'ব্যাটাদের মাথা,' জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে কিশোর। 'কিচ্ছু বুঝি না।'

'পালাতে পারব?'

'পারতে হবে।'

আরও ওপরে উঠে সরু একটা পথ পাওয়া গেল। ঝোপঝাড় নেই। খাড়াইও অনেক কম। গতি কিছুটা বাড়ল ওদের।

ছুটছে ওরা। সরে যাচ্ছে রকি বীচ থেকে দূরে, গথিক-বাড়ি, তাদের সাইকেল পেছনে পড়ছে, কিন্তু কিছু করার নেই। বাঁচতে চাইলে পালাতে হবে। ভারি হয়ে আসছে পা। পথের ওপর জোরাল হচ্ছে জুতোর আওয়াজ।

'ওহ্-ন্নো!' চেঁচিয়ে উঠে থমকে দাঁড়িয়ে গেল রবিন। তার প্রায় গায়ের ওপর এসে পড়ল কিশোর। আরেকটু হলেই দিয়েছিল ধাক্কা দিয়ে ফেলে।

হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে পথ। সামনে নিচে গভীর খাদ। মাঝখানে খানিকটা খালি, তারপরে আবার পাহাড় এবং পথ।

'পুল ছিল,' বলল রবিন। 'পাহাড়ী ঢলের সময় ভেঙেছে।'

ওপারে যাওয়া যাবে না। পাগলের মত এদিক ওদিক তাকাচ্ছে কিশোর। এক পাশে পাহাড়ের চূড়া দেখিয়ে বলল, 'চলো।'

বিপথে আবার ওপরে উঠতে শুরু করল ওরা। ধুলায় ধূসর চূড়া, রোদে তপ্ত হয়ে আছে। নিচে চিৎকার শোনা গেল। গোয়েন্দাদের দেখে ফেলেছে।

ফিরে তাকাল কিশোর। উঠে আসছে লোক দুজন। পাহাড়ে চড়ার অদ্ভুত ক্ষমতা। ঝোপ, পাথর, খাড়াই কোন কিছুকেই পরোয়া করছে না।

'আর পারব না ওদের সঙ্গে,' দাঁড়িয়ে গেল রবিন।

'থেমো না!'

ঘাড়ে যেন চাপড় মারছে কড়া রোদ। গরমে কটকট করছে শুকনো ডাল-

পাতা। ঘামে ভিজে গেছে ওদের শরীর। শুকনো চোখা ডাল হাত দিয়ে ঠেলে সরাতে হচ্ছে বার বার, রক্তাক্ত হয়ে গেছে তালু আর আঙুল।

অবশেষে পাহাড়ের কাঁধে পৌঁছল ওরা। লাল ধুলোমাটির ওপরেই ধপাস করে বসে পড়ল কিশোর, হাঁ করে হাঁপাচ্ছে, আরেকটু হলেই জিভ বেরিয়ে যাবে।

ফিরে তাকাল রবিন। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'আসছে!'

'আসুক!' গুঙিয়ে উঠল কিশোর, 'আর পারছি না!'।

কপালের কাছে হাত তুলে চোখ থেকে রোদ আড়াল করল রবিন। 'জানের ভয়ে ছুটছি আমরা, তা-ই পারছি না, আর ওদের কাণ্ড দেখো! এক্কেবারে পাহাড়ী ছাগল। এই কিশোর, ইয়াকুয়ালি না তো? দা ডেভিলস অভ দা ক্লিফস!'

কৌতূহল কিছুটা শক্তি ফিরিয়ে দিল কিশোরের দেহে। উঠে দাঁড়িয়ে তাকাল সে। 'হতেও পারে। এজন্যেই কথা বুঝি না। ইয়াকুয়ালি বলেই হয়তো।'

'এসকিমো ভাষা বলুকগে, আমার কিছু না, আমার এখন পালানো দরকার,' চঞ্চল হয়ে উঠল রবিন। 'যাই কোথায়? আচ্ছা, ডাংম্যানই আমাদের ধরতে পাঠাল না তো?'

'মনে হয় না,' দূরে পথিক-বাড়িটার দিকে তাকাল কিশোর। শান্ত। কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

'সাইকেলের কাছে যদি খালি ফিরতে পারতাম!'

'সামনে কোথায় যাব?' পাহাড়ের শূন্য কাঁধের দিকে তাকাল রবিন, শুকনো ঝোপ ছাড়া আর কিচ্ছু নেই। লুকানোর কোন জায়গায়ই চোখে পড়ছে না। দেখতে দেখতে হঠাৎ উজ্জ্বল হলো তার মুখ। 'কিশোর, পেয়েছি! এসো।'

কাঁধ ধরে ছুটতে শুরু করল রবিন। পেছনে কিশোর।

পাহাড়ের চূড়া ঘিরে রেখেছে কাঁধ। খানিকটা এগোতেই লোকগুলো আড়ালে পড়ে গেল। আরও পঞ্চাশ গজমত পেরিয়ে উল্টো দিকে মোড় নিল ওরা। নেমে যাওয়া পাহাড়ের ঢালে এখানে ওকের জঙ্গল শুরু হয়েছে, ঝোপও খুব ঘন।

'যাচ্ছি কোথায়?' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কিশোর।

'এখানেই।'

আচমকা শুরু হয়েছে সবুজ জঙ্গল, যেন একটা সবুজ দেয়াল। তাতে এসে প্রায় ঝাঁপ দিয়ে পড়ল রবিন, ঢুকে গেল বনে।

পেছনে ছুটছে কিশোর। হঠাৎ মাটি সরে গেল পায়ের তলা থেকে, মহাশূন্যে ঝাঁপ দিয়েছে যেন।

ময়দার বস্তার মত এসে ধাপ্পাস করে পড়ল সরু একটা গিরিখাতের তলায়। চারপাশে ঘন গাছের জঙ্গল। আগের রাতের ছড়ে যাওয়া হাঁটুতে নতুন করে চোট লাগল, ডলতে ডলতে উঠে বসল সে। তাকাল মাতালের মত।

'আগেই বলতে পারতে,' খসখসে কণ্ঠ, গলার ভেতরটা সিরিশ দিয়ে ঘষা হয়েছে যেন কিশোরের।

'সময় পেলাম কই?' পাশ থেকে বলল রবিন। 'তোমার মতই আমিও তো পড়েছি। একটা সাপকে লাঠি নিয়ে তাড়া করেছিলাম। যাক, ব্যাটারা আর খুঁজে

পাবে না।'

'কি জানি,' নিশ্চিন্ত হতে পারছে না কিশোর।

'শ্‌শ্‌শ্‌,' ঠোঁটে আঙুল রাখল রবিন।

হামাগুড়ি দিয়ে খাদের কিনারে সরে এল দুজনে। ঝোপে ঢুকল।

আস্তে করে ঝোপের ডালপাতা সরিয়ে ওপরে উঁকি দিল রবিন।

বড় জোর পঞ্চাশ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে লোকদুটো। কথা বলছে, একেক দিকে আঙুল তুলে দেখাচ্ছে, উত্তেজিত।

একেবারে শুয়ে পড়ল কিশোর। 'বুঝে গেছে, আমরা ধারে-কাছেই আছি।'

'কি করব এখন?'

'চুপ করে থাকব। আর কি করা?'

চুপ করে শুয়ে রইল দুজনে, কান খাড়া। লোকগুলোর কথা আর পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। অনিশ্চিতভাবে হাঁটাহাঁটি করছে ওরা, বোধহয় ঝোপের ভেতরে খুঁজছে। স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে কথা, কিন্তু এক বর্ণও বুঝতে পারছে না ছেলেরা।

ফিসফিসিয়ে বলল কিশোর, 'দেখে ফেলবেই, লুকিয়ে বাঁচতে পারব না।'

'না-ও দেখতে পারে। গিরিখাতটা বাইরে থেকে দেখা যায় না।'

'তাহলে আমাদের মতই পা ফসকে ভেতরে পড়বে। বেরোনোর পথ আছে? ওদের চোখ এড়িয়ে?'

এক মুহূর্ত ভাবল রবিন। 'বাঁয়ে গভীর আরেকটা খাদ আছে, গথিক-বাড়িটার পেছনে যে আরেকটা পথ আছে, তার কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে। এখান থেকে বেরিয়ে পঞ্চাশ ফুট খোলা জায়গা পেরোতে পারলেই খাদটায় গিয়ে নামতে পারব।'

'পঞ্চাশ ফুট, না?' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে শুরু করল কিশোর। দু-চোখের কোণে খাঁজগুলো গভীর হয়েছে। 'তাহলে ওদের নজর এড়ানোর অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। এমন কিছু, যাতে ওরা এসে এখানে নামে, ওই সময়ে খোলা জায়গা দিয়ে ছুটে যাব আমরা।'

'তাহলে ভেনট্রিলোকুইস্ট হতে হবে আমাদের,' তিক্ত কণ্ঠে বলল রবিন। 'খোলা জায়গায় গিয়ে এখানে আমাদের কথা ছুঁড়ে পাঠাতে হবে। এছাড়া আর কি করার আছে?'

'ঠিকই বলেছ!' ঝট করে সোজা হলো কিশোর।

'মানে? ভেনট্রির ভ্যা-ও জানি না আমরা। কথা ছুঁড়ব কিভাবে?'

'ইলেকট্রোনিক ভেনট্রিলোকুইস্টের সাহায্যে,' পকেট থেকে ওয়াকি-টকিটা বের করল কিশোর। 'তোমারটা আছে না? গুড। আমারটা ফেলে যাব এখানে। তোমারটা দিয়ে কথা পাঠাব এটাতে।'

'দারুণ!' এতক্ষণে হাসি ফুটল রবিনের মুখে। কথা শুনে এখানে ধরতে আসবে ওরা, ওই সুযোগে আমরা পগার পার। ওঠো, দেরি করছ কেন?'

ঝোপ থেকে বেরোল দুজনে।

ওয়াকি-টকিটা মাটিতে রেখে একটা পাথর চাপা দিয়ে রিসিভারের সুইচ অন

করে রাখল কিশোর। রবিনের যন্ত্রটা হাতে নিয়ে নিঃশব্দে হামাগুড়ি দিয়ে এগোল খাদের এক কিনারে, খোলা জায়গাটার দিকে।

'ওই যে একটা বড় গাছ দেখছ?' হাত তুলে দেখাল রবিন। 'তারপরেই।'

'শুরু হোক তাহলে,' হাসল কিশোর। ওয়াকি-টকি মুখের কাছে এনে জোরে বলল, 'রবিন, ওরা আসছে।' বলেই রবিনের মুখের কাছে ধরল যন্ত্র।

'আসুক। আমাদের দেখতে পাবে না।'

কান পেতে রয়েছে কিশোর, দূরের যন্ত্রটায় বেজে উঠেছে কথা, এখান থেকেও শোনা গেল মৃদু।

আরেকবার ওয়াকি-টকিতে কথা বলল দুজনে।

ঝোপঝাড় ভাঙার দুপদুপ আওয়াজ হলো।

'শুনেছে,' ফিসফিস করল রবিন। 'খুঁজতে যাচ্ছে।'

'ছোটো,' বলেই লাফ দিয়ে উঠে ছুটতে শুরু করল কিশোর।

মাথা নিচু করে এক দৌড়ে বড় গাছটা ছাড়িয়ে এল দুজনে। ফিরে তাকাল একবার। লোকগুলোকে দেখা যাচ্ছে না।

খাদের ধারে চলে এল ওরা। বেশি গভীর নয়। আসলে চওড়া একটা ফাটল, লম্বা, এঁকেবেঁকে চলে গেছে অনেকটা গিরিপথের মত হয়ে।

তাতে লাফিয়ে নামল দুজনে।

ঢাল বেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে নামল গথিক-বাড়ির পেছনের পথে। লোক দুটোর দেখা নেই।

'চলো, গিয়ে ডাংম্যানকে লোকগুলোর কথা জানাই,' পরামর্শ দিল কিশোর।

দ্রুত বাড়ির কোণ ঘুরে সামনে সদর দরজার কাছে চলে এল ওরা। বেল বাজাল কিশোর।

অপেক্ষা করেও সাড়া পাওয়া গেল না।

আবার বেল বাজাল।

সাড়া নেই।

দরজার নব মোচড় দিয়ে দেখল, খুলল না, তালা লাগানো।

দরজার পাশে একটা জানালা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিল কিশোর। লোক দেখা যাচ্ছে না।

'এস্টেটে চলে গেছে হয়তো,' রবিন বলল।

'তা-ই হবে। চলো, ভাগি।'

এগারো

ওত পেতেই ছিলেন মেরিচাচী, রবিন আর কিশোরকে ঢুকতে দেখেই পাকড়াও করলেন।

ওয়ার্কশপের দেয়ালে সাইকেল হেলান দিয়ে রাখল দুই গোয়েন্দা। গোপন পথ দিয়ে ঢুকেও রেহাই মিলল না।

'কিশোর, কই গিয়েছিলি? সেই কখন থেকে বসে আছে তোর চাচা। এস্টেটে যাবি না?'

'যাব, চাচী। তুমি যাও, আমি এক্ষুণি আসছি।'

'তাড়াতাড়ি আয়,' বলে অফিসের দিকে চলে গেলেন মেরিচাচী।

দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে হেডকোয়ার্টারে ঢুকল দুই গোয়েন্দা।

দেখেই হাঁ হাঁ করে উঠল মুসা। 'কি ব্যাপার, লাইন কাটলে কেন? জরুরী খবর ছিল; দুটো ছেলে লা পামা স্ট্রীটে গাড়িটা দেখেছে। লোক দুটোকেও। খানিক পর আবার ফোন করে বলল, লোকগুলো নাকি দুই জন কিশোরকে তাড়া করেছে।'

'জানি,' মুখ বাঁকাল রবিন। 'আমরাই।'

সংক্ষেপে সব বলল কিশোর।

'খাইছে!' শুনে চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'বড় বাঁচা বেঁচেছ।'

'এখন কথা হলো,' বলল কিশোর, 'গথিক-বাড়িটার কাছে ঘোরাঘুরি করেছে কেন ওই দুজন? ডাংম্যানকে আবার আক্রমণ করার সুযোগ খুঁজছে? এস্টেটে গিয়ে হুঁশিয়ার করব।'

'তোমরা যাওয়ার আগেই যদি আবার অফিসে ফিরে যায়?' রবিন বলল।

'যেতে পারে। সেজন্যেই তোমাদের গিয়ে ওখানে বসে থাকা দরকার।'

'আমি এখন পারব না,' সাফ মানা করল মুসা। 'পেটে আগুন জ্বলছে।

'আমারও,' রবিন বলল।

'তাহলে লাঞ্চ সেরেই যাও। লোক দুটো এলে ওদের ওপরও চোখ রাখবে।'

'কিন্তু কিশোর, এইমাত্র ওদের হাত থেকে বেঁচে ফিরলাম। আবার দেখলে...'

'আর কোন উপায় নেই,' চিন্তিত শোনাল গোয়েন্দাপ্রধানের কণ্ঠ। 'ওদের ওপর চোখ রাখলে মূল্যবান সূত্র পাওয়ার আশা আছে। খুব সাবধানে। তোমাদের যেন দেখে না ফেলে।'

'সেটা আর বলে দিতে হবে না,' কাজটা বিশেষ পছন্দ হচ্ছে না মুসার।

'কি ভাবছ?' কিশোরকে জিজ্ঞেস করল রবিন। 'ওরা সত্যি ইয়াকুয়ালি?'

'তাই তো মনে হয়। কোনভাবে হয়তো চাম্যাশ হোর্ডের খবর জেনেছে। আমার ধারণা, ম্যাগনাস ভারদির মেসেজের মানে ওরা বুঝতে পারবে।'

জিভ দিয়ে বিচিত্র শব্দ করল মুসা। 'ইস্, আমরাও যদি পারতাম।'

'হ্যাঁ, পারলে ভাল হত,' একমত হলো কিশোর। 'ইন দা আই অভ দা স্কাই হোয়্যার নো ম্যান ক্যান ফাইণ্ড ইট, কথাটার মধ্যেই রয়েছে জবাব। দেখি, পরে ভেবে মানে বোঝার চেষ্টা করব।'

মেরিচাচীর ডাক শোনা গেল। 'কিশোর? কি হলো? আবার গিয়ে ঢুকেছিস?'

'যা বললাম, মনে থাকে যেন,' তাড়াতাড়ি বলল কিশোর। 'ডাংম্যানকে হুঁশিয়ার করবে। লোকগুলো এলে তাদের ওপর চোখ রাখবে, বাড়িটার কাছে ঘুরঘুর করছে কেন, বোঝার চেষ্টা করবে। আমি যাই।'

রবিন আর মুসা দুজনেই মাথা নাড়ল।

বেরিয়ে এল কিশোর।

বড় ট্রাকটা বের করা হয়েছে। ড্রাইভিং সিটে বোরিস, তার পাশে

রাদেশচাচা।

রকি বীচ থেকে বেরিয়ে এসেছে ট্রাক। আঁকাবাঁকা গিরিপথ ধরে ছুটছে। এস্টেটে পৌঁছতে বেশিক্ষণ লাগল না।

গেট খোলা। ট্রাক নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল বোরিস। ভাঁড়ারের কাছে এসে থামল।

কেবিন থেকে লাফ দিয়ে নামল কিশোর। তার পরেই রাশেদ পাশা। উত্তেজিত দেখাচ্ছে। পুরানো মাল কিনতে এলে ওরকম হয় তাঁর। জঞ্জালের ভেতর থেকে পছন্দসই জিনিস খুঁজে বের করতে ভাল লাগে।

বড় বাড়িটা থেকে বেরোলেন মিস পেদ্রো। হাসিমুখে এগিয়ে এলেন। 'আপনিই মিস্টার প্যাশা। খুশি হলাম। আপনার ভাতিজা তো কাল পছন্দ করে গেছে। দেখুন আপনার পছন্দ হয় কিনা। অনেক দিন পড়ে ছিল, অনেক জিনিসই নষ্ট হয়ে গেছে।'

'কিশোরের পছন্দ হলে আমারও হবে,' আশ্বাস দিলেন রাশেদ পাশা। মস্ত গোঁফে পাক দিলেন। 'সত্যি বিক্রি করবেন তো? দাম তেমন না পেলেও?'

'আমি তো ফেলেই দিতে চেয়েছিলাম। টনি বোঝাল, যা পাওয়া যায় তাই লাভ। ভেবে দেখলাম, ঠিকই বলেছে। আজকাল তো একটা সুতোও পয়সা ছাড়া মেলে না। টনি এসে আমার সব ওলট-পালট করে দিচ্ছে। ভাবছি, আবার ঠিকঠাক করে নেব এস্টেটটা।'

'যাই, মাল দেখি,' বললেন রাশেদ পাশা। 'আপনি আসবেন?'

'চলুন,' হেসে বললেন মিস পেদ্রো।

সবার পেছনে রইল কিশোর। রাশেদচাচাকে নিয়ে মিস পেদ্রো ভাঁড়ারে ঢুকলেন, পেছনে গেল বোরিস। ব্যস, চোখের পলকে ঘুরে বাড়ির দিকে ছুটল কিশোর।

দেখা হয়ে গেল টনির সঙ্গে। 'কিছু তদন্ত করতে এসেছ?'

'তদন্ত ঠিক নয়,' বলল কিশোর। 'আসলে, মিস্টার ডাংম্যানের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

'লাইব্রেরিতে।' কিশোরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল টনি।

খবরের কাগজ পড়ছিল ডাংম্যান। কিশোরকে দেখে প্রায় ছুটে এল। 'কাল রাতে তোমরা এসেছিলে, টনি বলেছে আমাকে। তোমাদের চোর ভেবেছি, কিছু মনে রেখো না। লোভ দেখিয়ে পুতুলটা তোমাদের কাছ থেকে বের করার জন্যেই পুরস্কার ঘোষণা করেছে।'

'বুঝতে পেরেছি, স্যার,' শান্ত কণ্ঠে বলল কিশোর।

'গুড। ঠিক করে বলো তো, পুতুলটা কি হয়েছে?'

পুতুলটা কি ভাবে পেয়েছে মুসা আর রবিন, সেখান থেকে শুরু করল কিশোর।

চুপচাপ শুনছে ডাংম্যান, মাঝে মাঝে ভ্রুকুটি করছে শুধু।

ভূতুড়ে হাসির কথা কিশোর বলতেই চেঁচিয়ে উঠল টনি, 'একটা ছায়া তো? পাগলের মত হাসে? আমিও শুনেছি কাল রাতে। অদ্ভুত হাসি।'

টনির কথায় কান দিল না ডাংম্যান। 'ঠিক শুনেছ তো, কিশোর? মানে,

বাতাসের শব্দ-টব্দ হয়? কিংবা কল্পনা?'

'না। এই এস্টেটের মধ্যেই রয়েছে কোথাও ভূতটা। কয়েকজনকে বন্দী করে রেখেছে।'

'বন্দী? কি বলছ!' চোখমুখ বিকৃত করে ফেলেছে টনি।

'কে কাকে বন্দী করল। কি বলছ, কিছুই তো বুঝছি না। কেন এসব করবে?'

'চাম্যাশ হোর্ডের জন্যে। আমি শিওর।'

'কী?'

'গুপ্তধন। সোনার স্তূপ!' খুলে বলল কিশোর।

'আই সী,' বিড়বিড় করল ডাংম্যান। 'বিশ্বাস করা শক্ত। তাহলে তোমার বিশ্বাস, ডাকাতেরা ওই সোনার পিছে লেগেছে? বিপদের কথা। কয়েকটা বাচ্চাকে ঢোকালাম এসবের মধ্যে।'

'কোডটা আরেকবার বলবে, কিশোর?' অনুরোধ করল টনি।

'ইন দা আই অভ দা স্কাই হোয়্যার নো ম্যান ক্যান ফাইণ্ড ইট।'

'মানে কি?' হাত ওল্টাল টনি। 'আর এর সঙ্গে পুতুলের কি সম্পর্ক? আর ওই যে বললে, এস্টেটে কাদেরকে নাকি বন্দী করে রাখা হয়েছে?'

জবাব দিতে গিয়েও থেমে গেল কিশোর। মিস পেদ্রো ডাকছেন।

'টনি? দেখে যা তো। কোথায় গেলি?'

সাড়া দিয়ে বেরিয়ে গেল টনি।

'হাসি আমিও শুনেছি, স্যার, নিজের কানে,' বলল কিশোর। 'আর পুতুলের সঙ্গে সম্পর্ক হলো, মেসেজ। ভেতরে একটা মেসেজ ছিল। আমি নিজে খুলেছি।'

মেসেজ? পুতুলের ভেতর?' অবাক মনে হলো ডাংম্যানকে।

'বোধহয় সাহায্যের আবেদন। ওই বন্দিদেরই কেউ লিখেছে।'

'পুলিশকে জানিয়েছ?' গম্ভীর হলো ডাংম্যান।

'না। গিয়ে কি বলব? পুলিশকে বিশ্বাস করাতে হলে প্রমাণ দরকার।'

'হুঁ,' কিছু ভাবল ডাংম্যান। 'তুমি কখনও দেখেছ ছায়াটা?'

'কাল রাতে। টনির সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে,' *টনির* ওপর জোর দিল কিশোর। 'চারটে বেঁটে লোক দেখেছি, মাথা ছিল না।'

'পাগল হয়ে গেল নাকি!'

'ছিল না, মানে দেখা যাচ্ছিল না। বোধহয় চটের বস্তা দিয়ে ঢেকে দিয়েছিল।'

'কী?' চেঁচিয়ে উঠল ডাংম্যান। 'চারজন বন্দী? এই এস্টেটের মধ্যে? মিস পেদ্রোর এলাকায়? তা কি করে হয়?'

হাসল কিশোর। 'হয়েছে বলেই তো বলছি, স্যার। বন্দীদের রাখা হয়েছে একটা হানটিং লজে।' চট করে দরজার দিকে তাকাল একবার সে, স্বর খাদে নামিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'টনিকে কতদিন ধরে চেনেন?'

'টনি? বেশি দিন না তো,' চোখ মিটমিট করছে ডাংম্যান। 'কেন? তাকে সন্দেহ করছ?'

হ্যাঁ-না কিছুই বলল না কিশোর, শুধু হাসল।

ঘুরল ডাংম্যান। লম্বা পায়ে ড্রেস্কের কাছে গিয়ে টান দিয়ে ড্রয়ার খুলল। আবার

যখন ফিরল, তার হাতে একটা পিস্তল।

বারো

কঠিন হয়ে উঠেছে ডাংম্যানের চেহারা। শক্ত করে ধরে রেখেছে পিস্তল। বুনো পথ ধরে কিশোরের পিছু পিছু প্রায় ছুটে চলেছে শিকারীর বাংলোটার দিকে।

'তোমার ধারণা,' বলল ডাংম্যান, 'যারা পুতুল ছিনিয়ে নিয়েছে, তারাই আমাকে আক্রমণ করেছিল? তোমাদেরও তাড়া করেছিল?'

'কোন সন্দেহ নেই।'

'তাহলে ওরাই চারজনকে বন্দী করে রেখেছে। হুঁশিয়ার। বোঝা যাচ্ছে, লোক মোটেই সুবিধের না ওরা।'

'এতক্ষণ ওখানে আছে কিনা কে জানে। বিশেষ করে, ছায়াটা।'

'গেলেই দেখা যাবে। আমার মনে হয় না দুটো ছেলের ভয়ে পালাবে। কি করছে ওরা আসলে?'

'জানি না,' স্বীকার করল কিশোর। 'যাদেরকে ধরে এনেছে, তারা হয়তো জানে গুপ্তধন কোথায় আছে। চাপ দিয়ে ওদের মুখ খোলাতে চাইছে হয়তো ভূতুড়ে ছায়ার মালিক।'

'হ্যাঁ, এটা হতে পারে। দেখি, হাতে-নাতে ধরতে পারি কিনা।'

ঘন বনের ভেতর দিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে ওরা। বাটি-আকৃতির উপত্যকার কাছে চলে এল। বাংলোর সামনে ট্রাকটা নেই। রাতের মতই দিনেও রহস্যময় দেখাচ্ছে বাড়িটা।

গাছের আড়ালে কিশোরকে চুপ করে বসে থাকার নির্দেশ দিল ডাংম্যান। গাছপালা আড়ালে আড়ালে নেমে যেতে শুরু করল ঢাল বেয়ে।

বাংলোটার দিকে চেয়ে আছে কিশোর। নির্জন, কোন সাড়া-শব্দ নেই। জানালাগুলোর খড়খড়ি খোলা, সামনের দরজাটাও। দেখে তার দৃঢ় ধারণা হলো, ভেতরে কেউ নেই।

কোন রকম ঝুঁকি নিল না ডাংম্যান। মাথা নিচু করে নিঃশব্দে পৌঁছে গেল উপত্যকার খোলা জায়গাটার ধারে। এক মুহূর্ত থেমে বাড়িটা দেখল। ডেকে বলতে চাইল কিশোর, গিয়ে লাভ হবে না। কিন্তু সে মুখ খোলার আগেই মাথা নিচু করে দৌড় দিল ডাংম্যান। হাতে উদ্যত পিস্তল।

জানালায় গিয়ে উঁকি দিল ডাংম্যান। ঘুরে চলে গেল খোলা দরজার কাছে। ভেতরে ঢুকল।

বসে আছে কিশোর। বাংলোর ভেতর থেকে খুটখাট আর নানা রকম শব্দ কানে আসছে। তারপর দরজায় বেরোল ডাংম্যান। হাতের ইশারায় কিশোরকে ডাকল।

উঠে দৌড় দিল কিশোর।

'খালি,' বলল নিরামিষভোজী। 'কেউ নেই। তবে ছিল, দেখো।'

ছোট একটা পামাজা দেখাল সে, সাদা কাপড়। এ-রকম কাপড়ই পরে ছিল ওই

বাদামী-চামড়ার লোক দুটো, যারা পুতুল ছিনিয়ে নিয়েছে, কিশোর আর রবিনকে পাহাড়ে তাড়া করেছে।

'ইনডিয়ান পোশাকের মত লাগছে,' বলল ডাংম্যান। 'তোমার বাদামীরা এখানে এসেছিল মনে হচ্ছে। ট্রাকটাও ঠিকই দেখেছ। পথে তেলের দাগ দেখেছি। শুকিয়ে গেছে। তারমানে ট্রাকটা গেছে যে, অনেকক্ষণ।'

'কোথায় গেছে আন্দাজ করতে পারেন?'

'কি করে বলি? চলো, আরেকবার দেখি। কিছু বোঝো কিনা দেখো।'

বাংলোয় ঢুকল দুজনে।

খুঁটিয়ে দেখছে কিশোর। তাড়াহুড়ো করে পালিয়েছে লোকগুলো। মদের খালি বোতল পড়ে আছে টেবিলে। প্লেটের অবশিষ্ট খাবার শুকিয়ে মড়মড়ে হয়ে গেছে। সব কিছু নোংরা। কিন্তু ওসব দেখে লোকগুলো কোথায় গেছে অনুমান করার উপায় নেই।

'নাহ্, এখানে কিছু নেই,' বলল সে। 'এস্টেটের অন্য কোথাও গিয়ে লুকিয়েছে হয়তো।'

'তাহলে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। অনেক বড় এলাকা এটা, পাহাড়-পর্বতের মধ্যে লুকালে কে খুঁজে বের করবে? তবে ওদের প্ল্যান বরবাদ করে দিয়েছ তুমি। ভয় পেয়ে পালিয়েছে।'

'আমার মনে হয় না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'এত সহজে ভয় পাওয়ার লোক ওরা নয়। আজও আমাকে আর রবিনকে তাড়া করেছিল, আপনার অফিস থেকে বেরোনোর পর।'

'তাড়া করেছিল? আমার বাড়ির কাছে?' বিশ্বাস করতে পারছে না যেন ডাংম্যান। 'আর কি চায় তোমাদের কাছে?'

'আমাদের কাছে চায় না, চায় আপনার কাছে।'

'আমার কাছে? আমার কাছে কি চায়?'

'হয়তো কিছু আছে। আমাদের কাছ থেকে পুতুলটা ছিনিয়ে নেয়ার পর আপনাকে আক্রমণ করেছিল। তারপর আমরা আপনার বাড়ি থেকে বেরোলে তাড়া করল আমাদেরকে। হয়তো ভেবেছে, জিনিসটা আমাদেরকে দিয়েছেন আপনি।'

'আ-আমি···কি জিনিস! ও হ্যাঁ হ্যাঁ,' চেঁচিয়ে উঠল ডাংম্যান। 'আছে আরেকটা পুতুল। অফিসে নিয়ে রেখেছি। একটা পুতুল চুরি হওয়ার পর ঘাবড়ে গেলেন মিস পেদ্রো, আরেকটাও চুরি হতে পারে। আমিই পরামর্শ দিয়েছি, আমার কাছে নিয়ে রাখার জন্যে, নিরাপদে থাকবে। কি ভুলো মন আমার, ভুলেই গিয়েছিলাম। ওই পুতুলটাও চায় হয়তো ব্যাটারা।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'দুটো পুতুল এক করলে হয়তো গুপ্তধনের খোঁজ মিলবে, সে-জন্যে চায়।'

'হ্যাঁ, হতে পারে। কিন্তু জানল কি করে, আরেকটা পুতুল আমার কাছে?'

'আপনাকে নিতে দেখেছে হয়তো।'

'অসম্ভব। বাক্সে ভরে পকেটে ঢুকিয়ে তারপর বেরিয়েছি। অফিসে লুকিয়ে রাখার আগেও আশেপাশে ভালমত দেখে নিয়েছি, কেউ ছিল না।'

'আপনার সহকারীরাও না?'
'না। আর ওরা দেখলেও কিছু হত না, খুব বিশ্বাসী অনেকদিন ধরে আছে আমার সঙ্গে, আমাকে গুরু মানে।
নিচের ঠোঁট কামড়ালো কিশোর। 'মিস পেদ্রো জানেন…'
'তাতে কি?' বাধা দিল ডাংম্যান। 'উনি চোরের সঙ্গে হাত মেলাননি। আর গুপ্তধন চাইলে আগেও তো অনেক সুযোগ ছিল, দুটো পুতুলই অনেক বছর ছিল তাঁর কাছে। শুধু মিস পেদ্রো আর টনি…'
'টনি!' ডাংম্যানের কথায়ও বাধা দিল কিশোর। 'সে-ও তো জানে।'
হাঁ হয়ে গেল ডাংম্যানের মুখ, চোয়াল ঝুলে পড়ল, ধীরে ধীরে আবার বন্ধ হলো ফাঁক। 'কিশোর…মিস পেদ্রো…টনি কোন কিছুতে জড়ালে বেচারী খুবই দুঃখ পাবেন, শেষ হয়ে যাবেন!'
'রবিন আর মুসা যখন পুতুলটা পায়, টনি তখন গেটের কাছে ছিল। গতরাতেও অন্ধকারে এস্টেটের মধ্যে ঘুরঘুর করছিল। কতদিন থেকে চেনেন ওকে, মিস্টার ডাংম্যান?'
'খুব বেশি দিন না। ইংল্যাণ্ডে পরিচয় হয়েছে, এখানে আসার জন্যে রওনা হয়েছে তখন সে। আমিও লস অ্যাঞ্জেলেসে আসছিলাম। টনিই বলেছে, তার দাদী নিরামিষভোজী, অনেক আগে থেকেই। তাই প্রথমেই এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম,' থামল ডাংম্যান। গম্ভীর। 'চলো, টনির সঙ্গে কথা বলা দরকার। তার দাদীকে পরে জানাব।'
বুনো পথ ধরে ফিরে চলল আবার দুজনে। খুব জোরে ছুটতে পারে লোকটা, তাল রাখতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে কিশোর।
ট্রাকে মাল বোঝাই শেষ হয়নি। গলদঘর্ম হয়ে উঠেছেন রাশেদ পাশা আর বোরিস। 'কোথায় গিয়েছিলি?' জিজ্ঞেস করলেন রাশেদ পাশা।
'এই, একটু ঘুরে দেখতে,' বলে কিশোরও এসে হাত লাগাল। তবে কাজে বিশেষ মন নেই, বার বার তাকাচ্ছে বাড়ির সদর দরজার দিকে। ডাংম্যান গেছে টনির সঙ্গে কথা বলতে, কেউই বেরোচ্ছে না।
অবশেষে বেরোল ডাংম্যান। কাছে এসে বলল, 'টনি গাড়ি নিয়ে কোথায় যেন গেছে। আমি অফিসে যাচ্ছি।'
'টনি আপনার অফিসে গেলে চোখে পড়বে,' জানাল কিশোর। 'রবিন আর মুসা আছে ওখানে।'
বরফ হয়ে গেল যেন ডাংম্যান। 'কী?'
'লোকদুটোর ওপর চোখ রাখতে পাঠিয়েছি ওদের।'
'কিশোর।' চেঁচিয়ে উঠল নিরামিষভোজী, চেহারা ফ্যাকাসে, 'আমার সেফে আরেকটা পুতুল রয়েছে। ভীষণ বিপদে পড়বে ওরা। এখুনি যাচ্ছি আমি। তোমার চাচার বোধহয় হয়ে গেল। রকি বীচে ফিরেই পুলিশের কাছে যাবে।'
গাড়ির দিকে ছুটল ডাংম্যান।

তেরো

লাঞ্চ শেষে ইয়ার্ডে ফিরে হেডকোয়ার্টারে ঢুকল আবার রবিন আর মুসা। ফোন-ধরার যন্ত্রটা দেখল। না, কোন মেসেজ কোড করা নেই, কেউ ফোন করেনি তাদের অবর্তমানে। বেরিয়ে এসে 'ভেজিট্যারিয়ান লীগ'-এ রওনা হলো দুজনে।

খুব সতর্ক রয়েছে ওরা। লোক দুটোকে চোখে পড়ল না। কোন নড়াচড়া, কোন রকম সাড়া নেই গথিক-বাড়িটার ভেতরে বাইরে। ডাংম্যানের গাড়িটা নেই। সদর দরজা তালাবন্ধ।

'এস্টেটে গেছে,' অনুমান করল মুসা।

'তাহলে কিশোরের সঙ্গে দেখা হবে। আমরা এখানেই থাকি। লোকগুলো আসতে পারে।'

ভেজিট্যারিয়ান লীগের উল্টোধারে দুটো বাড়ির মাঝে সরু একটা গলি। ওখানে সাইকেল রেখে ঘাপটি মেরে থাকবে ঠিক করল দুই গোয়েন্দা। তা-ই করল। রুক্ষ পাহাড়ের দিকে চোখ। গরম রোদ পাঁউরুটির মত সেঁকছে যেন পাহাড়টাকে, বাতাসে বাষ্পের অদ্ভুত ঝিলিমিলি। অনেক ওপরে ডানা মেলে ভাসছে একটা গলাছেলা ধাড়ী শকুন, পাক দিয়ে দিয়ে ঘুরছে।

কুৎসিত পাখিটাকে দেখে অস্বস্তিতে ভরে গেছে মুসা আমানের মন। 'আমাদের কথা ভাবছে না তো ইবলিস পাখিটা?'

'গালাগাল করছ কেন? খুব ভাল পাখি ওরা,' প্রতিবাদ করল রবিন। 'পচা-গলা খেয়ে সাফ করে, জায়গা পরিষ্কার রাখে।'

'সে-জন্যেই তো ভয়। আমিও তো পচতে পারি। আমি মরি, সেই দোয়া করছে কিনা এখন কে জানে? শকুনের দোয়ায় গরু মরে না মরে না করেও তো অনেক মরে।'

কেমন যেন শুকনো, জমাট নীরবতা। গত এক ঘণ্টায় একটা গাড়িও যায়নি গরম সড়কটা ধরে। চুপ করে বসে থাকা আর সইল না মুসার, হাতের কাছে কয়েকটা ছোট পাথর দেখে ওগুলো নিয়ে খেলতে শুরু করল। আরও খানিক পর পা সোজা করল। ঝিঁ ঝিঁ ধরে গেছে। গুঙিয়ে উঠল, 'গোয়েন্দাগিরির এই একটা ব্যাপার মোটেই ভাল্লাগে না আমার। বসে থাকা আর থাকা।'

'কিশোর তো বলে খুব জরুরী কাজের একটা এটা, গোয়েন্দাদের জন্যে। কখনও কখনও এক জায়গায় হপ্তার পর হপ্তা নাকি কাটাতে হয়।'

'ওরকম বসে থাকার গোয়েন্দা হতে আমি চাই না, থ্যাংকু,' হাত নাড়ল মুসা। 'চোরা-ব্যাটারা আবার এখানে আসবে এ-ধারণা হলো কেন কিশোরের?'

'মনে হয়, ডাংম্যানের বাড়িতে এমন কিছু আছে, ওরা নিতে চায়। গুপ্তধনের কোন সূত্র-টুত্র হতে পারে।'

'মারছে! তাই নাকি?' আবার গুঙিয়ে উঠল মুসা, দ্রুত তাকাল এদিক ওদিক। 'তাহলে তো আসবেই।'

'হ্যাঁ। আর সে-কারণেই চোখ রাখাটা জরুরী।'

হঠাৎ, পথের ওপার থেকেই বোধহয়, ভেসে এল চাপা চিৎকার। 'এ-ভাই, কেউ আছ?'

মৃদু কণ্ঠ, কিন্তু তপ্ত দুপুরের এই নীরবতায় স্পষ্ট বোঝা গেল কথা।

'এই কেউ আছ? বাঁচাও!' আবার এল সাহায্যের আবেদন।

'বাড়িটার মধ্যে,' ফিসফিস করে বলল মুসা। 'ওদিকে।' ভেজিট্যারিয়ান লীগের পেছনে দিক দেখাল।

'ডাংম্যানকে আটকে রাখেনি তো?' রবিনের সন্দেহ, 'চোরেরা?'

দ্বিধা করছে দুই গোয়েন্দা। যাবে? চোরেরা কাছেপিঠে নেই তো? তাহলে বেরিয়ে পড়বে মহাবিপদে। কিন্তু অসহায় লোকটাকে সাহায্য করাও দরকার।

'কি করি?' বুঝতে পারছে না মুসা।

'গিয়ে দেখা উচিত। তবে হুঁশিয়ার থাকতে হবে। বিপদ দেখলেই যাতে পালাতে পারি।'

সাবধানে ছুটে নির্জন শূন্য পথটা পেরোল ওরা। সদর দরজা বন্ধ, তাই ওদিকে গেলই না, ঘুরে সোজা চলে এল পেছনে। পেছনের দরজা দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করবে।

নবে মোচড় দিয়েই বলে উঠল মুসা, 'খোলা।' ঠেলে পাল্লা খুলে পা রাখল অন্ধকার চওড়া একটা গলিতে।

রান্নাঘরে এসে ঢুকল ওরা। কেউ নেই। সেখান থেকে বেরিয়ে বাড়ির পেছনের ছোট একটা হলঘরে ঢুকল, জিনিসপত্র সব এলোমেলো। ঠাণ্ডা, আবছা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কান পাতলো শোনার জন্যে।

'কই, কিছুই শুনছি না,' ফিসফিসিয়ে বলল রবিন।

'কিন্তু এদিক থেকেই শব্দ হয়েছে। চলো তো, অফিসে দেখি।'

সাবধানে দোর খুলল মুসা। ভেতরে উঁকি দিল। নীরব, নির্জন।

আলমারীর দরজার মত একটা দরজার দিকে ইশারা করল রবিন। পা টিপে টিপে সেটার কাছে এসে তাতে কান রাখল দুজনে। ওপাশের শব্দ শোনার চেষ্টা করছে।

কিন্তু পুরো এক মিনিট দাঁড়িয়ে থেকেও কিছু শোনা গেল না।

আস্তে করে গিয়ে ডাংম্যানের টেবিল থেকে বড় একটা পেপারওয়েট তুলে নিয়ে এল মুসা। চোখের ইশারায় দরজা খুলতে বলল রবিনকে।

হ্যাচকা টানে পাল্লা খুলে ফেলল রবিন। কিন্তু কারও মাথায় পাথরটা বসানোর সুযোগ হলো না মুসার। ভেবেছিল ওপাশে ঘর আছে, নেই। আসলেই ওটা আলমারী, দেয়াল আলমারী। শূন্য।

'এদিকেই কোথাও থেকে হয়েছে,' আবার বলল মুসা।

'এমন জায়গায় আছে লোকটা, যেখানে বাতাস ঢোকে না। বেহুঁশ হয়ে যেতে পারে।'

'তা পারে। তাড়াতাড়ি করা দরকার।'

নিচতলার সব কটা ঘর খুঁজল ওরা। নেই। দোতলায় উঠল। তিনটে ছোট ছোট ঘরের পার্টিশন সরিয়ে বড় একটা বৈঠক-ঘর করা হয়েছে। এক কিনারে একটা

মঞ্চ। ওতে উঠেই ভাষণ দেয় ডাংম্যান, বোঝা গেল, ওখানেই আক্রান্ত হয়েছিল।
'তোমরা এসেছ? বাঁচাও!' শোনা গেল আবার চিৎকার। মাথার ওপরে।
চেঁচিয়ে উঠল রবিন, 'তেতলায়।'
'এসো,' সিঁড়ির দিকে দৌড় দিয়েছে মুসা।
তেতলায় আলো খুব সামান্য। জানালার সমস্ত খড়খড়ি নামাল। ধুলোর পুরু আস্তরণ সব কিছুতে। এক ধারে কতগুলো তক্তা পড়ে আছে, তাতেও ধুলো। কয়েকটা দরজা, পাল্লা খোলা, সব কটা থেকে করিডর চলে গেছে দিকে দিকে।
চুপচাপ দাঁড়িয়ে কান পেতে রয়েছে ছেলেরা।
হঠাৎ এলোমেলো করাঘাতের শব্দ হলো একটা করিডরের শেষ মাথায়। বড় একটা তক্তা তুলে নিয়ে দৌড় দিল মুসা, পেছনে রবিন। আরেকটা দরজা, তারপরে আরেকটা ঘর। খালি।
আবার দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা। শব্দের আশায় কান পাতল।
দূরের দরজাটা আগে চোখে পড়ল রবিনের, ঘরের উল্টোধারে। 'মুসা, ওখানে।'
মাথা নুইয়ে সায় জানিয়ে এগোল মুসা।
দরজার নব ধরে মোচড় দিল রবিন। তক্তা তুলে তৈরি রয়েছে মুসা।
'তালা দেয়া,' জানাল রবিন। 'ভাঙা যাবে?'
দড়াম করে তাদের পেছনে দরজার পাল্লা বন্ধ হলো, যেটা দিয়ে ঢুকেছিল। চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরল দুজনে, চোখ কোটর থেকে ছিটকে বেরোনোর অবস্থা। তক্তা মাথার ওপর তুলে ফেলেছে মুসা। কিন্তু বাড়ি মারার জন্যে কাউকে পেল না। শুধু, খোলা ছিল দরজাটা, এখন বন্ধ।
কিট করে দরজার বাইরে একটা শব্দ হলো।
'মুসা!' চেঁচিয়ে উঠল রবিন। 'তালা লাগিয়ে দিয়েছে।'
হা-হা করে হেসে উঠল কেউ ওপাশে। 'নিজেদেরকে খুব চালাক ভাবো, না মিয়ারা?' আবার হাসি। পরিষ্কার চেনা যাচ্ছে এখন গলা। টেরিয়ার ডয়েল।
দরজার কাছে ছুটে গেল দুই গোয়েন্দা। বন্ধ। ধাক্কা দিল মুসা, লাথি মারল. নাড়লও না পাল্লা।
'শুঁটকি, জলদি দরজা খোলো!' চেঁচাল রবিন।
'জলদি,' হুমকি দিল মুসা, 'নইলে বেরিয়ে দেখাব মজা।'
'বেরোতে তো হবে আগে,' ওপাশ থেকে বলল টেরিয়ার। 'তারপর না মজা দেখানো। আমি যাচ্ছি, বুঝেছ? গরম তো টেরই পাচ্ছ। ঘাম শুকাও। ইস্, হোমসের বাচ্চাটাকে পেলাম না,' আফসোস করল সে। 'ওটাকে শিক্ষা দেয়ার বেশি ইচ্ছা ছিল।'
'কিশোর তোমার মত গর্দভ নাকি?' রেগে গেল রবিন। 'তোমার মত শুঁটকি?'
'চুপ!' ধমক দিল টেরিয়ার। তার চেয়ে কিশোরের বুদ্ধি বেশি এটা কেউ বললেই তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে সে। 'তোমরা গাধারা যে কি বিপদে পড়েছ, বুঝতে পারছ আশা করি?'
'বিপদে পড়বি ব্যাটা তুই,' রাগে কাঁপছে মুসা। 'ভেবেছিস কি...'

'কি ভেবেছি?' হাসি হাসি গলায় জবাব দিল টেরিয়ার, 'বলছি, শোনো। একজন ভদ্রলোকের বাড়ি চোরের হাত থেকে বাঁচিয়েছি। দুটো চোরকেই আটকেছি। এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, বাড়ির ভেতরে শব্দ শুনে সন্দেহ হলো। ঢুকে দেখি দুটো ছিঁচকে চোর।'

'পাগল!' রবিন বলল। 'শুঁটকি যে শুঁটকিই। কে বিশ্বাস করবে তোমার কথা?'

'সবাই করবে,' খিকখিক করে হাসল টেরিয়ার। 'সামনের দরজায় তালা। পেছনের দরজা তাহলে কে খুলল? তোমরা। নাহলে ঢুকলে কিভাবে?' আবার হাসল সে। 'টনি পেদ্রো তোমাদের কথা বলার পর থেকেই চোখ রাখছিলাম ময়লার ডিপোটার ওপর। আজ বাচ্চা হোমসকে সঙ্গে নিয়ে বেরোতে দেখলাম গুঁফো-চাচাকে। কার মুরগীর মরা চামড়া কিনতে গেছে, কে জানে। তোমাদেরও বেরোতে দেখলাম, ঢুকতে দেখলাম, আবার বেরোতে দেখলাম। ধরেই নিলাম, ইবলিস দেখা করেছে তোমাদের সঙ্গে, কিছু একটা নিয়ে মেতেছ। পিছু নিলাম। হিহ্-হিহ্-হিহ্!'

'নরকে পচে মরবি তুই, শুঁটকির বাচ্চা!' গাল দিল মুসা।

'ইবলিস বলেছে বুঝি? হিহ্-হিহ্।'

'ইবলিস নয়, শুঁটকি,' বোঝানোর চেষ্টা করল রবিন, 'মিস্টার ডাংম্যান। তিনি জানেন আমরা এখানে আছি। মিস পেদ্রোর কাজ করছি।'

'বোকা বানাতে চেয়ো না। টনি পেদ্রো আমাকে বলেছে, একটা দামী পুতুল খুঁজছে সে। তার ধারণা, তোমরা চুরি করেছ ওটা।'

'তোমার মুণ্ডু!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'টনির সঙ্গে চুক্তি হয়ে গেছে আমাদের। ও-ই আমাদের অনুরোধ করেছে পুতুলটা খুঁজে দেয়ার জন্যে। তোর গিয়ে লটকে থাকা উচিত জেলেদের জালে, তা না করে ব্যাটা এখানে ভদ্রলোকের পাড়ায় আসিস কিশোর পাশার সঙ্গে পাল্লা দিতে। কিশোর তোর মত ইঁদুর?'

'কে ইঁদুর একটু পরেই বুঝবে। খাঁচায় তো সবে আটকেছ,' দারুণ মজা পাচ্ছে টেরিয়ার, রাগছে না তাই। 'এতই যদি বুদ্ধি বাচ্চা হোমসের, কান্নাকাটি করে তাকেই ডাকো না, এসে তালা খুলে দিয়ে যাক। তো, থাকো তোমরা, ধূলো খাও। আমি বাড়ি যাচ্ছি। গুড বাই।' করিডরে পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল।

অস্থির চোখে মুসার দিকে তাকাল রবিন, তারপর দরজায় গিয়ে কান ঠেকাল। নিচ তলায় নেমে যাচ্ছে টেরিয়ার। আরও খানিকক্ষণ পর নিচতলার দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ হলো, যেটা দিয়ে ঢুকেছিল ওরা।

হতাশ চোখে একে অন্যের দিকে তাকাল দুই গোয়েন্দা। সরে এল দরজার কাছ থেকে। ভাল বিপদেই পড়েছে।

'জানালায়ও শিক লাগানো,' বলল মুসা। 'অন্য দরজাটায়ও তালা।'

'পুরানো বাড়ি। দেয়ালে কিংবা মেঝেতে নরম জায়গা থাকতে পারে। খোলা তক্তা-টক্তা।'

সঙ্গে সঙ্গে কাজে লেগে গেল মুসা। মেঝেতে দুর্বল জায়গা খুঁজতে শুরু করল। নেই।

রবিন খুঁজল দেয়াল। 'পাথরের মত শক্ত,' বিষণ্ণ কণ্ঠস্বর।

'এখন কিশোর কিংবা ডাংম্যান তাড়াতাড়ি এলেই বাঁচি।'

'সাইকেল দুটো গলিতে আছে। কিশোরের চোখে পড়বে।'
'হ্যাঁ,' বলল মুসা। 'তাহলে বুঝবে, আশেপাশেই আছি আমরা।'
দুজনেই হাসল, কিন্তু প্রাণ নেই তাতে। নিজেদের সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করছে, মনকে বোঝাচ্ছে, কিশোর এই এল বলে, ওদের উদ্ধার করবে। সময় যাচ্ছে।
দুর্বল গলায় এক সময় বলল রবিন, 'কিশোর না এলেও ডাংম্যান তো আসবেই। তার বাড়ি যখন।'
'ধরো, এল না।'
'তাহলে বেরোনোর উপায় আমাদেরকেই করতে হবে।'
আবার সারাটা ঘর খুঁজল ওরা। নেই। জায়গামতই এনে তাদেরকে আটকেছে টেরিয়ার।
'রবিন!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা, একটা দরজার দিকে চেয়ে আছে। 'এটা ভেতরের দিকে খোলে। কব্জাগুলো দেখে যাও। ভেতরে।'
'স্ক্রু খোলার কথা ভাবছ?'
'হ্যাঁ। সহজ কাজ।'
'স্ক্রু-ড্রাইভার থাকলে সহজ।'
'শক্ত ছুরি দিয়েও খোলা যাবে,' ভারি স্কাউট-নাইফটা বের করল মুসা, বিপদের আশঙ্কা থাকে এ-রকম কোন জায়গায় গেলে সঙ্গে নেয়।
যতটা সহজ মনে করল, কাজটা তত সহজ নয়। কব্জা আর স্ক্রু পুরানো, জং পড়ে গেছে। ঘষে ঘষে আগে মরচে সাফ করল মুসা, তারপর স্ক্রু খোলার চেষ্টা চালাল।

চোদ্দ

ইয়ার্ডে পৌঁছেই আগে হেডকোয়ার্টারে ঢুকল কিশোর। মুসা আর রবিন ফেরেনি। মেসেজ-রিসিভার যন্ত্রটা দেখল, কোন মেসেজ নেই, ফোন আসেনি। বেরিয়ে এসে তাড়াতাড়ি থানায় ছুটল সে।
অফিসেই পাওয়া গেল পুলিশ চীফ ইয়ান ফ্লেচারকে।
'এই যে, ইয়াং ডিটেকটিভ, এসো এসো,' হেসে ডাকলেন তিনি। 'তারপর, কি মনে করে?'
'একটা কেস, স্যার,' বলল কিশোর। 'আপনার সাহায্য লাগবে।'
'বসো,' চেয়ার দেখালেন তিনি। 'খুলে বলো, কি হয়েছে?'
'বসার সময় নেই, স্যার। ডাংম্যান...'
'ধীরে, কিশোর। গোড়া থেকে বলো, রিপোর্ট লিখতে হবে তো।'
'ঠিক আছে,' বলল কিশোর। 'তবে দেরি করা যাবে না, স্যার।' পুতুল কুড়িয়ে পাওয়া থেকে শুরু করল, যত তাড়াতাড়ি পারে শেষ করতে চায়।
'থামো, থামো,' হাত তুললেন চীফ। 'ভূতের ছায়া? নিশ্চয় ভুল করেছে রবিন আর মুসা। কল্পনা। তোমার কি মনে হয়?'
'না, স্যার, কাল রাতে আমিও শুনেছি। বিচ্ছিরি হাসি। লম্বা একটা ছায়া, তবে

কুঁজো মনে হয়নি আমার। ওরা নাকি লম্বা নাকও দেখেছে, পাখির মাথার মত মাথা, ঝটকা দিয়ে দিয়ে নড়ছিল। কাল রাতে আমি আর মুসা ছায়াটার পিছু নিয়েছিলাম। উপত্যকায় গিয়ে এক জায়গায় একটা ট্রাক এল কোত্থেকে, চারজন মুণ্ডুশূন্য বামনকে নামাল।'

কাশলেন চীফ। 'মুণ্ডুশূন্য বামন?'

'মাথা দেখা যাচ্ছিল না আরকি। চটের বস্তা দিয়ে ঢেকে রেখেছিল, যাতে কোথায় এসেছে না দেখতে পারে। বন্দী।'

'ওদেরই কেউ সেরাতে পুতুলটা ছুঁড়ে ফেলেছিল? সাহায্যের জন্যে চেঁচিয়েছিল?'

'তাই তো মনে হয়, স্যার। বামনদেরই কেউ চুরি করেছে পুতুলটা। তাতে মেসেজ ভরে বাইরে ছুঁড়ে দিয়েছে। আশা, কারও না কারও চোখে পড়বেই, উদ্ধারের ব্যবস্থা হবে।'

'বেশি আশা করেছে। নির্জন এলাকায় ঝোপের ধারে ফেলেছে ছোট্ট পুতুল, তাতে লুকানো কুঠুরীতে মেসেজ, তা-ও আবার বোঝা যায় না কিছু।'

'মরিয়া হয়ে উঠেছিল হয়তো। কিংবা, আশেপাশে তার বন্ধুরা ঘোরাঘুরি করছে জানত, তাদেরকেই ডেকেছে, পুতুল তাদের হাতে পড়বে বলেই ছুঁড়ে ফেলেছে। ওরা পায়নি, আমাদের হাতে এসে পড়ল। আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিল দুই বাদামী চামড়ার লোক।'

'বাদামী চামড়া?' খুলে বলল সব কিশোর।

'ওরা?' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন এতক্ষণে চীফ। কিশোর আবল-তাবল কথা বলে না, জানেন। তাই ভূতুড়ে ছায়া আর মাথাশূন্য বামনদের কথা শুনে দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিলেন। 'যাক, বাস্তব কিছু পাওয়া গেল। হ্যাঁ, ওদের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেয়া যায়। চলো, ডাংম্যানের ওখানেই যাই আগে।'

দুজন পুলিশ সঙ্গে নিলেন চীফ।

শহরতলীতে ঢুকল পুলিশের গাড়ি। নির্জন পথ ধরে ছুটছে।

দূর থেকেই গথিক-বাড়িটার গাড়িবারান্দায় ডাংম্যানের গাড়িটা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল কিশোর। 'বাড়িতেই আছে। ওই যে গাড়ি।'

বেল বাজানোর আগেই সদর খুলে গেল। ডাংম্যান। কিশোরকে দেখে উদ্বিগ্ন হলো, 'ওরা কোথায়? রবিন আর মুসা?'

'নেই ? আমি তো ভাবছিলাম, এখানেই আছে। টনিকে দেখেছেন?'

'না। স্যালভিজ ইয়ার্ডের কাছে তার গাড়ি দেখলাম মনে হলো। ছুটে গেলাম, কিন্তু মোড় পেরিয়ে আর দেখলাম না গাড়িটা।' ইয়ান ফ্লেচারের দিকে তাকাল, এই প্রথম যেন চোখে পড়ল।

'ইনি ইয়ান ফ্লেচার, লস অ্যাঞ্জেলেস পুলিশের চীফ,' পরিচয় করিয়ে দিল কিশোর। 'আপনার কথামতই থানায় গিয়েছিলাম।'

'আপনি এসেছেন খুব ভাল হয়েছে, চীফ,' স্বভাব-বিনীত গলায় বলল ডাংম্যান। 'সমস্যায় পড়ে গেছি। দুজন লোক মারার চেষ্টা করল আমাকে। আমিষভোজী ফ্যানাটিক হবে-টবে প্রথমে ভেবেছি। কিন্তু কিশোর আমার মনে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছে

অদ্ভুত সব কথা বলে।'

'ভুতুরে ছায়া আর মুণ্ডুশূন্য বামন?' বললেন চীফ।

'হ্যা। বেশি কল্পনা করে বোধহয় ছেলেটা। তবে, মিস পেদ্রোর সোনার পুতুল চুরি হয়েছে, এটা সত্যি।'

চিন্তিত মনে হলো চীফকে। 'চাম্যাশ হোর্ডের কথা এখানকার অনেকেই শুনেছে, আমিও শুনেছি। থাকলে থাকতেও পারে।'

'ওসব সোনা-দানার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই আমার,' হাত নাড়ল ডাংম্যান। 'আমি ভাবছি মুসা আর রবিনের কথা। কোথায় গেল?'

'খোঁজা দরকার,' বললেন চীফ।

বাড়ির ভেতরে অনেক জায়গায় খোঁজা হলো। নেই।

দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল কিশোর। 'গেল কই?'

'চোরগুলোর পিছু নেয়নি তো?' ভুরু কোঁচকালো ডাংম্যান।

'নিতেও পারে,' চীফ বললেন।

'কিন্তু তাহলে আমাকে জানানোর ব্যবস্থা করত,' কিশোর মেনে নিতে পারছে না।

'সুযোগই পায়নি হয়তো। চোরগুলোর পিছু নিয়ে থাকলে ভাবনার কথা। বিপদ হতে পারে।'

মুখ কালো হয়ে গেছে কিশোরের।

লক্ষ করলেন চীফ। কিছু বললেন না।

ডাংম্যানের অফিসে ঢুকল ওরা। সেফ খুলে ছোট একটা বাক্স বের করে নিয়ে টেবিলের কাছে চলে গেল সে। খাবারের এঁটো আর মোড়কের কাগজ পড়ে আছে।

'বেল শুনে উঠে গেলাম,' সলজ্জ হাসল ডাংম্যান, 'ফেলার সময় পাইনি।' কাগজ দলেমুচড়ে ঝুড়িতে ফেলল সে, খাবারের টুকরো পরিষ্কার করল। বাক্স খুলে পুতুলটা বের করে বাড়িয়ে দিল। 'এই যে, এটা নিয়েই গোলমাল। চোরগুলো বার বার আক্রমণ করছে আমাকে।'

পুতুলের গোপন কুঠুরি খুলল কিশোর। চীফের দিকে ফিরল, 'মেসেজ নেই।'

'থাক না থাক, ওসব জেনে কাজ নেই আমার,' বলল ডাংম্যান। 'জিনিসটা পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছি, ব্যস, এবার আমি নিশ্চিন্ত। চুরি আর হবে না।'

'চোরগুলো কোথায়, হয়তো রবিন আর মুসা বলতে পারবে,' বললেন চীফ। 'কিশোর, এসো, খুঁজি।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখুন,' ডাংম্যান বলল। 'কিশোর, নতুন কিছু খবর পেলেই আমাকে জানিও। আমি আছি আজ এখানেই। কাল এস্টেটে যাব, টনির সঙ্গে কথা আছে।'

বাড়ির ভেতরে পাওয়া গেল না রবিন আর মুসাকে।

বেরিয়ে পুলিশ দুজনকে নিয়ে গাড়ির দিকে চললেন চীফ। পেছনে আস্তে আস্তে হাঁটছে কিশোর, চারপাশে তাকাচ্ছে, চিহ্ন খুঁজছে। দুটো বাড়ির মাঝের একটা গলির দিকে চোখে পড়ল তার। কপালে হাত রেখে রোদ আড়াল করে ভালমত দেখল।

'চীফ!' চেঁচিয়ে উঠল সে, 'দেখুন। টায়ারের দাগ।'

গলির দিকে ছুটল কিশোর। পেছনে ফ্লেচার।

‘এখানে ছিল ওরা,’ দেখতে দেখতে বলল কিশোর। ‘এই যে, দেখুন, সাইকেলের টায়ারের দাগ। আর এই যে এটা দেখছেন,’ পাথর দিয়ে বানানো খুদে একটা পিরামিড মত জিনিস দেখাল। ‘মুসার কাজ। চুপচাপ বসে থাকতে পারে না, হাতের কাছে পাথর পেলেই এরকম বানায়।’

‘নিশ্চয় তাহলে কারও পিছু নিয়ে গিয়েছে,’ বললেন ফ্লেচার।

গলিটার দুই দিকেই তাকাল কিশোর। ‘বুঝতে পারছি না। গেলে তো চিহ্ন রেখে যেত, চকের দাগ।’ দেয়ালগুলো দেখল ভাল করে। ‘নেই।’

‘হয়তো সময় পায়নি। নাকি অফিসে গিয়ে একটা অল পয়েন্ট বুলেটিন ছাড়ব?’

‘বাড়ি গিয়ে দেখি আগে, ফিরেছে কিনা।’

‘হ্যাঁ, চলো। ভূতুড়ে ছায়াটার কথা ভাবছি। চোরদের কেউ না তো?’

‘না, স্যার। ওরা বেঁটে, ছায়াটা অনেক লম্বা। টনির সমান।’

‘কিন্তু টনির গলা চেনো তোমরা।’

‘চিনি। কিন্তু ইচ্ছে করলে খানিকটা বদলে নেয়া যায়, জানেনই তো। তবে, হাসিটা মানুষের মনে হলো না। মানুষ ওরকম হাসে না।’

‘তো কি?’

‘সেটাই তো ভাবছি।’

‘এডগার অ্যালান পোর সেই গল্প মনে পড়ে যাচ্ছে,’ হাসলেন চীফ। ‘কেউ চিনতে পারছিল না খুনীর গলা, কথা বলে না, শুধু বিচিত্র শব্দ করে। মানুষের কণ্ঠের মত নয়। বানর জাতীয়…

ঝট করে দেয়ালের দিক থেকে চোখ ফেরাল কিশোর। ‘অস্ট্রেলিয়ায় এমন কি জীব আছে স্যার, যেটা হাসে?’

‘মানে?’

ঠোঁট কামড়াল কিশোর, চোখ মুখ কুঁচকে গেছে। ‘কি যেন একটা আছে, স্যার, মনে পড়ি পড়ি করেও পড়ছে না। আচ্ছা, টনির কথায় টান আছে। বলেছে ইংল্যাণ্ড থেকে এসেছে, মিছে কথাও হতে পারে। হয়তো অস্ট্রেলিয়ান। আসল টনি নয় সে।’

‘তাহলে ডাংম্যানের কথা বাদ দিচ্ছে কেন? তার কথায়ও তো টান রয়েছে।’

উজ্জ্বল হলো কিশোরের চোখ। ‘অস্ট্রেলিয়ান টান? ব্রিটিশ যে নয়, এটা ঠিক।’

‘বোঝা যায় না। অস্ট্রেলিয়ান পুলিশের সঙ্গে কথা বললেই বুঝতে পারব, লোকটার বদনাম থাকলে জানাবে। চলো যাই।’

কিশোরকে স্যালভিজ ইয়ার্ডের গেটে নামিয়ে দিয়ে গেল পুলিশের গাড়ি।

সোজা এসে হেডকোয়ার্টারে ঢুকল সে।

রবিন আর মুসা নেই। কোন মেসেজও পাঠায়নি।

দুজনের বাড়িতে ফোন করল কিশোর। জানল, দুপুরে খেয়ে যে বেরিয়েছে, আর ফেরেনি।

আর নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। পুলিশ হেডকোয়ার্টারে ফোন করে চীফকে খবরটা

জানাল কিশোর। তারপর ফোন করল রেন্ট-আ-রাইড অটো কোম্পানিতে। রোলস-রয়েস গাড়িটা দরকার।

পনেরো

পনেরো মিনিট পর সবুজ ফটক এক দিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল কিশোর। উঠল রাজকীয় রোলস-রয়েসে। চকচকে কালো শরীরে সোনালি অলঙ্করণ, চমৎকার একটা গাড়ি, যদিও মডেলটা পুরানো।

'ভেজিট্যারিয়ান লীগ, হ্যানসন। জলদি,' ঠিকানা বলল কিশোর।

ছুটতে শুরু করল রোলস-রয়েস। ইঞ্জিনের শব্দ প্রায় নেই বললেই চলে। উড়ে চলল যেন। দেখতে দেখতে এসে পড়ল লা পামা স্ট্রীটে। উৎকণ্ঠায় দুলছে কিশোরের মন, জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে, যেন আশা করছে, যে-কোন মুহূর্তে বাদামী চোরদেরকে দেখা যাবে।

রোলস রয়েসটা গথিক-বাড়ির ব্লকখানেক দূরে থাকতেই শাঁ করে ছুটে এল ডাংম্যানের গাড়ি। ধুলোর মেঘ উড়িয়ে চলে গেল পাশ দিয়ে। চেঁচিয়ে ডাকল কিশোর, কিন্তু লোকটার কানেই যেন ঢুকল না। তাকালও না রোলস-রয়েসের দিকে। স্টিয়ারিঙের ওপর নুয়ে রয়েছে, গম্ভীর।

'চেনেন নাকি?' জিজ্ঞেস করল হ্যানসন। 'পেছনে যাব?'

'না,' দ্রুত দূরে সরে যাওয়া গাড়িটার দিকে চেয়ে আছে কিশোর, চিন্তিত। 'বলল আজ বেরোবে না, মুসা আর রবিনের খবর শোনার অপেক্ষায় থাকবে। তাহলে? নতুন কিছু ঘটল?'

গথিক-বাড়ির সামনে এসে থামল রোলস-রয়েস। ঝটকা দিয়ে দরজা খুলে বুলেটের মত বেরোল কিশোর, ছুটল বাড়ির সদর দরজার দিকে। তার পেছনে এল হ্যানসন। দরজা খোলা। ছুটে ঢুকে পড়ল কিশোর। কান খাড়া।

'শুনছেন কিছু?' হ্যানসনকে জিজ্ঞেস করল।

'না,' মাথা নাড়ল ইংরেজ শোফার।

'আশ্চর্যবোধক চিহ্ন দেখা যায় কিনা দেখুন।'

'ওরা কোন বিপদে পড়েছে?'

'জানি না,' বলল কিশোর। 'পুলিশের ধারণা কারও পিছু নিয়ে গেছে। হয়তো তাই। কিন্তু তাহলেও কোন চিহ্ন রেখে যাবে।'

'হ্যাঁ,' শান্তকণ্ঠে বলল হ্যানসন।

'ওপরের সব ঘর খোঁজা হয়েছে। আপনি গিয়ে দেখুন আরেকবার। আমি বাইরে গিয়ে দেখি।'

'ঠিক আছে।'

পুরো ব্লকটা খুঁজে দেখল কিশোর, দেয়াল, বেড়া, পথ, সব। গাছ, কাঁচা রাস্তায়ও সঙ্কেত খুঁজল, নেই। পাথরের পিরামিডটা ছাড়া আর কোন নিশানাই রেখে যায়নি ওরা।

বাড়িতে এসে ঢুকল আবার কিশোর।
সিঁড়ি দিয়ে নামছে হ্যানসন। মাথা নাড়ল, 'কিচ্ছু নেই।'
ঠোঁট কামড়াল কিশোর। 'ডাংম্যান গেল কোথায়? এত তাড়াহুড়ো করে?' আনমনে বলল সে।
'হয়তো মিস্টার ফ্লেচার ডেকেছেন। আচ্ছা, গ্রাউণ্ড ফ্লোর কিন্তু দেখলাম না।'
'আমি তখন দেখেছি ভালমতই।'
'মিসও তো হতে পারে। অনেকবার দেখলে ক্ষতি কি?'
রাজি হলো কিশোর। কয়েকটা ঘরে দেখে গিয়ে ঢুকল ডাংম্যানের অফিসে। দেয়াল, মেঝে, আসবাবপত্র, সব দেখল, কোথাও কোন চিহ্ন নেই।
ডেস্কের ওপর থেকে ময়লা ফেলার ঝুড়ির দিকে চোখ ফেরাল কিশোর। সরে আসতে গিয়েও থমকে গেল। ঝুঁকে ঝুড়ি থেকে তুলে নিল একটা কাগজ। চেঁচিয়ে উঠল হঠাৎ, 'হ্যানসন, দেখুন।'
ছুটে এল শোফার। মোম মাখানো কাগজটা নিল কিশোরের হাত থেকে। 'স্যাণ্ডউইচের কাগজ। এতে এমন কি দেখার আছে?'
'দাগগুলো দেখছেন? গন্ধ শুঁকে দেখুন।'
দেখল হ্যানসন। 'সরিষা, আর মাংসের গন্ধ। তেলের দাগ। স্যাণ্ডউইচে থাকবেই।'
'কিন্তু হ্যানসন, মিস্টার ডাংম্যান ভেজিট্যারিয়ান। লীগের প্রেসিডেন্ট, নিরামিষভোজীদের সর্দার। বুঝলেন না? শব্জিভোজীদের যে নেতা মাংস আর সরিষা খায়, সে একটা ভণ্ড।'
'এগুলো ডাংম্যানই খেয়েছে, আপনি শিওর?'
'শিওর মানে? ও নিজে বলেছে তখন, পুলিশের সামনে। সে ভণ্ড, তারমানে পুরো লীগটাই একটা ভোগলামী। গল্প শুনিয়েছে, অনেক বড় সংগঠন আছে ডাংম্যানের, অনেক দেশ ঘুরে এবার রকি বীচে এসেছে নিরামিষভোজীর সংখ্যা বাড়াতে, সব শয়তানী, এখন বুঝতে পারছি। কোথাও কোন সংগঠন নেই তার।'
'এ-তো রীতিমত ক্রাইম,' তীক্ষ্ণ হলো হ্যানসনের কণ্ঠ। 'কি কারণ থাকতে পারে? লোক ঠকিয়ে টাকা আদায়?'
'না, অন্য কিছু। সে জেনেছে, মিস ভেরা পেদ্রো নিরামিষভোজী, হয়তো ইংল্যাণ্ডে টনিই তাকে জানিয়েছে সেকথা। জেনেছে চাম্যাশ হোর্ডের কথা। টনিকে ব্যবহার করার ইচ্ছেয় যোগাযোগ করেছে মিস পেদ্রোর সঙ্গে, নিরামিষভোজীদের প্রেসিডেন্ট বলে নিজেকে চালিয়ে দিয়ে খাতির করেছে। পেদ্রোজ এস্টেটে ঢোকার খুব চমৎকার এবং সহজ বুদ্ধি।'
'টনি কে?'
জানাল কিশোর। সোনার পুতুল ছিনতাইয়ের কথাও বলল।
'এমনও তো হতে পারে,' শুনে বলল হ্যানসন, 'চাম্যাশ হোর্ডের কথা আগে থেকেই জানে ডাংম্যান। ওগুলো খুঁজে বের করার প্ল্যান করেছে। সেই প্ল্যানমাফিকই যেচে এসে পরিচিত হয়েছে টনির সঙ্গে।
'হুঁ, হতে পারে। টনিকে দিয়েও এমন কাজ করিয়েছে, যাতে ওর ওপর চোখ

পড়ে আমাদের, সন্দেহ হয়,' গুঙিয়ে উঠল কিশোর। 'ইস্, আমি একটা গাধা! সব কথা বলে দিয়েছি ডাংম্যানকে। হায় হায়রে, হুঁশিয়ারও করে দিয়েছি।'

'বুঝে তো আর বলেননি,' সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে বলল হ্যানসন। 'সব্বাইকে বোকা বানিয়েছে ব্যাটা, মহা-ধড়িবাজ।'

'হ্যাঁ,' মাথা কাত করল কিশোর। 'সব কিছুর মূলেই হয়তো সে। ওই ভূতুড়ে ছায়া, মুণ্ডুশূন্য বন্দি,' ঝট করে মুখ তুলল সে। 'হ্যানসন! জলদি চলুন। পুলিশ হেডকোয়ার্টার।'

'চলুন। কোন প্ল্যান করেছেন?'

'না। তবে ডাংম্যান আরেক শয়তানী করেছে। এস্টেট থেকে বেরিয়ে এখানে পৌঁছতে অনেক দেরি হয়েছে তার, সেটা আমাদের জানার কথা নয়। সে-ই জানিয়েছে। তার ভয়, কৈফিয়ত চেয়ে বসব। তাই আমরা জিজ্ঞেস করার আগেই কৈফিয়তও দিয়ে দিয়েছে, স্যালভিজ ইয়ার্ডে নাকি টনিকে খুঁজতে গিয়েছিল, তাই আসতে দেরি হয়েছে। সব মিথ্যে কথা। আমরা আসার অনেক আগেই এখানে এসেছে। তারমানে রবিন আর মুসার নিখোঁজ হওয়ার পেছনে তার হাত রয়েছে।'

ষোলো

মরচে ধরা পুরানো একটা লোহার টেবিলের সামনে বসে আছে ডাংম্যান। চেয়ে রয়েছে রঙচটা কাঠের দেয়ালের ধারে বসা মুসা আর রবিনের দিকে।

'সত্যি বলছি, তোমাদের ব্যথা দিতে খুব খারাপ লাগছে আমার,' হাসল ডাংম্যান।

জবাব দিল না দুই গোয়েন্দা। কি বলবে? শক্ত করে হাত-পা বাঁধা। কোথায় রয়েছে, জানে না। শুধু জানে, একটা পাহাড়ী অঞ্চলে রয়েছে। চোখ বেঁধে নিয়ে আসা হয়েছে এখানে ওদের। দরজার স্ক্রুগুলো সব খুলে ফেলেছিল মুসা, ঠেলা দিতেই বাড়ি কাঁপিয়ে দড়াম করে পড়েছিল পাল্লা, সেই শব্দ শুনে উঠে এসেছিল ডাংম্যান।

পালাতে পারেনি ওরা। ডাংম্যান আর তার দুই চেলা মিলে ধরে ফেলেছে ওদের, চোখের পলকে হাত-পা-মুখ বেঁধে এনে তুলেছে একটা ট্রাকে। সাইকেল দুটোও তুলে নিয়েছে ট্রাকে। তারপর তাদেরকে নিয়ে আসা হয়েছে এখানে।

'অন্যের ব্যাপারে নাক গলানো উচিত হয়নি তোমাদের, বুঝতে পারছ তো?' হাসল ডাংম্যান। 'চুরি করে আমার বাড়িতে ঢুকেছ, কাজটা ভাল করোনি। আইনের চোখে অপরাধ। পুলিশে দিতে পারতাম, কিন্তু তার চেয়ে এখানে নিয়ে আসাটাই আমার জন্যে নিরাপদ হয়েছে। পুলিশ গেছে আমার বাড়িতে, কিশোরও ছিল তাদের সঙ্গে। না না, বেশি আশা করো না, ওরা কিছুই পায়নি। তোমাদের সমস্ত চিহ্ন নষ্ট করে দিয়েছি। কিছুই বুঝতে পারোনি।

'থাকো এখানে, আমার মেহমান হয়ে। কদ্দিন? তা, আমি যতদিন না যাচ্ছি। তবে এখানকার কাজ ফুরিয়ে এসেছে আমার, আর বেশি সময় লাগবে না।'

ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল রবিনের। 'তুমি একটা চোর।'

'চাম্যাশ হোর্ড চুরির তালে আছ,' ঝাঁঝাল কণ্ঠে বলল মুসা।

হাহ্-হাহ্ করে হেসে উঠল ডাংম্যান। 'তোমরা চালাক ছেলে। ঠিকই আন্দাজ করেছ। আজ রাতেই বের করে আনব ওগুলো।'

ছেলেদেরকে আরেকবার দেঁতো হাসি উপহার দিয়ে ঘুরে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল ডাংম্যান।

নীরবে একে অন্যের দিকে তাকাল দুই গোয়েন্দা। জানালার ময়লা কাচের ভেতর দিয়ে দেখতে পাচ্ছে, সূর্য ডুবছে। রাতের দেরি নেই, ডাংম্যানকে থামানোর কোন উপায় বের করতে পারছে না ওরা।

'পেদ্রোজ এস্টেটের কোথাও রয়েছি,' অনুমানে বলল মুসা।

'কোন চিহ্নও তো রেখে আসতে পারলাম না। দরজাটা অবশ্য ভাঙা...'

'ভাঙা নয়, স্ক্রু খুলেছিলাম শুধু,' শুধরে দিল মুসা। 'বলল না, কোন চিহ্ন রাখেনি। আমাদেরকে পাঠিয়ে দেয়ার পর নিশ্চয় আবার দরজা লাগিয়ে ফেলেছে। সাইকেলেদুটোও নিয়ে এসেছে, কেউ কিছু বুঝবে না।'

'হ্যাঁ। দেয়ালে-টেয়ালে চিহ্নও আঁকতে পারলাম না, সময়ই দিল না ব্যাটারা।'

'তবু, কিশোর আমাদের খুঁজে বের করবেই,' বন্ধুর ওপর অগাধ আস্থা মুসার। 'বাঁধন খোলা গেলে আমরাও চেষ্টা করতে পারতাম।'

দরজায় দেখা দিল ডাংম্যান। হাসতে হাসতে ঢুকল কেবিনে। 'পরাস্ত হবে না কিছুতেই, অ্যাঁ। তোমাদের প্রশংসা না করে পারছি না।'

'এসব করে পার পাবে না তুমি,' কঠিন গলায় বলল মুসা।

হাসি মুছল না ডাংম্যানের মুখ থেকে। 'খুব পাব। তোমরা আমাকে সুযোগ করে দিয়েছ আরও। কিশোর আর পুলিশ থাকবে তোমাদের খোঁজে, বাদামী চোরদুটোর খোঁজে, আমাকে সন্দেহ করার সুযোগই পাবে না। দারুণ হয়েছে।'

'কিশোর পাশাকে চেনো না তুমি, ডাংম্যান,' বলল রবিন। 'তোমার পরিণতি আমি এখনই বলে দিতে পারি। জেল।'

'নাহ্, তা আর হচ্ছে না,' দৃঢ় আত্মবিশ্বাসে বলল ডাংম্যান। 'অনেক সময় নিয়ে অনেক ভাবনাচিন্তা করে প্ল্যান করেছি, প্ল্যানমাফিক কাজ করেছি, কয়েকটা ছেলে আর ছোট্ট শহরের কয়েকটা পুলিশ আমাকে ঠেকাবে এখন? পারবে না। আমার কথা শুনবে? আমারও সুবিধে, তোমাদেরও।'

'না, শুনব না,' সাফ জবাব দিল মুসা।'

'হুঁ, সাহস আছে। তবে বোকামি করছ। অবশ্য দুনিয়ায় বোকার সংখ্যাই বেশি, নইলে আমার কপালে চাম্যাশ হোর্ড থাকত না। অনেক আগেই অন্য কেউ তুলে নিয়ে যেত।

'এত আশা করছ কেন?' রবিন বলল। 'না-ও তো পেতে পারো।'

'পাবো, মাই বয়, পাবো। ম্যাগনাস ভারদির ছোট্ট ধাঁধার সমাধান আমি করে ফেলেছি। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই চাম্যাশ হোর্ড এসে যাবে আমার হাতে।' ছেলেদের দিকে চেয়ে ডাংম্যানের চোখের পাতা কাছাকাছি হলো। 'তখন তোমাদের একটা ব্যবস্থা করা যাবে।'

বলে ঘুরল সে। দরজার নবে হাত রেখে ফিরে চাইল। 'পালানোর চেষ্টা

কোরো না, লাভ হবে না। পাহাড়ের ওপরে এই কেবিন, তিন ধারে একশো ফুট গভীর খাদ। এক দিক দিয়ে শুধু সরু একটা পথ, তাতে লোক পাহারা রেখেছি। গলাকাটা এক ডাকাত সে। সারাক্ষণ কেবিনের দরজায় চোখ রাখছে। কাজেই পালাতে পারছ না তোমরা।'

জোরে আরেকবার হেসে উঠে বেরিয়ে গেল ডাংম্যান।

বাইরে থেকে তালা লাগানোর ক্লিক শব্দ শোনা গেল।

পিছমোড়া করে হাত বাঁধা হয়েছে, খোলার চেষ্টা করল মুসা। খানিকক্ষণ টানাটানি করে ব্যর্থ হয়ে বলল, 'রবিন, আমার পিঠে পিঠ ঠেকাতে পারবে? গড়িয়ে চলে এসো তো।'

দুজনেই রুক্ষ মেঝেতে গড়িয়ে গড়িয়ে কাছাকাছি হলো, পিঠে পিঠ ঠেকাতে পারল।

রবিনের কব্জির বাঁধন খোলার চেষ্টা শুরু করল মুসা। দরদর করে ঘাম ঝরল কপাল থেকে, দাঁতে দাঁতে চাপল সে। মনে হলো, যুগ যুগ পেরিয়ে গেছে, আঙুল ব্যথা হয়ে গেল, কিন্তু কিছুই করতে পারল না। ক্লান্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিল।

'নাগালই পাই না,' হাঁপাচ্ছে সে।

'নাগাল পাওয়ার জন্যে কি আর বেঁধেছে,' রবিন বলল।

'ছুরিটাও নিয়ে গেছে হারামজাদা। দাঁতে কামড়ে ধরে...'

'দাঁত! শুয়ে পড়ো তো। কাত হয়ে।'

রবিন শুয়ে দুই মোচড় দিয়ে সরে এল খানিকটা, মুখ নামিয়ে আনল মুসার হাতের কাছে। কব্জির দড়ি বেশ ভালমতই নাগাল পেল দাঁত দিয়ে। গিঁট কামড়াতে লাগল। লালা লেগে সামান্য নরম হলো দড়ি, প্রথম গিঁটটা কামড়ে ধরে টানাটানি করতে লাগল, কাঁচা মাংস কামড়ে ধরে কুকুর যেভাবে দু-পাশে মুখ-মাথা নেড়ে টেনে ছেঁড়ার চেষ্টা করে, সেভাবে।

কিছুক্ষণ টানাটানি করে থামল সে, জিরিয়ে নিয়ে আবার শুরু করল।

তিনবারের মাথায় ঢিল হতে লাগল গিঁট।

চেঁচিয়ে উঠল মুসা, 'হচ্ছে! টের পাচ্ছি! আরও জোরে।'

প্রথম গিঁটটা খুলে গেল। দ্বিতীয়টা খোলা আরও সহজ হলো।

বাঁধন মুক্ত হয়ে উঠে বসল মুসা, খুলে ফেলল পায়ের বাঁধন। এরপর রবিনের বাঁধন খোলাটা কোন ব্যাপারই না।

ডলাডলি করে বাঁধনের জায়গাগুলোতে রক্ত চলাচল সহজ করে নিল দুজনে। তারপর উঠে এসে দাঁড়াল জানালার কাছে। মুসা সামনের জানালায়, রবিন পেছনের।

মুসা বলল, 'গার্ডটাকে দেখতে পাচ্ছি। অন্ধকারেও ওর চোখ এড়িয়ে যেতে পারব না, এমন জায়গায় রয়েছে।'

সব চেয়ে উঁচু চূড়াটার ওপাশে নেমে গেছে সূর্য। এপাশে আলো কমছে। রাত নামল বেশ তাড়াতাড়ি।

'এদিক দিয়েও সম্ভব না,' রবিন বলল। 'কয়েক ফুট পরেই খাদ। নাহ্, যাওয়ার আশা বাদ।'

ঘরের মাঝে রাখা টেবিলের কাছে ফিরে এল দুই গোয়েন্দা।

টেবিলে রাখা লণ্ঠনের কাচে হাত বোলাতে বোলাতে বলল মুসা, 'কোথায় আছি অনুমান করতে পারছি। পশ্চিমে গিরিপথটা দেখা যায়। পর্বতের মধ্যে কোথাও রয়েছি আমরা, মিস পেদ্রোর বাড়ি থেকে মাইল পাঁচেক দূরে।'

'সঙ্কেত পাঠালে কেমন হয়,' লণ্ঠনটার দিকে তাকিয়ে আছে রবিন। 'পাঁচ-ছয় মাইল দূর থেকে দেখা যাবে রাতের বেলা।'

প্রথমে কিছু বুঝল না মুসা। কিন্তু রবিনকে লণ্ঠনের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে সে-ও তাকাল। 'ঠিক বলেছ। কিন্তু লণ্ঠন জ্বালাতে দেশলাই লাগবে।'

'লণ্ঠন যখন আছে, নিশ্চয় দেশলাইও আছে,' টেবিলের ড্রয়ার টান দিয়ে খুলল রবিন। 'এই যে আছে, বললাম না।'

দুজনেরই মুখ উজ্জ্বল হলো। মোর্স কোড জানা আছে, রাতে এস ও এস পাঠাতে পারবে। কারও চোখে পড়ার সম্ভাবনা অবশ্য খুবই ক্ষীণ, তবু বলা তো যায় না। যদি পড়ে গেল?

পেছনের জানালার দিকে চেয়েই চমকে উঠল মুসা।

'কি হলো?' বলতে বলতেই ফিরল রবিন, দেখে স্থির হয়ে গেল সে-ও।

জানালার বাইরে একটা মুখ। বাদামী চামড়া।

পাল্লা খুলে ফেলে একে একে ভেতরে ঢুকল দুজন লোক। পরনে বিচিত্র সাদা পোশাক। হাতে লম্বা, বাঁকা ফলাওয়ালা ছুরি।

সতেরো

হুড়মুড় করে অফিসে ঢুকল কিশোর আর হ্যানসন।

ডেস্কের ওপাশে বসে আছেন ইয়ান ফ্লেচার। দুজনকে ওভাবে ঢুকতে দেখে ভুরু কোঁচকালেন।

'ডাংম্যান একটা ভণ্ড, স্যার!' কণ্ঠস্বর সংযত রাখতে কষ্ট হচ্ছে কিশোরের। 'হোর্ড চুরির তালে আছে ব্যাটা। তাড়াহুড়ো করে চলে যেতে দেখলাম ওকে। নিশ্চই পেদ্রোজ এস্টেটে গেছে। আমি শিওর, মুসা আর রবিন ওখানেই আছে।' স্যাণ্ডউইচের মোড়কটা ঠেলে দিল সে।

কাগজটা দেখলেন চীফ, নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ শুঁকলেন। 'হু, খায় আমিষ, করে ভেজিট্যারিয়ান লীগ। মিলে যাচ্ছে।'

'কী?'

'আমি যা জেনেছি,' কিশোরের কৌতূহল দেখে মিটিমিটি হাসছেন চীফ। 'দুনিয়ায় তোমরাই একমাত্র ডিটেকটিভ নও। হ্যাঁ, অস্ট্রেলিয়ান পুলিশের সঙ্গে কথা বলেছি। টনি পেদ্রোর ব্যাপারে ওরা কিছু জানে না, তবে ফগ ডাংম্যানের নাম অবশ্যই জানে।'

'কি জেনেছেন, স্যার?'

উঠে দাঁড়ালেন চীফ। 'চলো, যেতে যেতে বলব। দেরি করা ঠিক না। বাদামী চোর দুটোকে পাইনি, কিন্তু আমার ধারণা, ডাংম্যানকে ধরতে পারলেই ওদেরও

পেয়ে যাব। মিস্টার মিলফোর্ডকে ফোন করে দিয়েছি, পথে তুলে নেব। মুসার বাবাকে পাইনি, বেরিয়ে গেছে।'

'যাচ্ছি কোথায়?' জানতে চাইল কিশোর।

'পেদ্রোজ এস্টেট। তোমার ধারণা বোধহয় ঠিক। ওখানেই পাওয়া যাবে শয়তানটাকে।'

'রোলস-রয়েসটা নিয়ে যাই,' প্রস্তাব দিল কিশোর। 'ডাংম্যান ওটা চেনে না। পুলিশের গাড়ি দেখলেই পালাবে।'

'মন্দ বলনি। ঠিক আছে, আমি ওতে চড়েই যাব। আমার লোককে বলি, পুলিশ-কার নিয়ে পিছে আসুক।'

চারজন পুলিশকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে রোলস-রয়েসে উঠলেন চীফ। কিশোর আগেই উঠেছে। গাড়ি ছেড়ে দিল হ্যানসন। রবিনদের বাড়ি থেকে তার বাবাকে তুলে নেয়া হলো।

উঠেই জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার মিলফোর্ড, 'ওদের খোঁজ পেয়েছেন, চীফ?'

'না, তবে পাবো।'

'ব্যাপার কি?'

জানালেন ফ্লেচার। শেষে বললেন, 'ভাল কাজ দেখিয়েছে ছেলেরা। ওদের নিয়ে গর্ব করা উচিত আপনাদের, এমন ছেলের বাপ হয়েছেন। ওরা না থাকলে সাংঘাতিক বিপদে পড়ত টনি আর তার দাদী। আমরা জানতে জানতে দেরি হয়ে যেত। সব্বাইকে বোকা বানিয়েছে ডাংম্যানের বাচ্চা!' পুলিশী মেজাজ ঠাণ্ডা রাখলেন জোর করে।

'কে লোকটা?' অস্বস্তি বোধ করছেন মিস্টার মিলফোর্ড। ইয়ান ফ্লেচার তাঁর বন্ধু, অনেক দিন থেকে চেনেন। সহজে রাগেন না চীফ, রেগেছেন যখন, ব্যাপার গুরুতর।

'চোর, ভণ্ড, ওই যে কিশোর যা যা বলেছে,' আঁকাবাঁকা গিরিপথের দিকে চেয়ে বললেন চীফ। দিনের আলো শেষ। 'সিডনি-পুলিশের সঙ্গে কথা বলেছি। ডাংম্যানের নামে ওয়ারেন্ট আছে ওখানে। সাংঘাতিক এক ঠগ, ধোঁকাবাজ, প্রতারক, চোর—উঁচু উঁচু বাড়িতে দড়ি কিংবা পানির পাইপ বেয়ে উঠে চুরি করেছে। মানুষ ধরে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখে টাকা আদায় করেছে। এমন কোন কুকর্ম নেই, যা সে করেনি। একেক জায়গায় গিয়ে একেক সংগঠনের দোহাই দিয়ে মানুষকে ঠকিয়েছে। মেকসিকোতেও পুলিশ খুঁজছে তাকে। এমন কি সহজ সরল ইনডিয়ান-দেরকেও ফাঁকি দিয়েছে সে।'

'মেকসিকো?' বলল কিশোর। 'কবের ঘটনা?'

'একবার তো যায়নি, কয়েকবার। তবে শেষ গিয়েছিল নাকি বছরখানেক আগে। অস্ট্রেলিয়ান পুলিশের ধারণা, তারপর থেকেই আছে ক্যালিফোর্নিয়ায়।'

'তাহলে বছরখানেক আগেই জেনেছে চাম্যাশ হোর্ড আর মিস পেদ্রোর কথা।'

'মনে হয়। মহিলার ভাইয়ের মৃত্যুর খবর পড়েছে হয়তো পত্রিকায়,' বললেন চীফ। 'তখনই ঠিক করেছে, ইংল্যাণ্ডে গিয়ে টনির সঙ্গে দেখা করবে।'

পাহাড়ী পথ ধরে উঠে চলেছে রোলস-রয়েস। অনেক পেছনে রয়েছে পুলিশের

গাড়ি। কালো বিশাল গেটটা দেখা গেল, খোলা। গতি না কমিয়েই মোড় নিয়ে ঢুকে পড়ল হ্যানসন। শক্তিশালী এঞ্জিনের কোনরকম বিকার নেই, প্রতিবাদ জানাল শুধু মোটা টায়ার।

স্প্যানিশ-স্টাইল বিরাট বাড়ির সামনে এনে গাড়ি রাখল হ্যানসন। একটা ঘরেও আলো নেই, নির্জন মনে হচ্ছে। প্রাণের সাড়া নেই কোথাও।

রোলস-রয়েস থেকে নামল সবাই।

'কেউ নেই নাকি?' নিচু গলায় বললেন চীফ।

'তাই তো মনে হয়,' কিশোর বলল।

'ঢুকে দেখা দরকার,' বললেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'হয়তো হাত-পা বেঁধে অন্ধকারে ফেলে রেখেছে মুসা আর রবিনকে।'

পুলিশের গাড়িটাও এসেছে, থামল বাড়ি থেকে কিছু দূরে। নিঃশব্দে নেমে এল চারজন পুলিশ। ইশারায় ওদেরকে ছড়িয়ে পড়তে বলে কিশোর আর মিস্টার মিলফোর্ডকে নিয়ে সদর দরজার দিকে এগোলেন ফ্লেচার। তাদের পেছনেই রইল হ্যানসন।

নিচতলার প্রতিটি ঘর খুঁজে দেখা হলো। কেউ নেই।

জোরে জোরে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। সবাইকে ধরে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখেছে ডাংম্যান? চাম্যাশ হোর্ড নিয়ে পালানোর সময় মুক্তিপণ হিসেবে কাজে লাগানোর জন্যে?

কান খাড়া করল সবাই।

অন্ধকারে মৃদু থ্যাপ থ্যাপ শব্দ শোনা গেল।

'ওপরে,' বললেন চীফ। 'বাড়ির পেছন সাইডে।'

পিস্তল বের করে হাতে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলেন ফ্লেচার। পেছনে অন্যেরা। সাবধানে দোতলায় উঠে এল সবাই। করিডর ধরে এগিয়ে চলল পেছনে, যেদিক থেকে শব্দ এসেছে।

আবার শোনা গেল শব্দটা।

'ওখানে,' টর্চের আলোয় একটা দরজা দেখিয়ে বললেন মিস্টার মিলফোর্ড।

দরজায় তালা লাগানো। সবাইকে পাশে সরতে বলে খানিকটা পিছিয়ে এলেন ফ্লেচার। ছুটে গিয়ে কাঁধ দিয়ে জোরে ধাক্কা লাগালেন দরজায়। ভারি শরীরের প্রচণ্ড আঘাত সইতে পারল না পুরানো পাল্লা, হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল।

উদ্যত পিস্তল হাতে ঢুকলেন চীফ।

'ওই যে,' দরজার কাছ থেকেই চেঁচিয়ে উঠলেন মিস্টার মিলফোর্ড।

ঘরের কোণে চিত হয়ে আছে যেন একটা মিশরীয় মমি—সারা শরীর দড়ি দিয়ে এমনভাবে পেঁচিয়ে বাঁধা হয়েছে। টনি। মুখেও কাপড় গোঁজা, চেঁচানোর উপায় নেই। পায়ের নিচের দিক কোনমতে নড়াতে পারছে, সে-ই লাথি মেরেছে দেয়ালে। মুখের কাপড় খুলে ফেলতেই চেঁচিয়ে উঠল টনি, 'দাদী, ওই যে, ওখানে!'

একটা চেয়ারে বসিয়ে শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছে মহিলাকে, মুখে কাপড়। তাঁর বাঁধন খুলে দিল হ্যানসন।

'আমি...আমি...কি হয়েছে?' ঘোরের মধ্যে রয়েছেন যেন মিস পেদ্রো 'ও, মনে

হয়েছে। ডাংম্যান। ট্রেতে করে বিকেলের চা নিয়ে এসেছিল, খেয়েছি। তারপর আর মনে নেই। হুঁশ ফিরলে দেখলাম এই অবস্থা। ঈশ্বর, এত ভয় জীবনে পাইনি! টনি, আরে, মেঝেতে কেন!'

লাফিয়ে চেয়ার ছাড়তে গিয়ে টলে উঠলেন মহিলা। ধপ করে বসে পড়ে জিরিয়ে নিলেন এক মুহূর্ত। তারপর উঠে এসে বসলেন টনির পাশে। মুখে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। তার দিকে চেয়ে হাসল টনি।

দড়ির বাঁধন কেটে দেয়া হলো। উঠে বসল টনি, বিকৃত করে ফেলেছে মুখ।

'কি হয়েছিল?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'দাদী ডাকলে পরে তোমাদেরকে লাইব্রেরিতে রেখে গিয়েছিলাম না? ফিরে এসে দেখি, তুমিও নেই, ডাংম্যানও না। শেষ বিকেলে ফিরে এল আবার। বলল, পুতুলটার ব্যাপারে জরুরী খবর আছে, দোতলায় গিয়ে বলবে। একটুও সন্দেহ না করে গেলাম। কি দিয়ে জানি বাড়ি মারল মাথার পেছনে। হুঁশ ফিরলে দেখলাম, মমি বানিয়ে রাখা হয়েছে আমাকে।'

'হুঁ,' ডাংম্যানের পুরো পরিকল্পনাই পরিষ্কার হয়ে আসছে কিশোরের কাছে। 'ও আমাদেরকে বলেছে, তোমাকে খুঁজতে গেছে, ইয়ার্ডে নাকি তোমার গাড়িও দেখেছে, তারপর নাকি হঠাৎ করেই গায়েব হয়ে গেছ।'

'সব শয়তানী,' বললেন চীফ। 'আসলে অনেক আগেই গিয়ে নিজের বাড়িতে বসে ছিল, রবিন আর মুসাকে ধরে আটকেছে। ওরা ওখানে আছে, কিশোরই জানিয়েছিল ব্যাটাকে।'

'প্লীজ,' গুঙিয়ে উঠল কিশোর, 'আর লজ্জা দেবেন না। সব আমার দোষ, আমিই সব কথা বলেছি তাকে, হুঁশিয়ার করে দিয়েছি।'

'আজ রাতেই গুপ্তধন খুঁজে বের করবে সে,' বলল টনি। 'আমার দোষ সবচেয়ে বেশি। এখানে ঢোকার সুযোগ আমিই করে দিয়েছি তাকে। তোমরা চোর, পুরস্কার ঘোষণা করে পুতুলটা তোমাদের হাত থেকে ফেরত আনার আইডিয়া, সব তার। ও-ই বুদ্ধি দিয়েছে জঞ্জাল বিক্রির ছুতোয় তোমাদের সঙ্গে পরিচয় করতে। দম দেয়া পুতুলের মত খেলিয়েছে সে আমাকে।'

'আমার দোষও কম নয়,' বলে উঠলেন মিস পেদ্রো। 'ওর দলে ঢুকিয়েছে আমাকে, তার লীগে বেশ কিছু টাকাও চাঁদা দিয়েছি আমি। আমার চেনা অনেক নিরামিষভোজীর কাছ থেকে চিঠি এনেছে, দেখিয়েছে আমাকে।'

'সব জাল, আমি শিওর,' বললেন ফ্লেচার। 'ইবলিসটা জানে না, এমন কোন শয়তানী নেই।'

'যা-ই হোক, ওকে এখন খুঁজে বের করে ধরা দরকার,' মনে করিয়ে দিল কিশোর। 'টনি, বাদামী চামড়ার লোক, কিংবা মুণ্ডুছাড়া বামনদের কথা কিছু বলেছে ডাংম্যান?'

'মুণ্ডুছাড়া! না-তো!'

ভ্রূকুটি করল কিশোর। 'ওই বামনরাই এ-রহস্যের চাবিকাঠি মনে হচ্ছে। ওদেরই কেউ পুতুলটা চুরি করে মেসেজ ভরে দেয়ালের ওপর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলেছিল। ইয়াকুয়ালী ইনডিয়ান হতে পারে। কিন্তু ওদেরকে আটকেছে কেন

ডাংম্যান?'

ধৈর্য হারালেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'বামন আর পুতুল নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি কেন? মুসা আর রবিনকে খোঁজা দরকার আগে।'

'কিন্তু ডাংম্যানকে না পেলে ওদের পাওয়া যাবে না,' বললেন চীফ। 'তাকেই আগে দরকার।'

ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে মিস পেদ্রোর দিকে ফিরল কিশোর। 'ম্যাডাম, আপনার ভাই কখনও চাম্যাশ হোর্ডের কথা বলেছিল?'

'না। ও তখন পালানোর জন্যে অস্থির, বেশি কথা বলার সময়ই ছিল না।'

'পুতুল দুটোর কথা কি বলেছিল?'

'তেমন কিছুই না। চলে যাওয়ার আগে পুতুল দুটো আমার হাতে দিয়ে বলল, ওগুলো আর কোন কাজে লাগবে না। হাঁসটাকে নাকি মেরে ফেলেছে সে। কথাটা অনেক ভেবেছি, কি বলতে চেয়েছে কিছুই বুঝিনি।'

চোখ মিটমিট করল কিশোর। 'বলতে চেয়েছে সোনার-ডিম-পাড়া হাঁসটাকে মেরে ফেলেছে। যে লোকটাকে খুন করেছে, নিশ্চয় চাম্যাশ হোর্ড কোথায় আছে জেনেছিল লোকটা। পুতুলের মধ্যে কোন সূত্রই ছিল না। চাম্যাশ হোর্ড আছে, শুধু একথা প্রমাণ করে ওদুটো।'

'হোর্ড কোথায় আছে জানত না তাহলে ফিয়ারতো,' ফ্লেচার বললেন। 'কিন্তু ডাংম্যান জানে। কিভাবে জানল?'

'ম্যাগনাস ভারদির ধাঁধার সমাধান করে ফেলেছে আরকি। কিংবা বাদামী চামড়ার লোক দুটো করেছে। আমাদেরও করতে হবে এখন।'

'ইন দা আই অভ দা স্কাই হোয়্যার নো ম্যান ক্যান ফাইণ্ড ইট,' বিড়বিড় করলেন চীফ। 'মানে কি? কোথায় খুঁজতে হবে?'

জবাব নেই কারও মুখে। একে অন্যের দিকে নীরবে তাকাল শুধু।

'বাদামী চামড়ার লোকদুটোকে পাই কোথায়?' আনমনে বলল কিশোর।

নীরবতা দিয়ে ঠাট্টা করল যেন তাকে বিশাল বাড়িটা।

আঠারো

ছুরি হাতে আবছা অন্ধকার কেবিনে দাঁড়িয়ে আছে লোক দুজন।

ধীরে ধীরে পিছিয়ে যাচ্ছে রবিন আর মুসা।

টেবিলের কাছে এসে থামল মুসা, হাত বাড়াল লণ্ঠনটার দিকে, ছুঁড়ে মারবে যে কোন একজনের মুখে।

মুসার উদ্দেশ্য বুঝে মাথা নাড়ল একজন, ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলল, 'না না, আমরা বন্ধু। সাহায্য করব।'

স্থির হয়ে গেল রবিন। 'ইংরেজি জানো?'

'সি, অল্প। আমি জ্যাকোয়া। ও আমার ভাই জেরমি।'

'সাহায্য করতে চাইলে পুতুলটা চুরি করেছিলে কেন?'

'ভাবলাম ভেতরে আমার ভাইয়ের চিঠি আছে। তোমার পিছু নিলাম, পুতুল

কেড়ে নিলাম, চিঠি নেই ভেতরে।'

'মেসেজটা আমরা রেখে দিয়েছি,' মুসা জানাল।

'কি লেখা?' জিজ্ঞেস করল জ্যাকোয়া।

'কি লেখা আছে,' বলল রবিন।

উত্তেজিত হয়ে মাথা ঝাঁকাল জ্যাকোয়া, বিচিত্র ভাষায় জেরমিকে কি বলল। তার মুখেও উত্তেজনা ফুটল। ছুরি খাপে ভরে রাখল দুজনে।

'এই ভয়ই করছিলাম,' ইংরেজিতে বলল জ্যাকোয়া। 'আমাদের ছোট ভাইয়ের বিপদ। ডাংম্যান মিথ্যুক, খারাপ লোক।'

'তোমরা ইয়াকুয়ালি ইন্ডিয়ান, মেকসিকো থেকে এসেছ না?' জিজ্ঞেস করল রবিন। 'তোমাদের ভাইকে বন্দি করে রেখেছে ডাংম্যান?'

'সেদিন আমাদের তাড়া করেছিলে যখন, ইংরেজি বললে না কেন? অনেক কিছু সহজ হয়ে যেত,' বলল রবিন।

'তখন উত্তেজিত । ইংরেজি মনে ছিল না,' বিষণ্ণ জবাব দিল জ্যাকোয়া।

'ডাংম্যান তোমার ভাইদের ধরে এনেছে কেন? কি করছে সে?'

ভাঙা ইংরেজিতে যা বলল জ্যাকোয়া, তার সংক্ষেপ ঃ মাসখানেক আগে, মেকসিকোর সিয়েরা মাদ্রে পর্বতের গভীরে ইয়াকুয়ালিদের গাঁয়ে গিয়েছিল ডাংম্যান। পাবলিক অ্যামিউজমেন্ট পার্কে দড়াবাজিকরের চাকরি দেয়ার লোভ দেখিয়ে চারটে কিশোরকে নিয়ে আসে আমেরিকায়। অভিভাবকরা রাজি ছিল না, কিন্তু ছেলেদের মন, আমেরিকা আর শহর দেখার লোভ সামলাতে পারল না, বলে-কয়ে রাজি করাল বাপ-মাকে। চার কিশোরের একজনের নাম নিউকা।

তারপর, হপ্তাখানেক আগে একটা চিঠি পৌঁচেছে গাঁয়ে। রকি বীচ থেকে পাঠিয়েছে নিউকা, সাহায্যের আবেদন। চিঠিটা কিভাবে পোস্ট করেছে, সে-ই জানে।

'এখানে এলাম, পুরানো গাড়ি জোগাড় করলাম,' বলে গেল জ্যাকোয়া। 'ডাংম্যানকে পর্বতের ভেতরে এক বাড়িতে দেখলাম। নিউকার চিৎকার শুনলাম মনে হলো। সন্ধ্যায় তোমাদেরকে দেখলাম বড় বাড়িটার সামনে। তোমরা কোথায় থাকো, দেখে এলাম। পরদিন সকালে তোমাদের পিছু নিলাম। বড় স্টুডিওতে যেতে দেখলাম। ভাবলাম, ওটার ভেতরে নিউকার লেখা আছে। ছিনিয়ে নিলাম। লেখা পেলাম না। ডাংম্যানকে খুঁজতে খুঁজতে পেলাম আরেকটা বড় বাড়িতে। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ছেলেগুলো কোথায়। ঝগড়া লেগে গেল আমাদের সঙ্গে।'

'সে-ই তাহলে ঝগড়া শুরু করেছে। তোমরা আক্রমণ করোনি,' বলল রবিন।

'সি। ভয় দেখাল, পুলিশকে বলে আমাদের জেলে পাঠাবে। ভয়ে পালিয়ে এলাম। চোখ রাখলাম বাড়িটার ওপর। তোমাকে আর আরেকটা ছেলেকে ঢুকতে দেখলাম। বেরিয়ে এলে। কথা বলার জন্যে ডাকলাম, তোমরা দৌড় দিলে। পালালে। আবার বাড়ির ওপর চোখ রাখলাম। তোমাদেরকে আবার ঢুকতে দেখলাম। পরে তোমাদের বেঁধে ট্রাকে তুলতে দেখলাম। পিছু নিয়ে এখানে এসেছি কথা বলতে। ডাংম্যান কোথায় জানো?'

'জানি না,' বলল মুসা।

'তোমাদের ছেলেদের দিয়ে কি করাচ্ছে, জানো?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'নিশ্চয় কোন খারাপ কাজ,' বলল জ্যাকোয়া। 'তারপর মেরে ফেলবে। ওরা জানে, সে কি করছে, তাই মারবে।'

'নিশ্চয় হোর্ড খোঁজার কাজে লাগিয়েছে,' বুঝতে পেরে বলে উঠল মুসা। 'পাহাড়ে চড়তে ওস্তাদ ওরা। ঠিকই বলেছ, জ্যাকোয়ার কাজ শেষ হলে ওদেরকে মেরে ফেলবে ইবলিসটা।'

'পুলিশকে জানানো দরকার,' রবিন বলল।

'বাইরে যেতে চাও?' জিজ্ঞেস করল জ্যাকোয়া। 'এসো।'

'কি করে? পাহারা আছে। নিশ্চয় বন্দুক আছে তার কাছে,' মুসা বলল।

'এদিক দিয়ে নামব,' খাদের দিকে দেখাল জ্যাকোয়া।

জ্যাকোয়া কি বলছে, আন্দাজে বুঝে মাথা ঝাঁকাল জেরমি। বিচিত্র ভাষায় কিছু বলল। বোধহয় বলেছে, নেমে যাওয়াটা কোন ব্যাপারই নয় ওদের জন্যে।

'ওই খাড়া পাড় বেয়ে?' আঁতকে উঠল মুসা।

'খাড়া কই?' বলল জ্যাকোয়া। 'সহজ।'

মুসার দিকে তাকাল রবিন, দৃষ্টি ফেরাল জ্যাকোয়ার দিকে। 'চলো, যাব। আর কোন পথ যখন নেই।'

'যাবে?' কাঁধ ঝাঁকাল মুসা, হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে।

'ঠিক আছে। আগে সঙ্কেত পাঠিয়ে নিই। পড়ে গিয়ে হাড়গোড় ভেঙে তো মরব জানিই, লাশগুলো অন্তত এসে নিয়ে যেতে পারবে।'

লণ্ঠন জ্বেলে জানালার কাছে এসে দাঁড়াল মুসা। ঘরের কোণ থেকে খুঁজেপেতে ছোট একটা কাঠের টুকরো এনে দিল রবিন। টুকরোটা লণ্ঠনের সামনে ধরে-সরিয়ে, ধরে-সরিয়ে এস ও এস পাঠাতে শুরু করল মুসা।

তারপর জানালা দিয়ে বেরিয়ে এল চারজনে।

সঙ্গের ঝোলা থেকে চামড়ার তৈরি সরু শক্ত দড়ি আর মোটা দুটো কাঠের গোঁজ বের করল দুই ভাই। পাথরের দুটো গভীর খাঁজে গোঁজ দুটো ভালমত ঢুকিয়ে দিয়ে দুটো দড়ির এক মাথা বাঁধল। হাতে তৈরি চামড়ার স্ট্র্যাপ বের করে কাঁধে-পিঠে বেঁধে নিল। স্ট্রাপে চামড়ার আঙটা রয়েছে, ওগুলোর ভেতর দিয়ে ঢুকিয়ে দিল দুটো দড়ির অন্য মাথা। কোন কারণে হাত যদি ছুটেও যায় দড়ি থেকে, ওই আঙটায় আটকে যাবে দড়ি, মারাত্মক পতন ঠেকাবে।

খাদের কিনারে এসে নিচে উঁকি দিল মুসা। অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না। ভালই হলো, বিপদের পরিমাণ চোখে দেখা না গেলে ভয় অনেক কম লাগে।

'শক্ত করে ধরে রাখবে গলা আর আঙটা,' মুসাকে বলল জ্যাকোয়া। 'ছাড়বে না। আমরা নামতে পারব।'

মুসাকে পিঠে নিল জ্যাকোয়া, জেরমি নিল রবিনেক। তারপর আলগোছে দড়ি ধরে ঝুলে পড়ল।

পাক দিয়ে উঠল মুসার মাথা। ক্ষণিকের জন্যে মনে হলো মহাশূন্যে ভাসছে। জ্যাকোয়ার গলা জড়িয়ে ধরে রেখেছে, আরেক হাতে আঁকড়ে রেখেছে স্ট্র্যাপের পিঠের একটা আঙটা। দাঁতে দাঁত চেপে রেখেছে, ঝাঁকুনির চোটে গোড়া থেকে

হাত ছিঁড়ে গেলে যাক, কিন্তু আঙুল ছুটাবে না।

পাহাড়ের দেয়ালে পা ঠেকিয়ে দোল দিতে দিতে নেমে চলেছে দুই ইয়াকুয়ালি। ঠেলে বেরিয়ে থাকা পাথর, খাঁজ, কিছুই রুখতে পারছে না ওদের, গতি কমছে না একটুও।

ধরে থাকতে থাকতে হাত ব্যথা হয়ে গেছে দুই গোয়েন্দার। ওদের মনে হচ্ছে, এ-নামার বুঝি আর শেষ নেই, শেষ হবে না কোনদিন।

হঠাৎ প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লাগল, ধরে রাখতে পারল না মুসা, জ্যাকোয়ার গলা থেকে হাত ছুটে গেল তার। আঙটা থেকে খুলে এল আঙুল। চোখ বন্ধ করে ফেলল সে। দড়াম করে আছড়ে পড়ল কঠিন পাথরে। পিঠে তীব্র ব্যথা, চোখা গরম এক শিক ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে যেন মেরুদণ্ডের পাশে। গুঙিয়ে উঠল সে।

হাসি শোনা গেল জ্যাকোয়া আর জেরমির।

হাত ধরে মুসাকে টেনে তুলল জ্যাকোয়া।

চোখ মেলল গোয়েন্দা-সহকারী। লজ্জা পেল। জ্যাকোয়ার পা মাটিতে ঠেকায় ঝাঁকুনি লেগেছিল, আর তাতেই ছুটে গেছে তার হাত।

ব্যথা পাচ্ছে পিঠে, কিন্তু সেটা কাউকে বুঝতে দিল না মুসা।

'নামলাম তাহলে!' রবিনের কণ্ঠে বিস্ময়। 'বিশ্বাস হচ্ছে না।'

আবার হাসল জ্যাকোয়া। 'সহজ।'

'কঠিনগুলোর কথা আর বোলো না,' সোজা হতে গিয়ে আঁউ করে উঠল মুসা। কোমরের এক পাশে হাত চেপে ধরে দুর্বল কণ্ঠে বলল, 'তাড়াতাড়ি করা দরকার। তোমাদের গাড়িটা কোথায়?'

'বাঁয়ে, পথে। পুলিশের কাছে যাব? সাহায্য করবে?'

'করব,' বলল রবিন।

গাড়ির দিকে রওনা হলো ওরা। পথ নেই, কঠিন পাথুরে অঞ্চল, এবড়ো-খেবড়ো, রুক্ষ। তাড়াতাড়ি হাঁটা যাচ্ছে না।

অবশেষে পথে পার্ক করে রাখা গাড়ির কাছে পৌঁছল ওরা।

ঠিক এই সময় মোড়ের কাছে দুটো হেডলাইট জ্বলে উঠল, চোখ ধাঁধিয়ে দিল তীব্র আলো। একটা ট্রাক।

আবছা মত দেখা গেল ট্রাকের কেবিন থেকে লাফিয়ে নামল একটা মূর্তি, হাতে রাইফেল। 'অনেক জ্বালান জ্বালিয়েছ,' ডাংম্যানের গলা। 'আর ছাড়ব না।'

'কি ভাবে...' কথা সরছে না রবিনের, 'জানলে...আমরা এখানে।'

'ইয়াল্লা!' গুঙিয়ে উঠল মুসা।

হেসে উঠল ডাংম্যান। তার হোঁতকা সঙ্গী ল্যাঙলীও নেমেছে ট্রাক থেকে। তার হাতেও রাইফেল।

বিচিত্র ভাষায় গাল দিয়ে ডাংম্যানের ওপর লাফিয়ে পড়তে গেল জেরমি। সঁ্যাত করে সরে গেল ডাংম্যান, রাইফেলের বাঁট দিয়ে প্রচণ্ড বাড়ি মারল ইনডিয়ানের মাথায়। মুখ থুবড়ে পড়ল লোকটা, উঠল না। নিথর হয়ে গেছে।

'পালাচ্ছে!' চেঁচিয়ে উঠল ল্যাঙলী। 'আরেকটা পালাচ্ছে!'

চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরল ডাংম্যান, রাইফেল তুলল, কিন্তু তার আগেই

অন্ধকারে হারিয়ে গেল জ্যাকোয়া।

'যাক,' বলল ডাংম্যান। 'একটু পরেই মাল নিয়ে হাওয়া হয়ে যাব আমরা। ওই ব্যাটার তোয়াক্কা না করলেও চলবে।'

অস্বস্তি বোধ করছে ল্যাঙলী। 'ঠিক তো, বস? সত্যিই পারব?'

'পারব না মানে? যাও, রিগোকে ডেকে নিয়ে এসো, আর পাহারার দরকার নেই। এই বিচ্ছু দুটো বেশি জ্বালাচ্ছে। ঠাণ্ডা করে দেয়া দরকার।'

উনিশ

'কিভাবে?' হতাশা ঢাকতে পারলেন না মিস্টার মিলফোর্ড। 'কোথায় আছি কিছুই জানি না। কোন সূত্র নেই। ধারণা নেই। কি করে খুঁজব?'

সবাই বেরিয়ে এসেছে বাড়ির বাইরে। চাঁদের আলোয় প্রতিটি জিনিসকে কেমন রহস্যময়, ভূতুড়ে দেখাচ্ছে। গাড়ি বারান্দায় পায়চারি করতে করতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল কিশোর।

'চীফ, কয়েকটা ব্যাপার আলোচনা করে দেখা যাক,' বলল সে। 'এক, পর্বতের মধ্যেই কোথাও রয়েছে গুপ্তধন। দুই, ডাংম্যানের একটা কার একটা ট্রাক আছে। তিন, আজ রাতেই গুপ্তধন সরানোর মতলব করেছে সে।'

'তাতে কি?' প্রশ্ন করল টনি।

'তাতে? একটা ব্যাপার শিওর, কোন একটা পথ ব্যবহার করতে হবে তাকে। আর সেই পথটা রয়েছে এই এস্টেটেরই কোথাও। পর্বতের ভেতরে, এখান থেকে বেশি দূরে নয়। গেট দিয়ে ঢুকেছে যে পথ, সেটা নয়, হান্টিং লজে যেটা গেছে, সেটাও নয়, তৃতীয় আরেকটা পথ আছে কোথাও। মিস পেদ্রো হয়তো বলতে পারবেন।'

'মাই গড। কিশোর, ঠিকই বলেছ,' একমত হলেন ফ্লেচার। মিস পেদ্রোর দিকে ফিরলেন। মিস পেদ্রো, মিস্টার মিলফোর্ড, টনি, হ্যানসন সবাই তাকিয়ে আছে পুবের অন্ধকার পাহাড় শ্রেণীর দিকে। 'মিস পেদ্রো, আর কোন পথ আছে, জানেন?'

ভেবে বললেন মহিলা, 'খুব বেশি ঘোরাঘুরি করিনি এস্টেটের ভেতরে...'

চেঁচিয়ে উঠল টনি, 'আরে, ওটা কি? আলো! জ্বলছে-নিভছে।'

ঘুরে আরেক দিকের পাহাড়ের দিকে তাকাল সবাই। দম বন্ধ করে ফেলল। ম্লান আলো ঝিলিক দিয়েই নিভে গেল, আকাশের অনেক নিচে, কাছের গাছগুলোর মাথার ওপর দিয়ে দেখা গেছে আলোটা।

'এস ও এস,' কিশোর বলল। 'বাজি রেখে বলতে পারি, মুসা আর রবিন। বন্দি করে রেখেছে ওদেরকে।'

'চার পাঁচ মাইল হবে,' বললেন ফ্লেচার। 'পর্বতের গোড়ায় কোন টিলার মাথায়।'

'ওই যে, আবার,' বলল হ্যানসন।

জ্বলে উঠেই নিভে গেল আলো।

'কি আছে ওদিকে, মিস পেদ্রো?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'কি যেন আছে?' মাথা চুলকালেন মহিলা, মনে করার চেষ্টা করছেন। 'অনেক দিন আগের কথা। বাবা বলত···ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে, পুরানো একটা কেবিন। আজকাল আর কেউ যায় না ওদিকে।'

'কি ভাবে যেতে হয়?' জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার মিলফোর্ড।

'পথ একটা আছে, খুব সরু। একটা ছোট পাহাড়ের ধার দিয়ে গিয়ে ঢুকেছে পর্বতের ভেতরে। পাহাড়টার চূড়া চ্যাপ্টা, টেবিলের মত অনেকটা, ওই মেসা বলে যাকে। মেসার ওপরই তৈরি হয়েছে কেবিন। ওখানে ওঠা খুব কঠিন।'

'বন্দি রাখার জন্যে ভাল জায়গাই খুঁজে বের করেছে ডাংম্যান,' মন্তব্য করল কিশোর।

পুব দিকে তাকিয়ে রয়েছে সবাই। কিন্তু আর দেখা গেল না আলোর সঙ্কেত।

'কিছু হলো না তো?' উদ্বিগ্ন মনে হলো মিস্টার মিলফোর্ডকে।

'চলুন,' বললেন চীফ, 'গিয়ে দেখি।'

রোলস-রয়েসে উঠল কিশোর, ইয়ান ফ্লেচার, মিস্টার মিলফোর্ড আর টনি। পুলিশের গাড়িতে এখন তিনজন পুলিশ, একজন রয়ে গেল মিস পেদ্রোর পাহারায়। কোন দিক দিয়ে কিভাবে যেতে হবে, বলে দিয়েছেন মিস পেদ্রো। সেভাবেই, হাইওয়ে দিয়ে ঘুরে এসে সরু পথটায় নামল গাড়ি দুটো।

পাহাড়ী পথে নেমেই নিভিয়ে দেয়া হলো গাড়ির আলো। আশপাশে টিলাটক্কর আর পাহাড়, ফলে চাঁদের আলো ভালমত পড়ছে না পথে, আবছা অন্ধকার।

বিশাল পর্বতের গোড়ায় এসে থামল গাড়ি। সবাই নামল।

মেসার মাথায় কেবিনটা দেখাল কিশোর, 'ওই যে।'

'অন্ধকার কেন?' ফিসফিস করে কথা বললেন মিস্টার মিলফোর্ড।

'সাবধান!' হুঁশিয়ার করলেন ফ্লেচার। 'ফাঁদ হতে পারে।'

'তাড়াতাড়ি করুন, চীফ। কি বিপদে আছে ছেলেগুলো কে জানে।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

খাড়া সরু পথ ধরে মেসায় উঠতে শুরু করল চীফ আর তাঁর তিন সহকারী। শব্দ শুনে থেমে গেল। হঠাৎ, ফিরে তাকাল।

রোলস-রয়েসের কাছ থেকে খানিক দূরে একটা লোককে ধরে ফেলেছেন মিস্টার মিলফোর্ড আর হ্যানসন। ছাড়া পাওয়ার চেষ্টা করছে লোকটা।

'বাদামী চামড়া!' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর।

'ধরে রাখুন, ছাড়বেন না,' চেঁচিয়ে বললেন চীফ। ছুটে এলেন দুজন পুলিশ সঙ্গে নিয়ে।

টেনেহিঁচড়ে লোকটাকে পথের ওপর নিয়ে আসা হলো। কিশোরকে দেখেই হাসল জ্যাকোয়া। চিনতে পেরেছে। 'তুমি কিশোর না? আমি জ্যাকোয়া। ইয়াকুয়ালি বন্ধু। পালিয়েছি।'

'বন্ধু কিনা বোঝা যাবে এখনি,' কঠিন গলায় বললেন চীফ। 'ছেলেদের তাড়া করেছিলে কেন?'

'ভুল। ভেবেছি ওরা খারাপ-মানুষ ডাংম্যানের লোক। ভুল করেছি, অন্য ছেলেদের বলেছি। বিশ্বাস করেছে।'

'রবিন আর মুসাকে দেখেছো?' জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'কোথায়? জলদি বলো।'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল জ্যাকোয়া। 'খারাপ-মানুষ ডাংম্যান ধরে নিয়ে গেছে। আমার ভাই জেরম্মিকেও নিয়েছে। নিউকা আর অন্য ছেলেদের আটকে রেখেছে।'

জোরে নিঃশ্বাস ফেললেন ফ্লেচার। 'গোড়া থেকে বলো। খুলে বলো সব।'

'এক মিনিট, চীফ,' সামনে এগোল কিশোর। 'জ্যাকোয়া, ইংরেজি তো ভাল বলতে পারো না। স্প্যানিশ পারো?'

মাথা ঝাঁকাল ইনডিয়ান।

'তাহলে তাই বলো। খুলে বলতে সুবিধে হবে তোমার।'

মাথা কাত করল জ্যাকোয়া। গড়গড় করে বলে গেল পুরো কাহিনী, মুসা আর রবিনকে যা যা বলেছে। চুপ করে শুনল সবাই। ডাংম্যানের ওপর বিষিয়ে উঠল মন।

'আরও চারটে ছেলে?' বলল কিশোর, ঠিক প্রশ্ন নয়। 'হতেই হবে। আমি গর্দভ তো, তাই তখন বুঝিনি। ইয়াকুয়ালি ছেলেদের ব্যবহার করছে ব্যাটা। ম্যাগনাস ভারদির গুপ্তধন নামিয়ে আনার জন্যে। অথচ, ভুল কথা নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছি আমরা।'

'ভুল?' ফ্লেচার বললেন।

'তাই তো। আমরা জানি, ইট'স ইন দা আই অভ দা স্কাই হোয়্যার নো ম্যান ক্যান ফাইণ্ড ইট। *ম্যান।* তারমানে বড়রা পারবে না। কিন্তু একটা ছেলে পারবে।'

'ছেলে?'

'হ্যাঁ। ইয়াকুয়ালিরা এমনিতেই আকারে ছোট, ছেলেরা আরও অনেক ছোট। এমন জায়গায় গুপ্তধন লুকিয়েছে ভারদি, যেখানে খুব ছোট একটা ছেলেই শুধু ঢুকতে পারবে। কোনও গুহায় রেখেছে, সুড়ঙ্গমুখটা খুব সরু। পাহাড়ে উঠে ওখান দিয়ে ঢুকতে হবে।'

'তারমানে, বলতে চাইছ, ইয়াকুয়ালিদের গাঁয়ে গিয়ে চারটে ছেলেকে নিয়ে এসেছে এ-কারণেই?'

'হ্যাঁ। বড়দের মতই ছোটরাও পাহাড়ে চড়তে ওস্তাদ।'

'অনেক ওপরে কোথাও লুকানো আছে তাহলে। কিন্তু, এত কষ্টের দরকার কি ছিল? ডিনামাইট দিয়ে কিংবা অন্য কোনভাবে সুড়ঙ্গটা মোটা করে নিলেই পারত?'

'বোধহয় সম্ভব না, সে জন্যেই করেনি। পাহাড় ধসে পড়তে পারে। তাহলে চিরতরে হারিয়ে যাবে সোনার স্তূপ। তাছাড়া, বোমা মারলে লোকে শুনবে। সে-তো চায় চুপচাপ কাজ সারতে।'

'এসব পরে ভাবলেও তো চলে,' বাধা দিলেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'ছেলেগুলোকে আগে বের করে আনা দরকার। জ্যাকোয়া, কোথায় লুকিয়েছে ওদের?'

উঁচু পর্বতের দিকে দেখাল জ্যাকোয়া। 'এ-পথ ধরেই গেছে। ট্রাকে করে।'

'পর্বতের ভেতরে খোঁজাই তো মুশকিল,' চিন্তিত হয়ে পড়লেন ফ্লেচার। 'দিনে

হলে হেলিকপ্টার আনা যেত।'

'সকাল হতে তো অনেক দেরি!' অধৈর্য হয়ে পড়েছেন মিস্টার মিলফোর্ড।

'কিন্তু এখন গিয়ে খোঁজাখুঁজি করাটাও ঠিক হবে না। সাড়া পেলে সতর্ক হয়ে যাবে ডাংম্যান, ছেলেদের বিপদ আরও বাড়বে।'

চুপ করে কি ভাবছিল কিশোর, হঠাৎ ফিরল জ্যাকোয়ার দিকে। 'ট্রাকের চাকার দাগ অনুসরণ করতে পারবে?'

'চাকার দাগ? সি, পারব। খুব সহজ।'

'তাহলে চলো। সময়মত পৌঁছতে পারলেই হয় এখন।'

চাঁদের আলোয় দাগ দেখে দেখে প্রায় ছুটে চলল জ্যাকোয়া। অনুসরণ করল সবাই।

শক্ত দড়ি দিয়ে কষে বাঁধা হয়েছে মুসা আর রবিনকে। নির্জন পর্বতের ভেতরে চাঁদের আলোয় তাদের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ডাংম্যান।

ছায়া থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল ল্যাঙলী। 'ছেলেগুলো তৈরি, বস্।'

'চলো।'

উজ্জ্বল জ্যোৎস্না ছায়া সৃষ্টি করেছে সর্বত্র। বাক্সের মত গিরিসঙ্কটে ছায়ায় হারিয়ে গেল দুই চোর। পড়ে থেকে দেখল রবিন আর মুসা। তাদের পাশে গোঙাচ্ছে হাত পা বাঁধা জেরমি।

'কি করি এখন?' রবিন বলল।

'কিশোর নিশ্চই খুঁজছে আমাদের।'

'আমাদের সিগন্যাল কি দেখেছে?'

'কি করে বলি, বলো। একবার মাত্র পাঠিয়েছি। দেখে থাকলেও কেবিনে যাবে খুঁজতে, এখানে আসবে কেন?'

'কি জানি। তবে এলে ভাল হত। আমার ভয় করছে, মুসা। মনে হচ্ছে, আগামী ভোর আর দেখব না।'

মুসা জবাব দেয়ার আগেই ফিরে এল ডাংম্যান আর ল্যাঙলী।

ঝুঁকে বসে রবিনের বাঁধন খুলল ল্যাঙলী।

'ওঠো,' ডাকল ডাংম্যান। 'ল্যাঙলী, মনে আছে তো কি করবে?'

'আছে বস্।'

'গুড। কয়েক ঘণ্টার বেশি লাগবে না। হুঁশিয়ার থাকবে। তীরে এসে তরী ডোবাতে চাই না।'

রবিনের পিঠে ঠেলা দিল ডাংম্যান। তাকে নিয়ে চলে গেল গিরিসঙ্কটের দিকে।

সেদিকে চেয়ে অস্বস্তি বোধ করছে মুসা। রবিনকে নিয়ে গেল কেন?

কোথায় রয়েছে, মোটামুটি আন্দাজ করতে পারছে সে। এই বক্স-ক্যানিয়নটার কোন নাম নেই, তবে রয়েছে ইনডিয়ান হেড মাউনটেইনের গোড়ায়, পেদ্রোজ এস্টেটের গভীরে। রাস্তা থেকে মাইলখানেক দূরে। ওখানে ট্রাক রেখে এসেছে ডাংম্যান।

'ল্যাঙলী,' পটানোর চেষ্টা করল মুসা। 'ডাংম্যান তোমাকে ফেলে যাবে...'

'চুপ!' রেগে উঠল ল্যাঙলী। 'বস্ এমন কাজ করবে না।'
চুপ হয়ে গেল মুসা। লাভ নেই চেষ্টা করে।
মোড়ামুড়ি করে কোনমতে উঠে বসল জেরমি। ভীষণ হয়ে উঠেছে চেহারা, চোখে বুনো দৃষ্টি, চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তার দিকে চেয়ে হাসল মুসা। জবাব দিল না ইনডিয়ান। ইংরেজি জানে না। মুক্তির জন্যে কিছু করতে হলে মুসাকে একাই করতে হবে, জেরমিকে বলে কিছু বোঝাতে পারবে না।
কিন্তু কি করবে? মাত্র কয়েক ফুট দূরে বসে আছে ল্যাঙলী। কোলে রাইফেল।
মাথা ঘুরিয়ে এদিক-ওদিক তাকাল মুসা। উপায় খুঁজছে।
হঠাৎ চোখ মিটমিট করল সে। ওগুলো কি সত্যিই দেখা যাচ্ছে! না তার চোখের ভুল?
না, সত্যি। রূপালী ছায়ায় ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে অসংখ্য মূর্তি।
চেঁচিয়ে উঠল মুসা, 'এই যে, আমি এখানে! এখানে!'
ছুটে আসতে লাগল মূর্তিগুলো।
লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ল্যাঙলী। কোলের ওপর থেকে রাইফেল পড়ে গেল, তোলার চেষ্টা করল না। মহাবিপদ, বুঝে গেছে। পেছন ফিরে দিল দৌড়।
'ধরো, ব্যাটাকে, ধরো,' পুলিশ চীফ ইয়ান ফ্লেচারের গলা।
মুহূর্ত পরেই মুসাকে ঘিরে দাঁড়াল কিশোর, মিস্টার মিলফোর্ড আর হ্যানসন। বাঁধন খুলতে শুরু করল। জেরমির পাশে গিয়ে বসল তার ভাই জ্যাকোয়া।
ল্যাঙলীকে ধরে নিয়ে এল দুজন পুলিশ। ছাড়া পাওয়ার জন্যে ছটফট করছে চোরটা।
'ডাংম্যান কোথায়?' মুসাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।
হাত তুলে দেখাল মুসা। 'রবিনকে নিয়ে গেছে।'
ছায়ার দিকে তাকালেন মিস্টার মিলফোর্ড।
হোঁতকা ল্যাঙলীর দিকে কড়া চোখে তাকালেন ফ্লেচার। ধমক দিয়ে বললেন, 'ডাংম্যান কই? ছেলেগুলোকে কোথায় রেখেছে?'
দাঁত খিঁচালো ল্যাঙলী। 'ওকেই গিয়ে জিজ্ঞেস করো না, পুলিশ।'
'আরেক ব্যাটা আছে,' মুসা জানাল। 'ওই চোরটার নাম রিগো।'
'থাকুক,' বললেন চীফ। 'পালাতে পারবে না, ফাঁদে পড়েছে। বক্স-ক্যানিয়ন এটা, আর কোন পথ নেই।'
'বড় বড় কথা না বলে আগে ধরে দেখাও না, পুলিশ,' শুয়োরের মত ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে উঠল ল্যাঙলী।
'বেশি দূর যায়নি ব্যাটা,' ল্যাঙলীর কথায় কান না দিয়ে বলল মুসা। 'ওই ক্যানিয়নের ওদিকে।'
'আর কোথাও যেতেও পারবে না,' কিশোর বলল। 'যেতে হলে আমাদের এখান দিয়েই যেতে হবে।'
'হ্যাঁ,' বললেন চীফ। নিজের লোকদের নির্দেশ দিলেন, 'ছড়িয়ে পড়ো।'
হাতে রিভলভার নিয়ে তিন দিকে চলে গেল তিনজন পুলিশ।
চাঁদের দিকে মাথা তুলে রয়েছে যেন ইনডিয়ান হেড মাউনটেইনের চূড়া। যেন

একটা টাওয়ার।

গিরিসঙ্কটের দিকে এগোল সবাই, পুলিশ তিনজন ছাড়া। কিশোরের চোখ চূড়ার দিকে। তার পেছনে রয়েছে মুসা আর হ্যানসন।

'মুসা, দেখো,' থেমে গেল কিশোর। কথাটা শেষ করতে পারল না।

গিরিসঙ্কটে ছায়ার ভেতর থেকে শোনা গেল তীক্ষ্ণ অট্টহাসি, পাহাড়ের দেয়ালে দেয়ালে প্রতিধ্বনি তুলে মিলিয়ে গেল বুনো হাসির রেশ।

'সেই ভূত!' জোরে বলতে ভয় পাচ্ছে মুসা।

'দেখি, টর্চটা ধরো তো,' চেঁচিয়ে বললেন চীফ।

ছায়ার দিকে আলো ফেলল একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা একজন পুলিশ।

হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে ডাংম্যান। 'খুব অসময়ে এসে পড়েছেন। সামান্য নিয়েই খুশি থাকতে হবে এখন আমাকে।'

তার কাছেই কোথাও থেকে শুরু হলো আবার বুনো অট্টহাসি, ঢেকে দিল কথা।

বিশ

'নড়ো না, ডাংম্যান,' কঠিন গলায় আদেশ দিলেন ফ্লেচার। তাকে ধরার নির্দেশ দিলেন সহকারীদের। 'ডাংম্যান, আরেকটা চোর কোথায়?'

'এই যে, স্যার, ধরেছি,' অন্ধকার থেকে বলে উঠল একজন পুলিশ।

সার্চ করা হচ্ছে ডাংম্যানকে, হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে সে। তার কাছ থেকে ছোট একটা বস্তা নিয়ে চীফের দিকে বাড়িয়ে দিল একজন পুলিশ। ধাক্কা দিয়ে রিগোকে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো তার বসের পাশে।

বস্তা খুলে ডাংম্যানের দিকে তাকালেন ফ্লেচার। 'স্বর্ণ। চাম্যাশ হোর্ড পেয়েছ। ভাল চাইলে বলো কোথায় আছে। তোমার কথা সব জানি আমরা।'

'আমার কথা?' হাসছে ডাংম্যান। 'নোংরা ওই ইনডিয়ানগুলো কিছু বানিয়ে বলেছে?'

'অস্ট্রেলিয়ান পুলিশের সঙ্গে কথা বলেছি আমি।'

হাসি মুছে গেল ডাংম্যানের মুখ থেকে। 'অস্ট্রেলিয়া? জানলেন কি করে?'

'কিশোর,' মাথা নেড়ে কিশোরকে বলতে ইঙ্গিত করলেন চীফ।

অন্ধকার থেকে উড়ে এসে ডাংম্যানের মাথায় বসল বড় একটা পাখি। কাকের সমান, মাছরাঙার মত লম্বা ঠোঁট, তেমনি খাটো লেজ, শরীরের তুলনায় মাথাটা অনেক বড়, ঝটকা দিয়ে দিয়ে নাড়ছে। বড়সড় মাছরাঙাই বলা যায়।

'কি পাখি?' অদ্ভুত পাখিটার দিকে তাকিয়ে আছে মুসা।

কেউ জবাব দেয়ার আগেই ঠোঁট ফাঁক করে হেসে উঠল পাখিটা, বিকট অট্টহাসি ছড়িয়ে দিল পর্বতের কন্দরে কন্দরে।

'এই তাহলে ভূতের হাসি!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'হায় হায়, একটা পাখির ভয়ে কাবু হয়ে ছিলাম!'

'কুক্যাবুরা,' মোটেই অবাক হয়নি কিশোর। 'অস্ট্রেলিয়ায় একে বলে লাফিং

জ্যাকাস। চীফ, এই নামটাই মনে করতে পারছিলাম না।'

একটা টর্চ নিয়ে বিশেষ অ্যাঙ্গেলে ডাংম্যান আর পাখিটার ওপর আলো ফেলল সে। ছায়া পড়ল গিয়ে পাহাড়ের দেয়ালে। বিচিত্র কুঁজো একটা ছায়া, মাথাটা ঝটকা দিয়ে দিয়ে নড়ে, লম্বা নাক। 'ওই যে আমাদের ভূতের ছায়া।'

'বুঝলাম,' ডাংম্যান বলল, 'তুমিই আমার সর্বনাশ করেছ। এই পাখিটাও করেছে অনেকখানি। সরিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু এত বেশি ভক্ত হয়ে পড়েছে, সরতে চায় না, তাড়িয়ে দিলেও বার বার আসে।'

'খালি পাখিটার দোষ না, ডাংম্যান,' চীফ বললেন, 'তোমার স্যাণ্ডউইচের মোড়কও দায়ী। আরও হুঁশিয়ার হওয়া উচিত ছিল তোমার।'

'হুঁ, ছেলেটাকে আণ্ডার এস্টিমেট করেই ভুল করেছি। যাক, যা হয়েছে হয়েছে, কিছু অন্তত পেয়েছি। তো, ছেলেগুলোকে চাই?'

চেঁচিয়ে উঠলেন মিস্টার মিলফোর্ড, 'কি করেছ ওদের?'

'আর চালাকির চেষ্টা করো না, ডাংম্যান,' কড়া গলায় বললেন চীফ। 'এমনিতেই বহুদিন জেল খাটতে হবে তোমাকে।'

'তা বোধহয় হবে না, কারণ, আমি চলে যাচ্ছি। পথ-খরচের ব্যবস্থা করেই রেখেছি,' হেসে চোখ টিপল ডাংম্যান। 'ওই বস্তাটায় কিছু সোনা আছে। হোর্ডের তুলনায় খুবই সামান্য, কিন্তু তা-ই বা কম কি? ওগুলো নিয়েই আমি চলে যাব, আপনারা কিছু বলতে পারবেন না। তবে, আসামী যদি একান্তই চান, ল্যাঙলী আর রিগোকে রেখে দিতে পারেন।'

'শয়তান! ধোঁকাবাজ!' চেঁচিয়ে উঠে বসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল ল্যাঙলী, কিন্তু দুজন পুলিশ ধরে ফেলল তাকে।

'চুঁ-চুঁ, ল্যাঙলী, কি ছেলেমানুষী করছ?' তিরস্কার করল ডাংম্যান। 'তোমাদের ভাগ দেব বলেছিলাম, মাল সব পেলে দিতামও। আমিই তো পেয়েছি এই এত্তোটুকুন। হ্যাঁ, চীফ, একটা প্রস্তাব দিতে চাই। আপনি আমাকে ওই সোনাগুলো আর এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেবেন, বিনিময়ে ছেলেরা কোথায় আছে আমি জানাব।'

কঠিন কণ্ঠে ধমকে উঠলেন চীফ, 'ডাংম্যান!'

'ওসব ধমক-ধামকগুলো রাখুন এখন। কোন লাভ হবে না,' হাসি হাসি ভঙ্গিটা চলে গেল ডাংম্যানের, কর্কশ হয়ে উঠল কণ্ঠস্বর। 'যা বলছি করুন, নইলে ছেলেগুলোকে জ্যান্ত পাবেন না। ওদের কাছে খাবার পানি কিচ্ছু নেই। আমাকে চলে যেতে দিন। ফোনে জানাব কোথায় আছে ওরা। তা নাহলে মরুক।'

'এতখানি করার সাহস পাবে না।'

'পাব, চীফ, পাব। আপনি আমাকে চেনেন না।' খিকখিক করে হাসল ডাংম্যান। তার সঙ্গে গলা মেলানোর জন্যেই বুঝি বুনো হাসি হেসে উঠল মাথায় বসা পাখিটা।

অস্থির হয়ে উঠলেন মিস্টার মিলফোর্ড। ফ্লেচারকে কিছু বলার জন্যে এগোলেন, তাঁর আগেই বলে উঠল কিশোর, 'চীফ, রাজি হবেন না। আমি বুঝে গেছি কোথায় আছে ওরা।'

ঝট করে কিশোরের দিকে ফিরল ডাংম্যান।

'কোথায়, কিশোর? জলদি বলো?' তর সইছে না আর মিস্টার মিলফোর্ডের।

'ওই যে ওখানে,' টাওয়ারের মত খাড়া হয়ে থাকা পর্বত-চূড়া দেখাল সে। 'ম্যাগনাস ভারদির কথাগুলো ছিল ঃ ইট ইজ ইন দা আই অভ দা স্কাই হোয়্যার নো ম্যান ক্যান ফাইণ্ড ইট। ম্যান কেন বলেছে সেটা তো বুঝলামই, বাকি থাকল *আই অভ দা স্কাই।* সূর্য কিংবা চাঁদের কথা বলেনি। সত্যি সত্যি চোখের মত দেখতে একটা জিনিসের কথা বলেছে। ওই দেখুন।'

জ্যোৎস্নায় আলোকিত আকাশের পটভূমিতে বিরাট একটা মুখ দেখা গেল, মানুষের মুখের আদল, দুটো চোখ, নাক, মুখ—নিখুঁত মানুষ যেন। বিশাল এক পাথর, আবছা আলোয় ওরকম লাগছে।

'বাঁ চোখটা দেখছেন?' বলল কিশোর। 'বেশি কালো। মনে হচ্ছে সুড়ঙ্গমুখ। ওটার ভেতরেই রয়েছে চাম্যাশ হোর্ড। রবিন ওখানেই আছে।'

'তোমার ধারণা আমি উঠেছি ওখানে?' ডাংম্যানের কথায় জোর নেই।

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'ইনডিয়ান ছেলেদের সাহায্যে উঠেছ। অস্ট্রেলিয়ান পুলিশ জানিয়েছে, বড় বড় দালান বেয়ে উঠে চুরি করেছ তুমি। কাজেই পাহাড়েও উঠতে পেরেছ।'

'বেশ, ধরলাম আছে ওরা ওখানে। নামাবে কি করে?'

'জ্যাকোয়া আর জেরমি যাবে।'

সঙ্গে সঙ্গে বলল জ্যাকোয়া, 'সি, সহজ। খুব সহজ।'

'একটা ছেলের কথা শুনবেন আপনারা?' ফ্লেচারকে বলল ডাংম্যান। 'আগেই বলে দিচ্ছি, পরে আমাকে দুষতে পারবেন না। ওর অনুমান ভুল হলে আমাকে কিছু বলবেন না। পরে আমি কোন কথা শুনব না। যা করার বুঝেসুঝে করুন।'

দ্বিধায় পড়ে গেলেন ফ্লেচার। চেয়ে আছেন মিস্টার মিলফোর্ডের দিকে, শোনার জন্যে অধীর।

আস্তে কাশি দিলেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'কিশোরের ওপর ভরসা আছে আমার।'

'অল রাইট,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন চীফ। 'জ্যাকোয়া আর জেরমি যাবে। ছেলেদেরকে বেঁধে রেখেছে কিনা কে জানে। তাহলে কাউকে গিয়ে নেমে তুলে আনতে হবে ওদের, কিংবা বাঁধন কেটে দিয়ে আসতে হবে, যাতে ওরা নিজেরাই বেরিয়ে আসতে পারে। জ্যাকোয়া আর জেরমি ঢুকতে পারবে তো?'

'ওরা ঢুকতে না পারলে নিশ্চয় ডাংম্যানও পারেনি,' কিশোর বলল। 'তারমানে, গুহার মুখে পাথর চাপা দিয়ে এসেছে। একটা ছেলেকে বাধ্য করেছে অন্য চারজনকে বাঁধতে, তারপর ওই ছেলেটাকেও বেঁধে ঠেলে ফেলে দিয়েছে ভেতরে। তার ওপর পাথর চাপা···খুব খারাপ লোক তুমি, ডাংম্যান!'

'ভেতরে ঢুকবে কে তাহলে?' চীফের জিজ্ঞাসা।

'আমি,' এগিয়ে এল মুসা।

'তুমি পারবে না,' কিশোর বলল। 'তোমার শরীর না-ও ঢুকতে পারে। আমাকেই যেতে হবে।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে দুজনের দিকে তাকিয়ে রইলেন চীফ। 'তোমরা, সত্যি, অমন ছেলে…! ঠিক আছে, যাও।'

ওঠার জন্যে তৈরি হলো দুই ইনডিয়ান। কিশোরকে পিঠে তুলে নিল জ্যাকোয়া। উঠতে শুরু করল দেয়াল বেয়ে।

নিচে, গিরিসঙ্কটের অন্ধকার মেঝেতে দাঁড়িয়ে ওপর দিকে চেয়ে আছে দর্শকরা। অনেক ওপরে উঠে গেছে তিনজন। কালো কয়েকটা পোকার মত লাগছে এখন।

উঠে যাচ্ছে দুই ইনডিয়ান। কিশোর সঙ্গে না থাকলে আরও তাড়াতাড়ি উঠতে পারত।

অবশেষে পৌঁছল ওরা বাঁ 'চোখটার' কাছে।

থামল এক মুহূর্ত। তারপর হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

'পেরেছে!' হাঁপ ছাড়লেন ফ্লেচার।

'নামবে কি করে আবার, ভাবছি,' বিড়বিড় করলেন মিস্টার মিলফোর্ড।

'উঠতে যখন পেরেছে, নামতেও পারবে।'

বাটির মত একটা গর্ত, তলায় বড় পাথর চাপা দেয়া। মোটা একটা লোহার দণ্ড পড়ে আছে পাথরটার কাছে, আর কিছু স্বর্ণ।

'ওই ডাণ্ডা দিয়ে চাড় মেরে পাথর ফেলেছে ডাংম্যান,' বলল কিশোর। 'জ্যাকোয়া, সরাতে হবে।'

তিনজনে মিলে সরিয়ে ফেলল পাথরটা। ছোট কালো একটা গর্ত দেখা গেল, সরু সুড়ঙ্গের মুখ। ঠিকই আন্দাজ করেছে কিশোর, জ্যাকোয়া কিংবা জেরমি ঢুকতে পারবে না, মুসারও কষ্ট হত ঢুকতে। বেল্ট থেকে টর্চ খুলে ঢোকার জন্যে তৈরি হলো সে। নিজের এক পায়ে দড়ি বেঁধে নিয়ে অন্য প্রান্ত ধরতে বলল দুই ভাইকে। 'আমি তিনবার হ্যাঁচকা টান দিলে টেনে তুলবে আমাকে।'

লম্বা হয়ে শুয়ে সুড়ঙ্গে মাথা ঢুকিয়ে দিল কিশোর। ক্রল করে এগোল। খুবই সরু, এক জায়গায় এসে কিশোরও আটকে গেল। জোরাজুরি করে, বান মাছের মত শরীর মুচড়ে পেরোল সে জায়গাটা।

কয়েক ফুট পরে আরও সরু আরেকটা জায়গা, কাঁধ আটকে গেল কিশোরের। কিছুতেই ঢুকতে পারছে না। বাঁয়ে একটা নড়াচড়া টের পেয়ে টর্চ জ্বালল। আঁতকে উঠল, আরেক মুহূর্ত দেরি করলেই পাথরের বাড়ি খেয়ে ছাতু হয়ে যেত মাথা। 'রবিন!'

'সাড়া দাওনি কেন?' হেসে হাত থেকে পাথরটা ফেলে দিল রবিন। 'এই একটু আগেও ছেলেগুলোকে বলছিলাম, তুমি আসবে।'

আলো ফেলে দেখল কিশোর। আর দুই ফুট পেরোতে পারলেই গুহায় ঢুকতে পারত। টর্চ ঘোরাল সে। হাসিমুখে তার দিকে চেয়ে আছে বাদামী চামড়ার এক কিশোর, বয়েস রবিনের চেয়ে কম।

'আলো আরও পিছে সরিয়ে দেখো,' হেসে বলল রবিন।

ছোট্ট গুহার শেষ মাথায় আলো ফেলল কিশোর। কেঁপে উঠল হাত, আরেকটু

হলেই টর্চ ছেড়ে দিয়েছিল হাত থেকে।

আরও তিনটে ছেলে বসে আছে। তাদের কাছেই রয়েছে গুপ্তধনের স্তূপ। সোনার ছোট-বড় ইঁট, নুড়ি, নানা রকম মোহর, অলঙ্কার, আর প্রায় সব ধরনের মূল্যবান পাথর। টর্চের আলোয় জ্বলছে রামধনুর সাত রঙ সৃষ্টি করে।

'চাম্যাশ হোর্ড!' বিড়বিড় করল কিশোর। 'সত্যি পাওয়া গেল তাহলে!'

একুশ

পরদিন বিকেলে। বিশাল ডেস্কের ওপাশ থেকে তিন গোয়েন্দার দিকে চেয়ে হাসলেন বিখ্যাত চিত্রপরিচালক ডেভিস ক্রিস্টোফার। 'চাশ্যাম হোর্ড তাহলে পেলে। দুশো বছর বোকা বানিয়ে রেখেছিল সবাইকে ম্যাগনাস ভারদি।'

'ইন দা আই অভ দা স্কাই হোয়্যার নো ম্যান ক্যান ফাইণ্ড ইট,' কিশোর বলল, 'সত্যি কথাই বলেছে সে। কেউ বোঝেনি।'

'তোমরা বুঝেছ। আর ডাংম্যান। তবে তার লাভ হলো না কিছু।'

'লাভের মধ্যে জেল,' হাসল রবিন। 'আমেরিকার জেল থেকে ছাড়া পেয়ে গিয়ে পড়বে অস্ট্রেলিয়ায়।'

'অপরাধীর ভবিষ্যৎ কোন সময়ই ভাল হয় না,' শুকনো কণ্ঠে বললেন পরিচালক। 'তা-ও তো করে লোকে।'

'হ্যাঁ, স্যার,' মুসা মাথা ঝাঁকাল। 'ডাংম্যানের মত ধড়িবাজ চোরও বাঁচতে পারল না। ম্যাগনাস ভারদির হোর্ড আর ধাঁধার কথা শুনেছে সে। কোথায় আছে খুঁজে বের করেছে। ইনডিয়ান হেড মাউনটেইনের চূড়ায় উঠে দেখল, সুড়ঙ্গের ভেতরে ঢুকতে পারছে না। তখন সোজা মেকসিকোতে ইয়াকুয়ালিদের গাঁয়ে গিয়ে ফাঁকি দিয়ে তাদের চারটে ছেলেকে নিয়ে এল।'

রবিন যোগ করল, 'সে স্বীকার করেছে, আমেরিকান ছেলেদের দিয়েও কাজটা করাতে পারত। অনেক আমেরিকান ছেলে আছে, পাহাড়ে চড়ায় ওস্তাদ, ইনডিয়ান হেড মাউনটেইনে উঠতে পারবে। কিন্তু ওরা গায়েব হলে হই-চই পড়বে, সতর্ক হয়ে যাবে পুলিশ, তাই গিয়ে দূর গাঁয়ের ইনডিয়ানদের ছেলে নিয়ে এসেছে।'

ভ্রূকুটি করলেন বিখ্যাত পরিচালক। 'মনটা খুবই কালো। ওর শয়তানী থামিয়ে দিয়ে একটা কাজের কাজ করেছ তোমরা।'

'তবে ছেলেরা চুপ করে ছিল না,' কিশোর বলল। 'নিউকা ইংরেজি বোঝে। ডাংম্যান তার দুই সহকারীর সঙ্গে আলাপ করছিল, সেটা শুনে ফেলেছিল নিউকা। বুঝেছে, তাদেরকে কেন নিয়ে আসা হয়েছে। অনেক কৌশলে কাগজ জোগাড় করে আঙুল কেটে রক্ত দিয়ে চিঠি লিখে ফেলে দিয়েছে ট্রাক থেকে। ভাগ্য ভাল ওদের, একজন পেয়েছিল চিঠিটা, ঠিকানা লেখা ছিল, পোস্ট করে দিয়েছে।'

'দা ফ্যাকটর অভ চান্স,' বললেন পরিচালক। 'একে মেনে নিতেই হবে। অলৌকিক নয়, কিন্তু অনেক সময় এমন সব ব্যাপার ঘটে, অলৌকিক বলেই মনে হয়। এই যেমন ওই চিঠির ব্যাপারটা। ওটা তো পাওয়ারই কথা না কারও, অথচ পেল, পোস্টও করা হলো। জায়গামত গিয়ে পৌঁছল। নইলে ছেলেগুলো বাঁচত?'

'তা, ঠিকই বলেছেন, স্যার,' একমত হলো কিশোর।

'একটা জিনিস বুঝতে পারছি না,' বললেন পরিচালক, 'গুপ্তধনগুলো আছে জেনেও এত দেরি করল কেন ডাংম্যান?'

'তাড়াহুড়ো করে লোকের চোখে পড়তে চায়নি। অনেক ভেবেচিন্তে প্ল্যান-প্রোগ্রাম করে কাজে নেমেছে। টনি আর মিস পেদ্রোর ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়েছে, ওদের সাহায্য পেলে কাজ হাসিল করতে সহজ হবে ভেবেছে। মিস পেদ্রোর সাহায্য নেয়ার জন্যেই শুধু তার ওই ভেজিট্যারিয়ান লীগের ভাঁওতাবাজি। কিন্তু উল্টে গেল দাবার ছক। নিউকাই দিল সব গোলমাল করে। সোনার পুতুলের ভেতর মেসেজ ভরে ছুঁড়ে দিল দেয়ালের ওপর দিয়ে, আর ভাগ্যের এমনই ফের ডাংম্যানের, ওটা এসে পড়ল দুই গোয়েন্দার হাতে। নইলে কে জানত এই খবর? এতক্ষণে হয়তো দক্ষিণ আমেরিকায় থাকত ডাংম্যান, দুনিয়ার টাকার কুমিরদের তালিকায় আরেকটা নাম যোগ হত,' থামল সে।

কাহিনীর খেই ধরল মুসা, 'সেদিন বিকেলে কেবিন থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল নিউকা। এস্টেটের কাছে ঘুরঘুর করছিল, তার তিন জাতভাইকে নিয়ে পালানোর উপায় খুঁজছিল। লাইব্রেরির জানালায় উঁকি দিয়ে দেখল, একটা সোনার পুতুল হাতে নিয়ে দেখছে টনি। সোনা সহজে লোকের চোখে পড়বে, পথে পড়ে থাকতে দেখলে আকৃষ্ট হবে ভেবে পুতুলটা চুরি করেছে সে, মেসেজ ভরে ছুঁড়ে ফেলেছে।'

'এবং তার পর পরই আবার ধরা পড়েছে,' রবিন বলল। 'তার চিৎকারই শুনেছি আমরা।'

'ওদের ভাগ্য ভাল, পুতুলটা তোমাদের হাতে পড়েছে,' বললেন পরিচালক। 'আচ্ছা, পুতুলে যে মেসেজ লিখে ভরেছে, তাতে হোর্ডের কথা কিছু ছিল?'

'না, শুধু সাহায্যের আবেদন,' বলল কিশোর। 'তবে পুতুলদুটো প্রমাণ করেছে, চাম্যাশ হোর্ড সত্যিই আছে। প্রথম পুতুলটা জ্যাকোয়া ছিনিয়ে নিয়েছে, তার কারণ, সে আশা করেছিল ওটা নিউকার কাছ থেকে এসেছে। দ্বিতীয় পুতুলটাই ভুল পথে নিয়েছে আমাকে, সেই সুযোগটা নিয়েছে ডাংম্যান। নানা রকম মিথ্যে বলে আমার চোখ সরিয়ে দিয়েছে অন্যদিকে।'

'ভুল পথে?' ভুরু সামান্য তুললেন পরিচালক।

'হ্যাঁ, স্যার। টনিকে অপরাধী ভেবেছি, সোনার পুতুলে যে মেসেজ ছিল সেটাকে গুপ্তধনের নির্দেশ ভেবেছি। সত্য থেকে দূরে সরে গিয়েছিলাম। এর জন্যেই সহজে আমাদের বোকা বানাতে পেরেছে ডাংম্যান।'

আস্তে মাথা দোলালেন পরিচালক। 'হ্যাঁ, গোয়েন্দার জন্যে ভুলটা সাংঘাতিক। আচ্ছা, কুক্যাবুরা পাখির কথাটা মনে এল কি করে তোমার?'

হাসল কিশোর। 'পাখির কথা ভাবিনি প্রথমে। মিস্টার ফ্লেচার এডগার অ্যালান পোর গল্পটার কথা তুলতেই মনে এল দুটো প্রাণীর কথা। তার একটা হায়েনা, কিন্তু হায়েনার হাসি ওরকম নয়, ভূতুড়ে ছায়াটা যে-রকম করে হাসে। বাকি আরেকটা প্রাণীর নাম মনে করতে পারলাম না, তবে আবছা ভাবে মনে পড়ল ওগুলোর বাস অস্ট্রেলিয়ায়। সে-জন্যেই অস্ট্রেলিয়ান পুলিশের কাছে ডাংম্যান আর টনির ব্যাপারে খোঁজ নিতে বলেছিলাম।'

'পোষা পাখিটাই শেষে কাল হলো ডাংম্যানের,' হাসলেন পরিচালক। এক মুহূর্ত চুপ থেকে বললেন, 'চাম্যাশ হোর্ড কেমন দেখলে?'

'দারুণ, স্যার,' বলল রবিন। 'আপনার জন্যে একটা স্যুভনির নিয়ে এসেছি।' পকেট থেকে ছোট একটা সোনার নুড়ি বের করে টেবিলের ওপর দিয়ে গড়িয়ে দিল সে। 'যেহেতু পেদ্রোজ এস্টেটে পাওয়া গেছে, মিস পেদ্রোই মালিক হয়েছেন গুপ্তধনের। সরকারী টেজারির হিসসা দিয়ে যা বাকি থাকবে সব তাঁর। তিনিই এটা আপনাকে প্রেজেন্ট করেছেন। আপনার কথা বলেছিলাম।'

'আমার অসংখ্য ধন্যবাদ জানিও মহিলাকে। দেখি, চাম্যাশ হোর্ড দেখতে যাব একদিন। ইনডিয়ানদের খবর কি?'

'গাঁয়ে ফিরে গেছে। অনেক সাহায্য করেছে ইয়াকুয়ালিরা, ধরতে গেলে ওদের জন্যেই পাওয়া গেছে গুপ্তধনগুলো, অনেক টাকা দিয়েছেন তাদেরকে মিস পেদ্রো।'

মাথা ঝাঁকালেন পরিচালক। 'দারুণ একটা কেস, ছবি করা যাবে।' মুখ তুললেন, চোখদুটো হাসছে। 'শেষ কিন্তু হলো না। একটা কাজ বাকি রয়েছে, সিনেমার ফিনিশিং।'

'বাকি?' ভুরু কোঁচকাল মুসা।

'বুঝলাম না, স্যার!' কিশোর অবাক।

মুসা আর রবিনের দিকে চেয়ে চোখ নাচালেন পরিচালক। 'টেরিয়ার ডয়েল যে তোমাদের আটকে রেখে বিপদে ফেলল, তার কি করেছ?'

তড়াক করে লাফিয়ে উঠল মুসা। 'ইয়াল্লা! ভুলেই গিয়েছিলাম,' শার্টের হাতা গোটাতে শুরু করল সে। যেন এখানেই রয়েছে শুঁটকি টেরি।

'ধীরে, বন্ধু, ধীরে,' হাত ধরে টেনে মুসাকে চেয়ারে বসিয়ে দিল কিশোর। 'আমি ভুলিনি। ওর জন্যে প্ল্যান একটা ঠিকই করে রেখেছি।'

সামনে ঝুঁকলেন পরিচালক। ছোট্ট একটা কাশি দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাকে বলতে অসুবিধে আছে?'

'না না,' হাসল কিশোর। খুলে বলল।

'দারুণ হবে,' সৌজন্যবোধ ভুলে গিয়ে টেবিলে চাপড় মেরে বসল মুসা, হাসিতে বিকশিত ঝকঝকে সাদা দাঁত।

রবিন হাসছে হা-হা করে।

মিস্টার ক্রিস্টোফারের মুখেও হাসি।

****